মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার

জীবন ও কর্ম



শাহ্ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার
জীবন ও কর্ম

শাহ্ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার
জীবন ও কর্ম ॥ শাহ্ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

প্রকাশকাল
পরিবর্ধিত আলোকায়ন দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০২৫/অগ্রহায়ণ ১৪৩২

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৪২৯/অক্টোবর ২০২২

প্রকাশক
আলোকায়ন, ৩৫ বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা ১১০০। ফোন : ০১৭১১২৪০৪৪৭

স্বত্ব
লেখক

কম্পোজ
মো. শরীফ হোসেন

অঙ্গসজ্জা
মোঃ সাইফুল ইসলাম

প্রচ্ছদের প্রতিকৃতি এঁকেছেন
একুশে পদকপ্রাপ্ত চিত্রশিল্পী এবং দেশের সর্ববৃহৎ স্ক্রল পেইন্টিংয়ের শিল্পী
অধ্যাপক শাহ্জাহান আহমেদ বিকাশ

প্রচ্ছদ
অধ্যাপক শাহ্জাহান আহমেদ বিকাশের আঁকা প্রতিকৃতি অবলম্বনে সুশীল রায়

মুদ্রণ
হেরা প্রিন্টার্স

পরিবেশক
অ্যাডভোকেট শাহ্ মোহাম্মদ কবীর, কাজী ল’ চেম্বার, ব্যারিস্টার বাড়ি, জামালপুর,
ফোন : ০১৯২৮৪৭৮৩০২

মূল্য
৫০০/- (পাঁচশত) টাকা

Mirza Ashraf Uddin Haider Jiban o Karma by Shah Mohammad Moniruzzaman.
Published by Aalokayan, 35 Bangla Bazar (1st floor), Dhaka 1100. Second Edition :
December 2025, Price : Taka 500.00, US. $12

ISBN : 978-984-

উৎসর্গ

যাদের স্নেহ-মমতা আজও হৃদয়ের গভীরে
যারা স্মৃতিতে অমলিন
আমার বাবা মোহাম্মদ আবদুর রহিম (জন্ম. ১১.০৪.১৯২৭-মৃত্যু. ০৮.০৬.২০১১)
এবং
মা মোসাম্মৎ মাজেদা খাতুন
প্রাত্যহিক জীবনাচারে তারা সহজ-সরল ও সাদা মনের মানুষ। যাদের প্রতিদান
কখনো দিতে পারিনি। এজন্য লজ্জিত, দুঃখিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী

সত্যতে নাই ধানাইপানাই,
সত্য যাহা সহজ তাই,
সত্য যাহা সহজ তাই;

আপনি তাতে বিশ্বাস আসে,
আপনি তাতে শক্তি পাই,
সত্যতে জোর-জুলুম নাই।

[‘সত্য-মন্ত্র’ গান, কাজী নজরুল ইসলাম, বিষের বাঁশী। নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড।
বাংলা একাডেমি, ২০২০, পৃ. ১৩৭]

দ্বিতীয় সংস্করণের প্রসঙ্গ-কথা

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার (১৯০৫-১৯৮৫) ছিলেন বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব। সাহিত্যচর্চা, পত্রিকা প্রকাশ, রাজনীতি, সমাজসেবা−নানা ক্ষেত্রে রয়েছে তার অবদান। তার কর্ম বিভিন্ন শাখায় বিকশিত হলেও তার খ্যাতি ও পরিচিতি মূলত সমাজসেবা এবং সাহিত্যনির্ভর। সৃজনশীল সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি তিনি মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গের স্মৃতিচারণ বা জামালপুরের ওপর রচিত কোনো কোনো গ্রন্থে তার প্রাসঙ্গিক উল্লেখ পাওয়া গেলেও আমাদের জানামতে তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে খুব একটা আলোচনা হয়নি। উপরিউক্ত প্রেক্ষাপটে তার উপরে কাজ করার বিষয়ে আমরা আগ্রহী হই এবং 'জীবন-কথা : মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার' নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করে ২০২২ সালে প্রকাশ করা হয়। গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পরে অনেক পাঠকের মন্তব্য পেয়েছি, পরামর্শ শুনেছি। তাদের মধ্যে অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, সাহিত্যিক, সাহিত্য সমালোচক, সাংবাদিক রয়েছেন। এসব মন্তব্য, অনুভূতি আমাদের জন্য দুর্লভ সম্পদ। এই গ্রন্থ উক্ত গ্রন্থের পরিমার্জিত রূপ। এ সংস্করণে নির্ঘণ্ট করা গেছে। এতে ব্যক্তি ও স্থানের নাম যতটা সম্ভব দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান এ গ্রন্থ প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমাদেরকে আগ্রহী করে তোলেন মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের পুত্র বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার। তিনি এই গ্রন্থের বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য প্রমাণাদি সংগ্রহ করে দিয়েছেন, দিয়েছেন নানা নির্দেশনা। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার সম্পাদিত বাংলা সংবাদপত্র সাপ্তাহিক 'তওফিক'-এ সমকালের বেশ কিছু রচনা ও চিঠিপত্র বর্তমান গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে তা আগের গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। এসব অগ্রন্থিত রচনা ও তথ্যের ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। জামালপুরের ইতিহাস-ঐতিহ্যে এসব দুষ্প্রাপ্য তথ্য এক সময় মূল্যবান উপাদান হিসেবে বিবেচিত হবে।

গ্রন্থভুক্ত দুষ্প্রাপ্য ‘তওফিক’ পত্রিকার সন্ধান দিয়েছেন ও নিজ সংগ্রহ থেকে জেরক্স করার সুযোগ দিয়েছেন জামালপুর শহরের ঐতিহ্যবাহী মিঞাবাড়ির বাসিন্দা সৈয়দ এ এম ছাকেবুদ্দিন। গ্রন্থ প্রকাশের এই আনন্দঘন সময়ে তাঁর প্রতি জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা। বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দারকে এ সংস্করণে একটি মুখবন্ধ লিখে দেবার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ধৈর্য ধরে আমার স্ত্রী শারমিন মাশা এ কাজে সহযোগিতা করেছেন, এজন্য তাকে জানাই বিশেষ ধন্যবাদ। শাহ্ সাদেক আহমেদ, শাহ্ মোহাম্মদ আলী আহসান বুলবুল, মোহাম্মদ নাজমুল হোসাইন, মো. রবিন ইসলাম, শাহ্ মোহাম্মদ আরাফাত ইসলাম, শাহ্ মোহাম্মদ অন্তর ইসলাম, শাহ্ মোহাম্মদ সালমান অর্ফিয়াস, শাহ্ মোহাম্মদ সালমান রুশিদী, শাহ্ মোহাম্মদ সালমান খুরশিদী, সামিরা জান্নাত, সানজিদা জান্নাত আমাদের এ কাজে অংশ নিয়েছে। আগামী দিনে এই লেখা পড়ে তারা অনুপ্রাণিত হবে সেই প্রত্যাশা করছি। আবদুল্লাহ আল-হারুন, সাইফুল্লাহ মোহাম্মদ খালেদ, মিনহাজ উদ্দিন শপথ, মাহবুব বারী, আশরাফুল মান্নান, এএসএম আব্দুল হালিম, শাহ খায়রুল বাশার, তারেক মেহের, আসাদুল্লাহ্ প্রমুখ বিশেষ উৎসাহ দিয়েছেন। তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের অজ্ঞতাজনিত কারণে এই গ্রন্থে ভুলত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও বইটি যদি মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসু পাঠককে কিছুটা উপকৃত করে তাহলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

শাহ্ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
১লা নভেম্বর ২০২৫
খাশিমারা, মেলান্দহ, জামালপুর

লেখকের কথা

বর্তমান গ্রন্থে উপেক্ষিত ও বিস্মৃত লেখক, সাংবাদিক, রাজনীতিক মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের জীবন-কথা লিখতে গিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছি। বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার শত ব্যস্ততার মধ্যেও এই পাণ্ডুলিপি লেখার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাকে সব সময় উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন এবং ধৈর্যের সঙ্গে পাণ্ডুলিপিটি পড়ে কিছু মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তার পিতার সৃজনকর্ম অনুসন্ধান করেন। তিনি তার পিতার 'হামদ-নাতে'র পাণ্ডুলিপির কিছু অংশ উদ্ধার করেছেন।

এছাড়া তার পিতার রচিত 'আসামের জঙ্গলে' শীর্ষক ক্ল্যাসিকতুল্য ভ্রমণকাহিনি প্রকাশের জন্য চেষ্টা করছেন। এই জীবনীগ্রন্থে রচনা নিদর্শনে এর সামান্য অংশ তুলে ধরা হয়েছে। পরবর্তীকালে বিশেষ করে 'হামদ-নাত' ও 'আসামের জঙ্গলে' নামক দুটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রকাশ করার ইচ্ছে আছে।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের কংগ্রেস, স্বরাজ, কৃষক প্রজা পার্টির (সমিতি) রাজনৈতিক দলের অন্যতম সক্রিয় কর্মী। পরবর্তীকালে তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে মুসলিম লীগের অন্যতম প্রভাবশালী রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। তিনি বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনসহ স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে যতটুকু অবদান রেখেছেন তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই পরিচয়ের বাইরেও তিনি ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সমাজসেবী, দক্ষ প্রশাসক, সংবাদপত্রের সম্পাদক, মুদ্রক ও প্রকাশক। তিনি লেখালেখিতেও যথেষ্ট সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। এ বইটি থেকে তাঁর সম্পর্কে পাঠক সার্বিক ধারণা পাবেন।

জীবন-কথা স্থানিক ইতিহাস রচনার জন্য অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। স্থানিক ইতিহাসের উপাদান দেশের জাতীয় ইতিহাসকে সমৃদ্ধ

করে। জাতীয় ইতিহাস পৃথিবীতে স্মরণীয় হয়ে থাকে। এরই অনুবৃত্তিক্রমে বিস্মৃত মনীষা মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের জীবনীগ্রন্থ।

বইটি নির্ভুল ও তথ্যশূন্যতা পূরণ এবং জেনর (Genre) বা ফর্ম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। গ্রন্থটির কিছু কিছু তথ্যাবলি সুধীজন ও পারিবারিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যে আহরিত। এছাড়া কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এ অঞ্চলের স্থানীয় ইতিহাসের গেজেটিয়ারতুল্য বিভিন্ন গ্রন্থ ও লেখক, সাংবাদিক এবং নির্ভরযোগ্য প্রবীণ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। এ গ্রন্থে বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষভাবে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের জীবনী তুলে ধরেছি।

এরপরও যদি কিছু ভুলত্রুটি থেকে যায় তাহলে পরবর্তী সময়ে তা অবশ্যই সংশোধন করা হবে। এ গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার, এজন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই। এ গ্রন্থের ভ্রমসংশোধনী দেখেছেন বাংলা একাডেমির কর্মকর্তা আবু মোঃ ইকবাল এবং গ্রাফিক্সে আশরাফুজ্জামান। এঁদেরকে আমি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

যারা বিভিন্ন সময়ে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, যাদের অবদানে এই বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হলো, তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বিশেষ করে যার কথা বলা প্রয়োজন তিনি হলেন আমার স্ত্রী শারমিন মাশা। তার সার্বক্ষণিক তাগাদায় আমার পক্ষে এ বইটি প্রণয়ন করা সম্ভব হলো। আকারে ক্ষুদ্র হলেও মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের জীবনী পাঠ করে যদি কোনো পাঠক উপকৃত হন তাহলে আমাদের এ প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

শাহ্ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
খাশিমারা, মেলান্দহ, জামালপুর

১লা অক্টোবর ২০২২

দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ

আমার পিতা মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের জীবন ও কর্মের ওপর গবেষণামূলক গ্রন্থ 'জীবন-কথা : মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার' গ্রন্থটির দ্বিতীয় ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ 'মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার : জীবন ও কর্ম' এত দ্রুত প্রকাশ হবে তা কখনোই কল্পনা করিনি। ২০২২ সালে উক্ত গ্রন্থটি প্রকাশের পর চারদিক থেকে অভূতপূর্ব সাড়া দেখে আনন্দিত, আপ্লুত হয়েছি। বইটি শুধু বাবার নিজের ও পারিবারিক তথ্যাবলি নিয়েই নয়, জামালপুরের সমকালীন জীবন প্রবাহসহ পাক-ভারত-বাংলাদেশের বহুমাত্রিক তথ্য এতে পাওয়া যাবে। জামালপুরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যে তিনি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন। এ অঞ্চলের সঠিক ইতিহাস লিখতে গেলে, পড়তে গেলে তার প্রসঙ্গ আসবেই।

দিনদিন লেখাপড়া-জানা মানুষের মধ্যে না-পড়া এবং না-জানার প্রবণতা গড়ে উঠেছে। সেই দিক থেকে নতুন প্রজন্মের একজন হিসেবে প্রাবন্ধিক ও গবেষক শাহ্ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের আন্তরিকতায় ও নিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়েছি। তিনি অনেক গ্রন্থ, বয়োবৃদ্ধ নির্ভরযোগ্য শিক্ষিতজনের নিকট থেকে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে আমার বাবার জীবন ও কর্মকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। গ্রন্থটি অপূর্ব, অনবদ্য হয়েছে। গ্রন্থটি প্রণয়নের সময় এ এ কে মাহমুদুল হাসান (দারা), সাইফুল্লাহ মোহাম্মদ খালেদ (খালেদ খসরু), আবদুল্লাহ আল-হারুন, সৈয়দ এ এম ছাকেবুদ্দীন প্রমুখ শাহ্ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানকে সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা প্রদান করেছেন—এজন্য সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

শাহ্ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান লেখালেখির মাধ্যমে আমাদের পরিবারকে ঋণী করেছেন। মির্জা বংশের পক্ষ থেকে এবং মির্জা সাহেবের একমাত্র জীবিত সন্তান হিসেবে তাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

আশা করি, বাবার ওপর লেখা এ গ্রন্থটি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে মানবিক জ্ঞানচর্চায় প্রেরণা ও উৎসাহ জোগাবে।

৩০/৯/২০২৫ ইং

ঢাকা
৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৫

বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার
অবসরপ্রাপ্ত বিচারক
আপীল বিভাগ
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

ভূমিকা

আমার আব্বা মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের (১৯০৫-১৯৮৫) ইন্তেকালের দীর্ঘ সাঁইত্রিশ বছর পর জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় নিজেকে কিছুটা হলেও দায়মুক্ত ও ভারমুক্ত মনে হচ্ছে। স্নেহাস্পদ শাহ্ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান প্রণীত এই বইটিতে আমার আব্বার অনেক দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যাবে। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। এ জীবনীগ্রন্থটি প্রণয়ন করা না হলে আব্বার বিশ শতকের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অনেক অজানা কথা, কিছু প্রসঙ্গ চিরদিনের মতো হারিয়ে যেত।

আমার আব্বা মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ছিলেন একাধারে সাংবাদিক, সাহিত্যিক, সমাজসেবী ও রাজনীতিবিদ। তিনি জামালপুর-শেরপুরবাসীর কল্যাণের জন্য সারাজীবন কাজ করেছেন। ছাত্রজীবনেই তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের (১৮৭০-১৯২৫) একান্ত সান্নিধ্যে এসেছিলেন। অবিভক্ত ভারতের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। বিশ শতকের আধুনিক কবি, শিল্পী, সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগতভাবে পরিচয় ছিল। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'আমেনা প্রেস' থেকে মুদ্রিত সাপ্তাহিক 'তওফিক' পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশকও ছিলেন তিনিই। দীর্ঘ পথচলায় পরিচিত হয়েছেন অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২), হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩), মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) প্রমুখের সঙ্গে তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আজ সেসব স্মৃতির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

আব্বার অপ্রকাশিত ও অগ্রন্থিত বেশ কিছু সাহিত্যকর্ম আমার সংগ্রহে রয়েছে। এগুলো একত্রে প্রকাশের ইচ্ছে রয়েছে। আব্বার বেশ কিছু রচনা দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ হয়ে উঠেছে। আমার আব্বা যে সাহিত্যের একজন উঁচুমাপের সমঝদার ছিলেন তা আমি বুঝেছিলাম অনেক পরে। পিতা হিসেবেও তিনি একজন আদর্শ

পিতা ছিলেন। শত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি সন্তানদের সফল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। আমরা সহোদর তিন ভাই-বোনের প্রতিষ্ঠার পেছনে আব্বার অবদান অবর্ণনীয়। ভাই-বোনদের সন্তান-সন্ততিরাও আজ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। আমার আব্বার ওপর বইটি প্রণয়ন করার জন্য বাংলা একাডেমির কর্মকর্তা শাহ্ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমার আব্বা আজ নেই। আমার জন্য তা যে কত বড়ো বেদনার তা বলে শেষ করা যাবে না। আল্লাহ যেন তাঁকে বেহেস্ত নসিব করেন, সন্তান হিসেবে এই প্রার্থনা করছি।

মির্জা হাউস, আমলাপাড়া
জামালপুর
তারিখ : ১০.০৯.২০২২

বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার
সাবেক বিচারক, আপীল বিভাগ
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

সূচিপত্র



জন্ম : ১৯০৫ মৃত্যু : ১০ই জুন ১৯৮৫

জীবন-কথা

নতুন প্রজন্ম তাঁর নাম সেভাবে শুনে থাকবেন না। তিনি ছিলেন অনেক গুণের একজন মানুষ। পুরো বিশ শতকে জামালপুর-শেরপুরের সাহিত্য সংস্কৃতি-ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের ইতিহাসে যে কয়জন খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গের নাম সগর্বে উচ্চারিত হয় মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার তাঁদের অন্যতম। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের কবল থেকে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার স্বপ্ন তিনিও দেখেছিলেন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আন্দোলন, পাকিস্তান আন্দোলন এবং পরবর্তীকালে স্বাধীন-সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ অভ্যুদয়ে এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ যে অসামান্য ভূমিকা পালন করেছেন, মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার তাঁদের জাগরিত আন্দোলন-সংগ্রামে যতটুকু ভূমিকা রেখে গেছেন তা পরিমাণে সামান্য হলেও এদেশের ইতিহাস ঐতিহ্যে স্বীকৃত ও গ্রহণীয় হবে বহুদিন।

তিনি ভারতের গঠনতান্ত্রিক হোম রুল, স্বরাজ, স্বাধীনতা, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা আন্দোলন–এসব আন্দোলনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী ছিলেন এবং সক্রিয়ভাবে এসব আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বৃহত্তর ময়মনসিংহের জামালপুর-শেরপুরের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে তিনি এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন একাধারে বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সমাজসেবী, দক্ষ প্রশাসক, সংবাদপত্রের সম্পাদক, মুদ্রক ও প্রকাশক। তিনি লেখালিখিতেও যথেষ্ট সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

তিনি ছিলেন একজন যথার্থ সংস্কৃতিমান ব্যক্তিত্ব যিনি সীমিত সুযোগের মধ্য দিয়ে এতদঞ্চলের নানা সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দায়িত্ব পালন করে যশস্বী হন।

ব্রিটিশ আমল ও বাংলাদেশ আমলে দীর্ঘ সময় তিনি এতদঞ্চলে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালন করেন। প্রায় ৩৭ বছর আগে ১৯৮৫ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। প্রায় চার দশক ধরে তিনি ছিলেন বিস্মৃতির অন্তরালে।

দুঃখের বিষয় এই যে, এতকাল ধরে তিনি জামালপুরের স্থানীয় ইতিহাসের আড়ালে থেকে গেছেন। কিন্তু কেন এতকাল বিস্মৃত ও উপেক্ষিত সে প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠতে পারে। এ দীর্ঘ সময়কালে তাঁর জীবনকর্ম নিয়ে কোনোরূপ আলোচনা প্রত্যক্ষ করা যায়নি। দু-একটি গ্রন্থে দু-একটি পঙ্‌ক্তি খণ্ডাকারে উল্লেখ ছাড়া তাঁর কথা খুব একটা শোনা যায় না। সমকালের দুই-চারজন বাদে তাঁর বেশির ভাগ সঙ্গী, সহযোদ্ধারা বর্তমানে আর বেঁচে নেই।

এই প্রসঙ্গে পিতা সম্পর্কে পুত্র বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার জানিয়েছেন, "আব্বার নেশা ছিল ছন্দে ছন্দে পত্র লেখা, অনুষ্ঠানাদির ঘটনা লিখে রাখা। আমাদের বাসা থেকে একবার অনেক জিনিসপত্র খোয়া যায়, আব্বার স্মৃতিবিজড়িত অনেক মূল্যবান স্মারক খোঁজাখুঁজির পরও পাইনি। তাছাড়া বাসা

পরিবর্তনজনিত কারণেও আব্বার লেখা অপ্রকাশিত কবিতা, অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্রপত্র মিসিং হয়।”

ফলে এই জীবনীগ্রন্থের কতিপয় তথ্য মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের পরিবারবর্গের সূত্র ও সমকালের দুই-চারজন সুধীজন থেকে প্রাপ্ত তথ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এতদঞ্চলের স্থানীয় ইতিহাসের গেজেটিয়ারতুল্য বিভিন্ন গ্রন্থ ও এতদঞ্চলের লেখক, সাংবাদিক এবং নির্ভরযোগ্য প্রবীণ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা গেছে।

বিস্মৃত ও উপেক্ষিত স্বাধীনতা সংগ্রামী মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের জীবন-কথা আজ নতুন করে স্মরণ করা হলো।

সমকালীন পরিবেশ-পটভূমি

এই সঙ্গে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের জন্মস্থান নিলক্ষিয়ার সমকালীন ভৌগোলিক অবস্থান এবং পরিবেশ পটভূমি সম্পর্কে আলোকপাত করা একান্ত প্রয়োজন। নিলক্ষিয়া সমকালে জামালপুর মহকুমার দেওয়ানগঞ্জ থানার একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। **১৯৩৭** সালে দেওয়ানগঞ্জ থানার অন্তর্ভুক্ত বকশীগঞ্জ ইউনিয়ন গঠিত হলে নিলক্ষিয়া এই ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়।



বকশীগঞ্জ উপজেলা মানচিত্র

পরবর্তীকালে ১৯৮২ সালে বকশীগঞ্জ থানা, ১৯৮৩ সালে উপজেলা গঠন করা হয়। এ সময় নিলক্ষিয়া ইউনিয়নে উন্নীত হয়। ভারতের মেঘালয় সীমান্তে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে গারো পাহাড়ের সন্নিকটস্থে এ অঞ্চলের অবস্থান। এ অঞ্চলের উপর দিয়ে ব্রহ্মপুত্রের শাখা দশানী নদী প্রবাহিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকালে এ অঞ্চলে পাতিলাদহ পরগনার অন্তর্গত ছিল। পাতিলাদহ পরগনা ছিল পশ্চিম ময়মনসিংহ ও রংপুর জেলাব্যাপী। সুতরাং নিলক্ষিয়া বকশীগঞ্জের একটি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক জনপদ। এ সম্বন্ধে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত 'লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা জামালপুর' গ্রন্থে রয়েছে :

> ব্রিটিশ আমলে বকশীগঞ্জ ছিল দেওয়ানগঞ্জ থানার একটি গ্রাম। ১৯৩৭ সালে দেওয়ানগঞ্জ থানার অন্তর্ভুক্ত বকশীগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা হয়। এ উপজেলা গঠনকালে বকশীগঞ্জ ছিল দেওয়ানগঞ্জ থানার একটি ইউনিয়ন।[১]

বর্তমানে নিলক্ষিয়া ময়মনসিংহ বিভাগের জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত একটি ইউনিয়ন। নিলক্ষিয়ার মানুষ স্থানীয় ভাষায় কথাবার্তা বলে থাকে। এখানকার নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। যেমন–নৌকা বাইচ, বিলের মেলা, হাডুডু, ঘুড়ি ওড়ানো ইত্যাদি।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের পূর্বপুরুষের সঙ্গে এ অঞ্চলে জমিদারিসূত্রে সম্পর্ক ও সহযোগিতার ভাব গড়ে উঠে এবং পরে বিবাহসূত্রে বসতিস্থাপন শুরু হয় তা অনুমান করা যায়। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের ঊর্ধ্বতন পুরুষগণের সঙ্গে ইংরেজ রাজত্ব শুরুর দিকে সুসম্পর্কই ছিল।

এ বংশধারার গুণে তাঁরা ইংরেজ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এ বংশীয় পূর্বপুরুষরা লেখাপড়ায় অগ্রগামী ছিলেন। তাঁরা মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, ভারতে যে সময় ইংরেজ রাজত্ব শুরু হয় সে সময় থেকেই ক্রমেই ইংরেজ সরকার ভারতীয়দের প্রতি শোষণ-নির্যাতন করে।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার জমিদার-জোতদার বংশের সন্তান হয়েও ইংরেজ সরকারের আনুকূল্য লাভের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। তিনি যা চেয়েছিলেন তা এসবের চেয়ে অনেক বড়।

সুতরাং বলা যেতে পারে তৎকালীন সময়ে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের পূর্বপুরুষ, তাঁর পিতা, পিতামহ এবং আত্মীয়স্বজন সকলেই মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন একটি পরিবারের সদস্য ছিলেন। এই পরিবার ইতিহাস ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এ কারণেই মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার এদেশের জাতীয় জাগরণ, স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছিলেন।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের জন্মের পর হতেই সেই সময়ে ভারতবর্ষের ইতিহাসে নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়। এ সময়ে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার বীজের প্রসার ঘটে। এই সময় ভারতীয় জাতীয়তাবাদ স্বদেশি আন্দোলনের উৎপত্তি হয়।

ইংরেজ শাসন অবসানকল্পে মহকুমা শহর জামালপুরের সর্বত্র গণমানসেও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়। এ অঞ্চলের অনেকে স্বদেশি আন্দোলনে যোগ দেন।

১৮২৫ সালে এ অঞ্চলে টিপু শাহের নেতৃত্বে প্রথম ইংরেজ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়। অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে এখানকার মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস অত্যন্ত গৌরবময়। সুতরাং সমকালীন পরিবেশ-পটভূমি মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের মানস-গঠনে ভূমিকা রেখেছে।

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের জন্ম বর্তমান জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত নিলক্ষিয়ার তৎকালীন পাতিলাদহ পরগনার সম্ভ্রান্ত মুসলিম জমিদার পরিবারে। তাঁর জন্ম ১৯০৫ সালে। ময়মনসিংহের চরিতাভিধান অনুসারে তাঁর জন্ম ১৯০৩ সাল। বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার তাঁর বাবার স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন–'বাবার নিকট থেকে শুনেছি তাঁর জন্ম হয় ১৯০৫ সালে।' মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন অনেক দেরিতে।

এ কারণে একাডেমিক পরীক্ষার সার্টিফিকেট অনুসারে তাঁর জন্মতারিখের সঙ্গে প্রকৃত জন্মতারিখের অনেক ব্যবধান রয়েছে। সেকালে আরো অনেকের ক্ষেত্রেই এরূপ ঘটেছে, মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারও তাঁর ব্যতিক্রম নন।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের পিতার নাম মির্জা আসাদ উদ্দিন হায়দার ও মাতার নাম তৈবুন নেসা। তাঁর মাতৃকুল ও পিতৃকুল উচ্চ বংশীয়। তিনি ছিলেন দুই ভাই-বোনের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের বংশের পূর্ব ঐতিহ্য বিদ্যমান। তাঁদের পূর্বপুরুষ মধ্য এশিয়ার মঙ্গোলিয়া হতে ভাগ্যান্বেষণে এদেশে আসেন। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের মির্জা বংশ সম্বন্ধে 'জামালপুরের গণ-ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে রয়েছে :

> মির্জা আসাদ উদ্দীন হায়দার, ঢাকার প্রাচীনতম মোগল জমিদার মির্জা জানে নাজনীন হায়দার সাহেবের বংশধর এবং হাজরাদি পরগনার ১৬ আনার মধ্যে পৌনে ৭ আনা অংশের জমিদার পরিবারের সন্তান। ... এই মির্জাগণ বহু পূর্ব্বে মধ্য এশিয়ার মঙ্গোলিয়ার অন্তর্গত সমরকন্দ নগরীর অধিবাসী ছিলেন। বাবরের ভারত বিজয়ের সময় ইহারা ভারতে আসেন এবং শের সাহের সহিত যুদ্ধে বাবরের ভাগ্য বিপর্য্যয়ের সময় ইহারা পারস্যের সিরাজ নগরে গিয়া বাস করিতে থাকেন। ইহার পর ভারতে মোগল সাম্রাজ্যে কায়েম হইলে ইহারা পুনরায় ভারতে আসেন এবং বাংলার নওয়াব আলীবদ্দি খানের বিশেষ আনুকূল্য লাভ করিয়া ঢাকায় বাস করিতে থাকেন। ইহার পর রাজানুগ্রহে তপে হাজারিবাদি পরগনায় জমিদারী প্রাপ্ত হইয়া তথায় চলিয়া আসেন।[২]

সুতরাং উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের ঊর্ধ্বতন বংশীয় পুরুষ ঢাকার আদি জমিদারগণের অন্যতম মির্জা জানে নাজনীন

হায়দার। এই বংশধরগণ ছিলেন ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের স্থপতি ও প্রথম মোগল সম্রাট বাবরের (রাজত্বকাল ১৫২৬-১৫৩০) অনুসারী।

বাবর ভারতবর্ষে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করলে মির্জা জানে নাজনীন হায়দার বংশীয়রা সুদূর মঙ্গোলিয়া থেকে ভারতবর্ষে বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে মোগল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী বাবরের জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুন চৌসার যুদ্ধে শেরশাহের নিকট পরাজয়বরণ করলে মোগল সাম্রাজ্যের বিপর্যয় ঘটে। ফলে সম্রাট হুমায়ুন ক্ষমতাচ্যুত হন।

এ সময় এই মির্জা বংশীয়রা ভারতবর্ষ ত্যাগ করে পারস্যের সিরাজনগরে বসবাস করতে থাকেন। কিছুকাল পরে সম্রাট হুমায়ুন মোগল সাম্রাজ্যের ক্ষমতাদখলে সক্ষম হলে মির্জা জানে নাজনীন হায়দার বংশীয়রা পুনরায় ভারতবর্ষে বসতি স্থাপন করেন।

কালক্রমে এ মির্জা বংশীয়রা নবাবী শাসনামলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব আলীবর্দী খানের (শাসনামল ১৭৪০-১৭৫৬) বিশেষ আনুকূল্য লাভ করেন। এ সময় এ মির্জাগণ ঢাকায় বসতি স্থাপন করে বসবাস করতে থাকেন।

এরপর রাজানুগ্রহে জমিদারি লাভ করে তপে হাজরাদি পরগনায় কর্ম-ব্যপদেশে চলে আসেন। উল্লেখ্য, পরগনা হলো কিছু গ্রাম নিয়ে গঠিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পূর্ব রাজস্ব ইউনিট। সেই সময় পরাগনা সরকারি প্রতিষ্ঠান ছিল। প্রাচীনকালেও এ ধরনের ইউনিটের অস্তিত্ব ছিল, যদিও এর নাম ছিল ভিন্ন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে কার্যকর করার জন্য এ ধরনের পদক্ষেপের প্রয়োজন ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কার্যকর হলে লর্ড কর্নওয়ালিস প্রশাসন পরগনা পদ্ধতি বিলুপ্ত করে।

হাজরাদি পরগনা বৃহত্তর ময়মনসিংহের অন্তর্গত বেশ কটি গ্রাম নিয়ে কিছু বিস্তৃত এলাকা। এখনো এতদঞ্চলে হাজরাদি নামের গ্রামের অস্তিত্ব বিদ্যমান। পূর্ববঙ্গ গীতিকাতেও হাজরাদি পরগনার নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বংশানুক্রমে মির্জা পরিবারটি ছিল সম্ভ্রান্ত, প্রভাবশালী ও বিত্তবান। এই পরিবারের ঐতিহ্য চেতনার প্রেক্ষাপটও অনন্য। তাঁর পূর্বপুরুষরা ছিল খ্যাতকীর্তি। এঁদের মধ্যে গুণে-মেধায়-প্রতিষ্ঠায় অনেকেই বিশিষ্ট ও বিখ্যাত ছিলেন।

তাঁরা জমিদারি-জোতদারিসহ নানা পেশায় থেকে বিদ্বৎসমাজে খ্যাতি-সুনাম-স্বীকৃতি মর্যাদা অর্জন করেছিলেন। গোলাম মোহাম্মদ তাঁর 'জামালপুরের গণ-ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে আরও লিখেছেন,

> মির্জ্জা আসাদ উদ্দীন হায়দার সাহেব নিলক্ষিয়ার যোতদার শেখ জয়েনুল আবেদীন সাহেবের কন্যাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফলে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার সাহেব জন্মগ্রহণ করেন।'[৩]

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের পূর্বপুরুষরা ছিলেন কেউ জমিদার, কেউ ছিলেন জোতদার। এই পরিবারে বিদ্যাচর্চার ইতিহাস পুরোনো। উনিশ শতকের মধ্যভাগে যখন এতদঞ্চলের মুসলমান শিক্ষাদীক্ষায় একেবারেই পিছিয়ে ছিল তখন এই

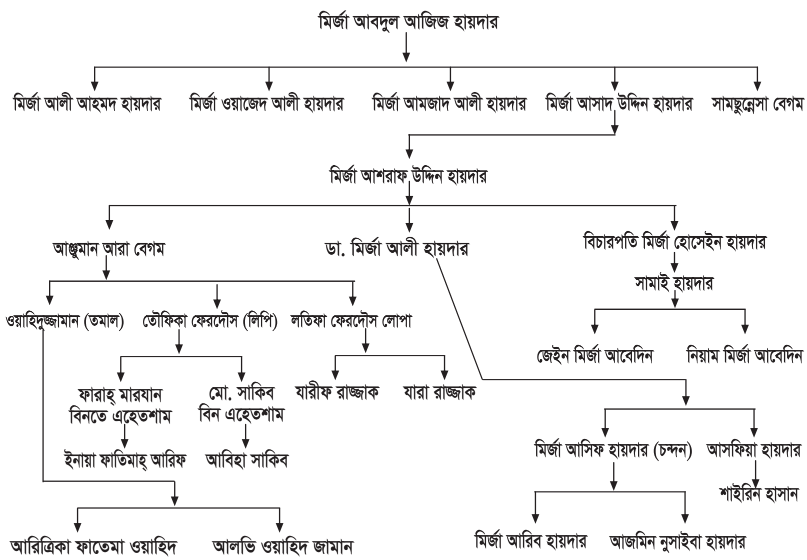
পরিবার জ্ঞানচর্চায় অগ্রসর ভূমিকা পালন করেছিল। এ বংশে সারস্বত এই ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

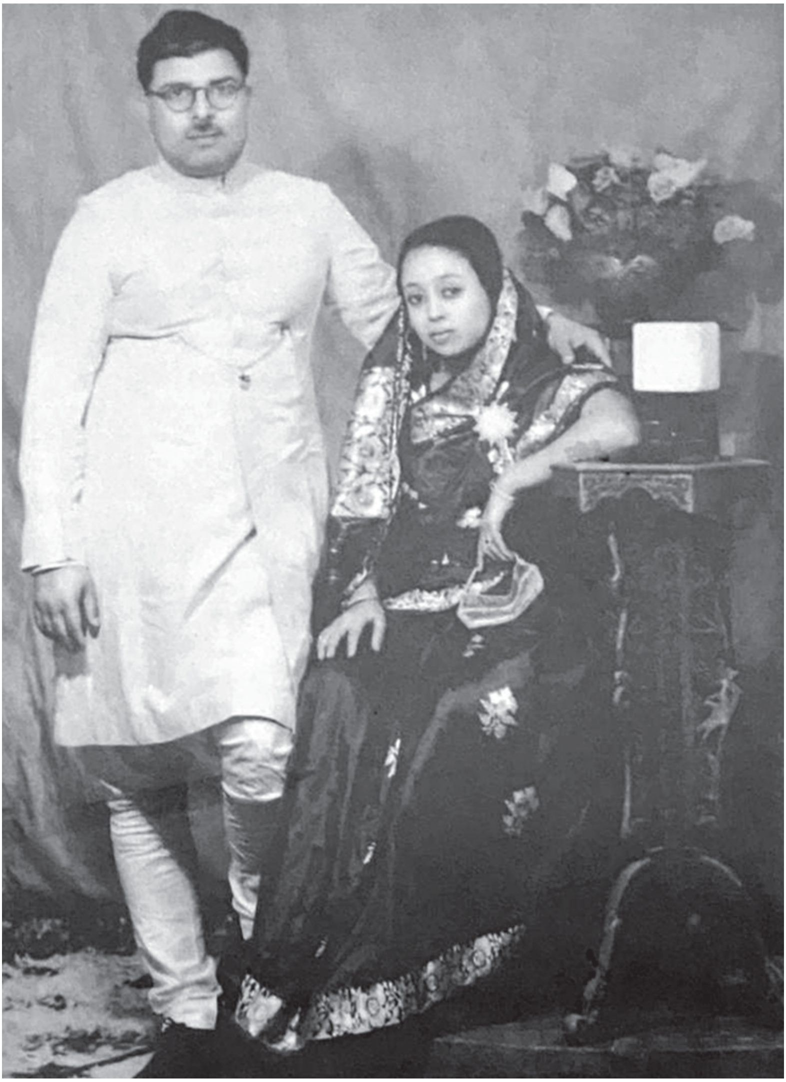
নিলক্ষিয়ার এ পরিবার বংশপরম্পরায় ঐতিহ্যবাহী। এ পরিবারের বসতবাড়িকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে স্কুল, মক্তব, মসজিদ। এই অঞ্চলে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের বাড়িটি শেখ, কখনো মিঞা, কখনো জমিদার বাড়ি, কখনো কর্তা বাড়ি হিসেবে পরিচিত। তাঁদের পারিবারিক সারস্বত ধারাটি এখনো বিদ্যমান।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের পিতা মির্জা আসাদ উদ্দিন হায়দার পরিণয়সূত্রে নিলক্ষিয়া গ্রামে বসবাস করেন। পরে স্থায়ী নিবাসও গড়ে তোলেন এই গ্রামেই। কর্মজীবনে তিনি জোতদারি দেখাশোনা ও স্থানীয় প্রভাবশালী এলিট ছিলেন। তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় গুণে স্থানীয় জমিদারদের জোতদারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

নানাসূত্রে জমিদার জোতদারদের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। ফলে জমিদার-জোতদারদের নিকট থেকে তিনি উচ্চ মর্যাদা পেতেন। এমনিভাবে বিদ্বান ও বিত্তবান হিসেবে তাঁর যশ ও প্রতিপত্তি ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের স্ত্রীর নাম আমেনা খাতুন। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের বংশের উর্ধ্বতন পুরুষের নাম-পরিচয় সঠিকভাবে পাওয়া দুর্লভ। এই প্রসঙ্গে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের বংশলতিকাটি নিম্নরূপ :





মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ও তাঁর স্ত্রী আমেনা খাতুন

জীবন-দর্শন

বঙ্গভঙ্গের পরিস্থিতি-উত্তর স্বদেশি আন্দোলন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া, ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে যখন অস্থিরতা বিরাজমান তখন একজন মানুষ

স্বাভাবিকভাবেই সংগ্রামী হতে পারে। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের ক্ষেত্রেও এই বিষয়াবলি কাজ করেছে।

তাছাড়া ঐতিহ্য ও অনুপ্রেরণা তিনি জমিদার-জোতদার নানা জয়নুল আবেদিনের নিকট থেকে পেয়েছিলেন। পারিবারিক সূত্রেই তাঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন জমিদার। প্রগতিশীল রাজনীতিচর্চার ঐতিহ্য তিনি অর্জন করেছিলেন অনেকটা উত্তরাধিকার সূত্রেই।

ছাত্রজীবনেই তিনি ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯২০-১৯২১ সালের দিকে ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ার সময় তিনি সক্রিয়ভাবেই কংগ্রেসের রাজনীতিতে জড়িয়ে যান। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের রাজনৈতিক দর্শনমূলে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতি ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অসাম্প্রদায়িক নীতি প্রেরণা দিয়েছে।

সমকালে তরুণদের জীবনে মহাত্মা-দেশবন্ধু-নেতাজি প্রমুখের আদর্শই প্রভাব ফেলেছিল। তিনি রাজনৈতিক জীবনে এঁদের দ্বারাই উদ্দীপ্ত হয়েছেন। অতঃপর ১৯৪৬-পরবর্তীকালে মুসলিম লীগে সোহ্‌রাওয়ার্দীর আদর্শে উদ্দীপ্ত হন এবং পাকিস্তান আন্দোলনে কাজ করেন।

পরবর্তীকালে পাকিস্তানি শাসকবর্গ বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে বিমাতাসুলভ আচরণ করলে তিনি পূর্ব বাংলার গণমানুষের অধিকারের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন।

পারিবারিক সূত্রে ও সুধীজন থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় তাঁর সম্পাদনায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত ‘তওফিক’ পত্রিকার মাধ্যমে তৎকালীন শাসকদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রভাষা বাংলার জন্য তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

ভাষা আন্দোলনের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা পালন এবং পরবর্তীকালে যুক্তফ্রন্টে নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণার পক্ষে ভূমিকা পালনের জন্য ‘তওফিক’ পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল করেছিল তৎকালীন সরকার।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে তিনি জামালপুর শহরের অনেক হিন্দু প্রতিবেশীকে সাহায্য করেছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের মনে সঞ্চারিত করেছেন সাহস।

বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোর কথা প্রসঙ্গে বলেন, “বড় ভাই (মির্জা আলী হায়দার) সাইন্সের ছাত্র ছিলেন। তিনি আশেক মাহমুদ কলেজের কেমিস্ট্রি ল্যাবের সরঞ্জামাদি দিয়ে হাত বোমা তৈরি করার প্রশিক্ষণসহ থ্রি নট থ্রি বন্দুক চালানো প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন।”

''আমি বর্তমান রাজশাহী ক্যাডেট কলেজে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনার সুবাদে রাইফেল, থ্রি নট থ্রি রাইফেল চালানোর কৌশল ও প্রশিক্ষণ কিছুটা আগেই জানা ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা দুই সহোদর ভাই এসব প্রশিক্ষণ ভালো করেই দিয়েছিলাম।" এ সময় আব্বা উৎসাহিত করতেন এবং বলতেন, "ভালো করে ট্রেনিংটা শিখিয়ে দিও।"

জামালপুরের মাটি ও মানুষের জন্য মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের ছিল গভীর মমত্ববোধ। অন্যের বিপদে-আপদে এগিয়ে দিতেন তাঁর হাতখানি। গ্রামের সঙ্গে ছিল তাঁর নাড়ির যোগ। তাঁদের সঙ্গে তিনি প্রাণ খুলে মিশতেন।

পরিবার পরিচিতি

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের বিবাহ হয় রংপুর জেলার জমিদার মনোয়ার হোসেন খান চৌধুরীর কন্যা আমেনা খাতুন (মৃত্যু ০৯.১১.২০০৯)-এর সঙ্গে। আমেনা খাতুন ছিলেন গৃহিণী। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও তিনি সংসারের হাল ধরেছেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা।

মাতা সম্পর্কে পুত্র বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার বলেন, "আমার মা পাড়া-প্রতিবেশীদের খোঁজখবর নিতেন। তাদের বিপদে সহায়তা করতেন। আমার মা-ই আমার জ্ঞানের ভিত্তি। আমাদের ভাই-বোনদের সফলতার পেছনে আমার মায়ের অবদান অবর্ণনীয়।"

আমেনা খাতুন ছিলেন অত্যন্ত কর্তব্যনিষ্ঠ ও নিরহংকারী। তাঁর সরলতা ছিল অকৃত্রিম। স্ত্রীর প্রতি মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের গভীর ভালোবাসা ছিল। পরিণত বয়সে আমেনা খাতুন ২০০৯ সালে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। জামালপুর পৌর কবরস্থানে তাঁর মরদেহ দাফন করা হয়।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ও আমেনা খাতুন এই দম্পতির দুই পুত্র ও এক কন্যাসন্তান রয়েছে। তাঁদের পুত্রদের নাম ডা. মির্জা আলী হায়দার ও বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার। একমাত্র কন্যার নাম আনজুমান আরা বেগম।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের সর্ব জ্যেষ্ঠ সন্তান আনজুমান আরা বেগম (জন্ম ০৪.১১.১৯৪২-মৃত্যু ৯.০৬.২০১২) ছিলেন গৃহিণী। তাঁর স্বামী ফখরুজ্জামান (মৃত্যু ১২.০৩.১৯৯৯) ছিলেন এদেশের পথিকৃৎ দন্ত চিকিৎসক। ফখরুজ্জামান পাঞ্জাব থেকে বিডিএস ডিগ্রি লাভ করেন।

আনজুমান আরা বেগম ১৯৬৪ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ ডিগ্রিধারী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি সহপাঠী হিসেবে বিশিষ্ট গবেষক ও



প্রৌঢ়া বয়সে আমেনা খাতুন (বয়স আনুমানিক ৭০ বছর)

জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলামসহ অনেক কীর্তিমান-খ্যাতিমানকে পেয়েছিলেন। আনজুমান আরা বেগম ছিলেন তৎকালীন জামালপুর মহকুমা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম এমএ ডিগ্রিধারী। পিতার মতো তাঁরও সাহিত্যচর্চার ঝোঁক ছিল।

প্রখ্যাত দন্ত চিকিৎসক ডা. ফখরুজ্জামানের সঙ্গে বিবাহের পর তিনি আনজুমান আরা জামান নামে সুধিমহলে সমধিক পরিচিত লাভ করেন। আনজুমান আরা জামান নামে তিনি লেখালিখি করতেন।

শিশুদের জন্য তাঁর দুটি ক্ল্যাসিকতুল্য ছড়ার বই প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রকাশিত দুটি গ্রন্থ : 'সোনামনিদের ছড়া' (২০০৫), 'মনের মতো ছড়া' (২০০৮)।

আনজুমান আরা জামানের 'সোনামনিদের ছড়া' গ্রন্থটির গ্রন্থ-উন্মোচন অনুষ্ঠানে জাতিসত্তার কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা (জন্ম. ৩০.০৯.১৯৪৯) উপস্থিত ছিলেন। উক্ত



মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের কন্যা আনজুমান আরা জামান
রচিত বইয়ের প্রচ্ছদ ও আখ্যাপত্রের চিত্র

অনুষ্ঠানে তিনি গ্রন্থটির ছড়াগুলোকে ক্ল্যাসিকতুল্য ও মৌলিক বলে উচ্চ প্রশংসা করেছেন। এছাড়া ‘মনের মতো ছড়া’ গ্রন্থটির ভূমিকায় ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী (১৯২৭-২০২০) ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এই গ্রন্থটির প্রচ্ছদ ও অলংকরণ করেছেন শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী (১৯৩২-২০১৪)। এ গ্রন্থটির গ্রন্থালোচনায় সুলিখিত প্রশংসা করেছেন কবি আসাদ চৌধুরী (জন্ম. ১১.০২.১৯৪৩)।



লেখক পরিচিতি

আনজুমান আরা জামান জামালপুরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম ৪ঠা নভেম্বর ১৯৪২ সাল। পিতা মরহুম মিরজা আশরাফ উদ্দিন হায়দর সাহিত্যিক, সমাজ কর্মী ও অধুনা লুপ্ত সাপ্তাহিক পত্রিকা "তওফিক" এর সম্পাদক ছিলেন। মা গৃহিনী। তার প্রথম প্রকাশিত গল্প "কাপড়" সাপ্তাহিক তওফিকে প্রকাশিত হয়। অধুনা লুপ্ত ললনা তেও তাঁর গল্প ও ছড়া প্রকাশিত হয়েছে। ইদানীং কালে নানা পত্র প্রত্রিকায় তার ছড়া প্রকাশিত হয়েছে। তিনি প্রখ্যাত দন্ত চিকিৎসক মরহুম ডাঃ এফ জামানের পত্মী। ডাঃ এফ জামান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম গ্রাজুয়েট দন্ত চিকিৎসক ছিলেন। আনজুমান আরা জামান ১৯৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে এম, এ ডিগ্রী লাভ করেন। অল্প কিছু দিন স্কুলে শিক্ষকতা করেন। বাংলাদেশ বেতারেও তিনি অনুষ্ঠান করতেন। এখন তিনি সমাজ কল্যাণ মূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। ভারত, পাকিস্তান, নেপালে থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডা ও ইউরোপের অনেক দেশ ভ্রমন করেছেন।

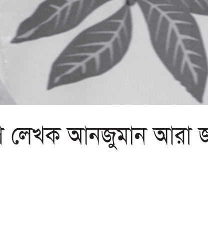
ISBN 984-720-096-3



আনজুমান আরা জামান

- পিতা : মরহুম মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার *(সাংবাদিক সাহিত্যিক রাজনীতিবিদ)*।
- মাতা : বেগম আমিনা খাতুন।
- স্বামী : ডাক্তার এফ. জামান, বিডিএস *(পাঞ্জাব)*। ষাট, সত্তর ও আশির দশকের বাংলাদেশের প্রখ্যাত দন্তচিকিৎসক।
- পৈত্রিক নিবাস : আমলা পাড়া জামালপুর জেলা শহর।
- জন্ম : ৪ নভেম্বর, ১৯৪২। জামালপুর জেলার এক ঐতিহ্যবাহী, সম্ভ্রান্ত ও বনেদী পরিবার-'মির্জা পরিবার'-এ জন্ম।
- শিক্ষা : এম.এ., বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ১৯৬৪, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা।
- পেশা : সাহিত্যচর্চা। মূলতঃ শিশু সাহিত্যাঙ্গনে পদচারণা।
- প্রকাশিত গ্রন্থ :

১. সোনামনিদের ছড়া
২. মনের মতো ছড়া
(শিশু- কিশোরদের হৃদয়গ্রাহী ছড়ার বই)।



'সোনামনিদের ছড়া' ও 'মনের মতো ছড়া' বইয়ের ফ্ল্যাপে লেখক আনজুমান আরা জামানের পরিচিতি

আনজুমান আরা জামান ছিলেন একজন বিদুষী নারী। তিনি কেবল পারিবারিক কাজের মধ্যেই নিজেকে ব্যস্ত রাখেননি, নানা সাংস্কৃতিক, সামাজিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

তিনি ছিলেন গুলশান লেডিস কমিউনিটি ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এ ক্লাবের তিনি ২০০৯-২০১১ মেয়াদের ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। তিনি পারিবারিক ঐতিহ্য ধারণ করতেন। তাঁর নিকট অনেকে উপকৃত হয়েছেন।

আনজুমান আরা বেগম এক পুত্র–ওয়াহিদুজ্জামান তমাল (জন্ম. ৩০শে আগস্ট ১৯৬২) এবং দুই কন্যা–তৌফিকা ফেরদৌস লিপি (জন্ম. ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৬৫) ও লতিফা ফেরদৌস লোপার (জন্ম. ১৯৭০) জননী।





গুলশান লেডিস কমিউনিটি ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আনজুমান আরা জামানের প্রতিকৃতি ও তাঁর সঙ্গে অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতাগণ

ওয়াহিদুজ্জামান তমাল খ্যাতিমান দন্ত চিকিৎসক। তিনি ইউনিভার্সিটি ডেন্টাল কলেজ হাসপাতালের চেয়ারম্যান ও ঢাকার গুলশানস্থ জামান ডেন্টাল ক্লিনিকে কর্মরত রয়েছেন। তার দুই সন্তান আরিত্রিকা ফাতেমা ওয়াহিদ (জন্ম.২৭.৭.১৯৯৩) ও আলভি ওয়াহিদ জামান (জন্ম. ২৭.১১.১৯৯৬)। আনজুমান আরা জামানের দুই কন্যা। তৌফিকা ফেরদৌস লিপি পেশায় গৃহিণী ও লতিফা ফেরদৌস লোপা লন্ডনে বসবাস করছেন। তৌফিকা ফেরদৌস লিপির দুই সন্তান ফারাহ্ মারযান বিনতে এহেতশাম (জন্ম. ৩১.১.১৯৯১) ও মো. সাকিব বিন এহেতশাম (জন্ম. ৯.১১.১৯৯৪)। ফারাহ্ মারযান বিনতে এহেতশামের একমাত্র কন্যার নাম ইনায়া ফাতিমাহ্ আরিফ (জন্ম. ১৪.২.২০১৭) এবং সাকিব বিন এহেতশামের একমাত্র কন্যার নাম আবিহা সাকিব (জন্ম.২০.৯.২০২৪)। লতিফা ফেরদৌস লোপার (জন্ম. ১৫.২.১৯৭০) দুই সন্তানের নাম হচ্ছে জারীফ রাজ্জাক (জন্ম. ৫.১.২০০৩) ও জারা রাজ্জাক (জন্ম. ২১.৪.২০০৮)।



মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের জ্যেষ্ঠ পুত্র ডা. মির্জা আলী হায়দার (১৯৫২-২০১৭)

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের জ্যেষ্ঠ পুত্র ডা. মির্জা আলী হায়দার (জন্ম. ০১.১০.১৯৫২-মৃত্যু. ২২.০৩.২০১৭) একজন প্রখ্যাত দন্ত চিকিৎসক ছিলেন।

তিনি ডিএমসিআর ফাউন্ডেশনের (ইউনিভার্সিটি ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

এছাড়াও তিনি বকশীগঞ্জ সমিতি, ঢাকার সভাপতি ও অ্যাডভান্স টেকনোলজি অ্যান্ড বি এম কলেজের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন। ডা. মির্জা আলী হায়দার ২০১৭ সালের ২২শে মার্চ ঢাকায় ইন্তেকাল করেন।

ডা. মির্জা আলী হায়দারের স্ত্রী ডা. হোসনে আরা বেগম ইউনিভার্সিটি ডেন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ এবং উক্ত কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তাঁদের দুই সন্তান রয়েছে। তারা হলেন একমাত্র পুত্র–মির্জা আসিফ হায়দার চন্দন (জন্ম. ৩০শে জুলাই ১৯৭৯) ও কন্যা–আসফিয়া হায়দার (জন্ম. ৭ই ডিসেম্বর ১৯৮৩)। মির্জা আসিফ হায়দার চন্দন এরিকসন টেলিকম কোম্পানির অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং আসফিয়া হায়দার যুক্তরাজ্যের কার্ডিফ শহরে বসবাস করছেন।

মির্জা আসিফ হায়দার চন্দনের এক পুত্র–মির্জা আরিব হায়দার ও এক কন্যা–আজমিন নুসাইবা হায়দার। আসফিয়া হায়দারের এক কন্যা শাইরিন হাসান।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের কনিষ্ঠ পুত্র বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার (জন্ম. ০১.০৩.১৯৫৪) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের অন্যতম জ্যেষ্ঠ বিচারক ছিলেন। একজন সৎ, দক্ষ ও নিষ্ঠাবান বিচারক হিসেবে তিনি অত্যন্ত সুপরিচিত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭৩-১৯৭৪ সেশনে চালু হওয়া এলএল.বি. অনার্স ও পরে এলএল.এম. কোর্সের প্রথম ব্যাচের ছাত্র। এই কোর্সের উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে তিনিই প্রথম বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের প্রথম বিচারক হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২১ সালেই। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত এখানে ২ বছর মেয়াদি এলএল.বি. সান্ধ্যকালীন কোর্স চালু ছিল।

বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার বিচারক পদে আসীন হওয়ার পূর্বে বাইশ বছর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আইন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আইনজীবী হিসেবে কাজ শুরু করেন ১৯৮১ সালে। তিনি খ্যাতনামা আইনজীবী খন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমদ (১৯২৫-২০১৪)-এর জুনিয়র হয়ে কাজ করেন। তিনি ১৯৯৫ সালে আপীল বিভাগে আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্ত হন।

বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার ৩রা জুলাই ২০০১ সালে হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং একই বিভাগে স্থায়ী বিচারক নিযুক্ত হন ৩রা জুলাই ২০০৩ সালে। তিনি ৮ই ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সালে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।

বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার ২০২১ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি সংবিধান অনুযায়ী ৬৭ বছর পূর্ণ হওয়ায় অবসর গ্রহণ করেন। বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার আইনজীবী হিসেবে যেমন অত্যন্ত জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তেমনি বিচারক হিসেবেও তিনি ন্যায়নীতি ও প্রজ্ঞার জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। ন্যায়নীতি বজায় রেখে তিনি দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি দীর্ঘ বিশ বছর বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন।

কর্মক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনন্য নীতিবান বিচারক। বিচারক জীবনে তিনি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ অনেক মামলার ঐতিহাসিক এবং সময়োপযোগী রায় প্রদান করেছেন। তিনি উচ্চ আদালতে অনেক নজির সৃষ্টিকারী গুরুত্বপূর্ণ রায় প্রদান করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। যেমন–ষোড়শ সংশোধনী মামলা, ত্রয়োদশ সংশোধনী মামলা ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার প্রদত্ত রায় ও আদেশসমূহের মধ্যে দু-একটি তুলে ধরা হলো।

২০১৬ সালে বিজিএমইএ (বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতি) ভবন অবিলম্বে ভেঙে ফেলার আপীল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায়টির লেখক ছিলেন তিনি। তৎকালীন প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের তিনিসহ অন্য দুই বিচারপতি তাঁর রায়ে একমত পোষণ করেন।

তিনি হাইকোর্ট বিভাগে বিচারক থাকাকালীন ২০১৪ সালে নারায়ণগঞ্জে আলোচিত সাত খুনের ঘটনায় র‍্যাবের সাবেক তিন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তারের এক যুগান্তকারী আদেশ দিয়েছিলেন। এই আদেশের কয়েকদিন পরেই ওই তিন কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনীর মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের অপসারণ ক্ষমতা সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল থেকে সংসদের উপর ন্যস্ত করা হয়। ষোড়শ সংশোধনী মামলায় সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত সংশোধনীকে অসাংবিধানিক হিসেবে ঘোষণা করেন। বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার এই মামলায় পৃথক রায়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় আলোচনা করেন। তন্মধ্যে বিচারক নিয়োগ পদ্ধতি ও সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ উল্লেখযোগ্য।

সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী মামলায় হাইকোর্ট বিভাগের একটি বৃহত্তর বেঞ্চে ২০০৪ সালে বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার এ সংশোধনীর পক্ষে মত প্রকাশ

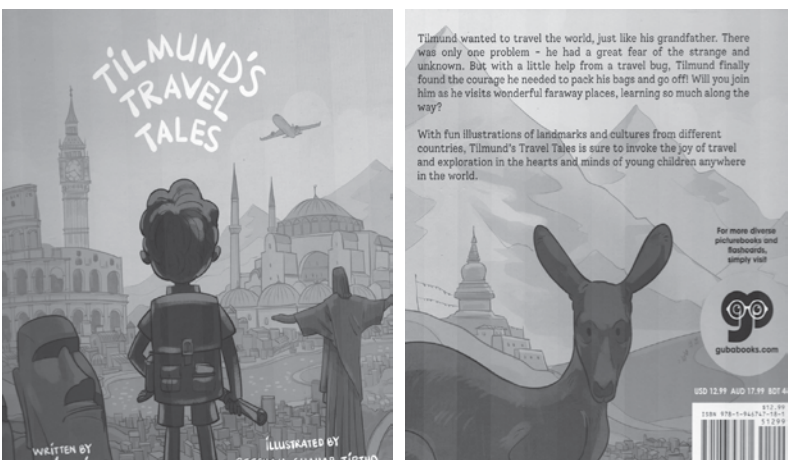
করেন এবং ত্রয়োদশ সংশোধনীকে বৈধ হিসেবে ঘোষণা করেন। তিনি পৃথক রায়ে ত্রয়োদশ সংশোধনী সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয় বলে মতামত দেন।

বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার তাঁর রায়ে বলেন যে, গণতন্ত্র আমাদের সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অংশ এবং অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য। আর ত্রয়োদশ সংশোধনী অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থাকে উন্নত করেছে।

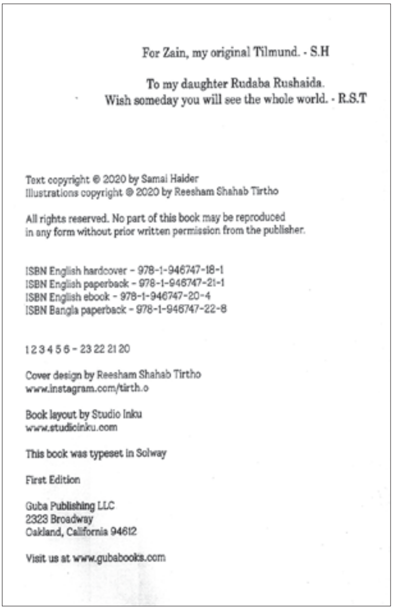
বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার প্রদত্ত রায় ঢাকা ল' রিপোর্টস (ডিএলআর), বিএলডি, বিএলসি, এডিসি (অ্যাপিলেট ডিভিশন ডিসিসন্স)-সহ দেশ-বিদেশের আইন সাময়িকীতে রিপোর্টেড হয়েছে। তাঁর রায়ের ভাষা প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য। তিনি বোধগম্য ইংরেজি ভাষায় সাবলীল ভঙ্গিতে জটিল আইনি সমাধান ও ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন। তাঁর প্রদত্ত রায়গুলো বাংলাদেশের আইন অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দারের স্ত্রী অ্যাডভোকেট সাদিয়া রওশন জাহান বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের খ্যাতিমান আইনজীবী এবং বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতির (সংক্ষেপে BELA) নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তাঁদের এক কন্যাসন্তান রয়েছে সামাই, হায়দার। সামাই হায়দার (জন্ম. ২৫.০৫ ১৯৮৪) পেশায় একজন অর্থনীতিবিদ। তিনি বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন শহরে বসবাসরত তাঁর লেখালিখি, ভ্রমণ ও শিল্প-সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ রয়েছে।



মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের পৌত্রী সামাই হায়দার রচিত বইয়ের প্রচ্ছদের চিত্র



For Zain, my original Tilmund. - S.H

To my daughter Rudaba Rushaida.
Wish someday you will see the whole world. - R.S.T

Text copyright © 2020 by Samai Haider
Illustrations copyright © 2020 by Reesham Shahab Tirtho

All rights reserved. No part of this book may be reproduced
in any form without prior written permission from the publisher.

ISBN English hardcover - 978-1-946747-18-1
ISBN English paperback - 978-1-946747-21-1
ISBN English ebook - 978-1-946747-20-4
ISBN Bangla paperback - 978-1-946747-22-8

1 2 3 4 5 6 - 23 22 21 20

Cover design by Reesham Shahab Tirtho
www.instagram.com/tirth.o

Book layout by Studio Inku
www.studioinku.com

This book was typeset in Solway

First Edition

Guba Publishing LLC
2323 Broadway
Oakland, California 94612

Visit us at www.gubabooks.com



মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের পৌত্রী সামাই হায়দার রচিত বইয়ের আখ্যাপত্রের চিত্র

তাঁর ‘টিলমান্ডস ট্রাভেল টেলস’ (গুবা বুকস, ২০২০) শিশুতোষ বইটি বিখ্যাত। তাঁর দুই পুত্রসন্তান রয়েছে–জেইন মির্জা আবেদিন (জন্ম. ৬ই ডিসেম্বর ২০১৫) ও নিয়াম মির্জা আবেদিন (জন্ম. ১লা এপ্রিল ২০২০)।

শৈশবকাল

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের শৈশবকাল নিলক্ষিয়াতেই অতিবাহিত হয়। শৈশবের সময়ে তাঁর মা-বাবা ইন্তেকাল করেন। শিশুকালেই তাঁর মনে দারুণ আঘাত আসে। তাঁর একটিমাত্র বোন ছিল। শৈশবে এত বড় আঘাতকে বুঝতে দেননি তাঁর নানা-নানি।

যথেষ্ট আদরযত্নে তাঁর শৈশবকাল কৈশোরের দিনগুলো অতিবাহিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে শৈশবে তাঁর প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন নানা। নানা তাঁকে তাঁর সমস্ত প্রজ্ঞা-ভালোবাসা দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর কাছেই প্রথম শিক্ষালাভ হয়।

নানা জমিদার-জোতদার জয়নুল আবেদিন তাঁকে অত্যধিক স্নেহ করতেন। সেকালে তাঁর নানার পরিবারে শিক্ষার প্রচলন ছিল। নানা জয়নুল আবেদিনের পরিবারটি ছিল যৌথ পরিবার।

কথায় বলে, যৌথ পরিবারের সন্তান দরদি, সামাজিক ও উদারমনা হয়। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের ক্ষেত্রে এ কথার ফল পুরোপুরি মিলেছে। তিনি সম্ভ্রান্ত পরিবারের আদরযত্নে বড় হলেও শৈশবে তাঁর বহু খেলার সাথি ছিল নিতান্তই সাধারণ পরিবারের সন্তানরা।

এ সকল খেলায় সাথিদেরকে তিনি পরবর্তীকালে মনে রেখেছিলেন। এই নিয়ে তিনি গর্ব করতেন। তবে নানা জয়নুল আবেদিনের স্মৃতি কখনো ভোলেননি তিনি।

সমকালে ছবির মতো গ্রাম ছিল নিলক্ষিয়া। নিলক্ষিয়ার নিসর্গ সৌন্দর্য তাঁকে মোহিত করে রাখত। নিলক্ষিয়াতে তাঁর নানার পারিবারিক স্কুল ছিল।

এ স্কুলে তিনি প্রথম শিক্ষা গ্রহণ করেন। ধরাবাঁধা পড়াশোনার প্রতি তাঁর ছিল প্রবল অনীহা। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের শৈশবকাল দুরন্তপনা, খেলার সাথিদের নিয়ে বাধাহীন ছুটে বেড়ানোর মধ্যে দিয়েই কেটেছে।

বাল্যজীবন

নিলক্ষিয়া গ্রামের বাড়িতে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। তিনি শিশুকালেই পিতৃমাতৃহীন হয়েছিলেন। নানা-নানির স্নেহে তিনি বেড়ে উঠেছেন। সেই সময় তিনি নিজ গৃহে মৌলবিদের নিকট ও পারিবারিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করেন।

এক্ষেত্রে তাঁর নানা-নানির ভূমিকা ছিল অগ্রণী। সে যুগে অভিজাত মুসলিম পরিবারে বাল্যে গৃহে ও নিজেদের শিক্ষালয়ে শিক্ষা লাভ করা এটাই রেওয়াজ ছিল।

অন্যান্য মুসলিম অভিজাত পরিবারের ন্যায় মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের প্রাথমিক শিক্ষা আরবি, ফার্সি সাথে বাংলা ভাষাতে শুরু হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্মে বাল্যকালেই। ফলে দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ জন্মে।

সেকালে বেশির ভাগ মুসলমানরা শিক্ষাদীক্ষাহীন ছিল। সেই তুলনায় মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার এমন এক বিদ্যোৎসাহী পরিবারে জন্মেছেন বলে শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর বাল্যকাল সেকালের অপরাপর বালকদের মতোই কেটেছে।

খেলাধুলা, কিস্‌সা-কাহিনি, পুথিপাঠ, যাত্রা প্রভৃতি আবহমান বাংলা সংস্কৃতি দেখতে দেখতে বাল্য-কৈশোরের দিনগুলো অতিক্রম করেছেন।

শিক্ষাজীবন

১৯১৩ সালে স্বীয় গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন শেষে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারকে ঐতিহ্যবাহী ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে ভর্তি করা হয়। পড়াশোনায় তিনি



যৌবনে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার (বয়স আনুমানিক ২৫ বছর)

মনোযোগী ছিলেন। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তাঁর অংশগ্রহণ ছিল। খেলাধুলায় আকর্ষণ ছিল ফুটবল ও ক্রিকেটে।

ফুটবল তাঁর ছিল প্রিয় খেলা। তখন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ছিল তুঙ্গে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এবং স্বদেশি আন্দোলনের রেশ তখনো ছিল।

কিশোর মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার এসব নিজ চোখে দেখেছেন। উপরন্তু সেকালের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে পরিচয়ও ছিল।

এ সময় তরুণ ব্যারিস্টার গান্ধীজি আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের প্রাপ্য অধিকার আন্দোলন শেষে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ব্রিটিশ বিরোধী স্কুলের বিপ্লবী ছাত্রদের আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। সেই সময় স্কুল থেকে বের হয়ে আসা, ধর্মঘটে যোগ দেওয়া ছিল আন্দোলন কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ দিক।

এসব কর্মকাণ্ড মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের কিশোর মনকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। এ কারণে ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগেই বিপ্লবী দলের সঙ্গে তাঁর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, অল্প বয়সে তিনি হয়ে উঠেছেন এক নির্ভরযোগ্য কংগ্রেসি কর্মী ও সদস্য।

ফলে ময়মনসিংহ জিলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষার স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা হলো না। ব্রিটিশ বিরোধী ছাত্র-রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়ার ফলেই তাঁর সম্ভাবনাময় ছাত্র জীবনের ছেদ পড়ল।

সমসাময়িক বন্ধুরা সবাই ছিল মেধাবী যাঁরা পরবর্তীকালে অনেকে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হয়েছিল। এই নিয়ে তাঁর কোনো খেদ ছিল না, বরং গর্ব করতেন।

এই বিষয়ে পিতা সম্পর্কে পুত্র বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার বলেন, "আব্বার সমসাময়িক অনেক বন্ধু বিভিন্ন ক্ষেত্রে খুবই প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ জামালপুরে আমাদের আমলাপাড়ার বাসায় এসেছেন।"

ছাত্র-রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ থেকে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার নিজেকে সরিয়ে নিলেও জ্ঞানচর্চা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেননি। তাঁর আরবি, ফার্সি ও উর্দু ভাষায়ও দখল ছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার দীর্ঘ সময় পরে আবার পড়াশোনায় ফিরে আসেন।

এ কারণে তিনি বেশ দেরিতে ১৯৩৯ সালে বর্তমান শেরপুর জেলার গোবিন্দকুমার (জি. কে.) পিস মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউশন থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।[৪]



আনুমানিক বিয়াল্লিশ বছর বয়সে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার

অতঃপর তিনি বর্তমানে সরকারি আনন্দমোহন কলেজ থেকে ১৯৪১ সালে আইএ পাস করেন।[৫] এই কলেজে তিনি ১৯৪২-১৯৪৩ শিক্ষাবর্ষে বিএ ক্লাসে ভর্তি হন। এ সময় দেশে দুর্ভিক্ষ চলেছিল।

এই মন্বন্তরে তিনি সক্রিয়ভাবে ত্রাণকার্যে যুক্ত হয়েছিলেন। এ কারণে কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে সেই বছর আসন্ন বিএ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়নি। তিনি পরের বছর ১৯৪৪ সালে বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

দরজি আবদুল ওয়াহাব তাঁর 'ময়মনসিংহের চরিতাভিধান' গ্রন্থে লিখেছেন, 'তিনি পরে বিএ পাস করেন।'[৬]

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ম্যাট্রিক থেকে বিএ পরীক্ষা পর্যন্ত পাস করেন বেশ পরিণত বয়সে। এতে বোঝা যায়, বিদ্যাশিক্ষার প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার ফলে তাঁর লেখাপড়ার ছেদ পড়লেও জ্ঞানার্জনের প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ বিস্মিত করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দীর্ঘ সময় পরে যখন তাঁর একাডেমিক পড়াশোনা চলেছিল সেই সময় একাডেমিক লেখাপড়ার সমান্তরালে নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত ফুটবলার।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার চল্লিশের দশকের শুরুতে বিএ ক্লাসের ছাত্র থাকাকালেই জামালপুর মহকুমার তৎকালীন শেরপুর থানার প্রথম শ্রেণির অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হয়েছিলেন।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড

একজন ব্যক্তির রাজনৈতিক জাগরণের নেপথ্যে সমকালীন সমাজ ও সময় নিঃসন্দেহে গুরুত্বহ। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের ক্ষেত্রেও এ কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। তাঁর জন্ম ১৯০৫ সালে। দেশের শাসন ক্ষমতা তখন ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ব্রিটিশ-রাজের দখলে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার এ ক্ষমতা গ্রহণ করেছিল পলাশীর প্রান্তরে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে কূটকৌশলে পরাজিত করে। ব্রিটিশ বেনিয়া সরকার এদেশে যে শাসন-শোষণ-অত্যাচার-নির্যাতন-নৈরাজ্য-লুণ্ঠন করে ইতিহাসে তার কোনো তুলনা নেই।

এর পরিণতিতে পুরো ইংরেজ শাসনামলই ছিল ভারতবর্ষের জন্য এক দুঃসময়। তবে বিশ শতকের প্রথম চার দশক ছিল এক বিক্ষুব্ধ সময়। এ সময় ভারতবর্ষের যে অগ্নিরূপ ধারণ করেছিল তা অন্য কোনো সময়ে হয়নি।

এই অগ্নিযুগে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনগুলোর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি জাতীয় আন্দোলন হলো–(১) ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশি

আন্দোলন, (২) ১৯২০ সালে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন, (৩) ১৯১৮-১৯২০ সালের খিলাফত আন্দোলন, (৪) ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন, (৫) ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলন প্রভৃতি।

আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক এই ঘটনাবলি মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের মানসকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। পরাধীন ভারতবর্ষের রাজনীতির এই টালমাটাল সময়ে তিনি ছাত্রজীবন বিসর্জন দিয়ে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণে ব্রতী হয়েছিলেন। কেননা, রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরই আসে অর্থনৈতিক মুক্তি।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা হলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার ভিত্তি। মানুষের জীবনের কৈশোর-যৌবনের বছরগুলো হলো শ্রেষ্ঠ সময়। এ সময় তিনি একজন কংগ্রেসের রাজনৈতিক কর্মীরূপে, ভলান্টিয়ার হিসেবে প্রাদেশিক, জেলা কংগ্রেসের সম্মেলনে কাজ করেছেন।

এভাবে তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু হয় ইংরেজ শাসন বিরোধী আন্দোলন-সংগ্রামের কংগ্রেসের রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের এ তথ্যাবলি পারিবারিক ও সুধীজন এবং কতিপয় গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার বিরোধী আন্দোলনের কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মী। তিনি একই সাথে ব্রিটিশ যুগে নিখিল ভারত ছাত্র কংগ্রেস-ছাত্র সংগঠন ছাত্র ফেডারেশন-জাতীয় কংগ্রেস-স্বরাজ্য দল-কৃষক প্রজা পার্টি ইত্যাদি সংগঠন ও দলের কর্মী ছিলেন।

সর্বভারতীয় রাজনীতির সাথে যুক্ত হওয়ার কারণে সমকালীন অবিভক্ত ভারতের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ তাঁকে প্রীতি ও স্নেহের চোখে দেখতেন। তাঁর ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতির সময় কাল হবে ১৯২০ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত।

তিনি ১৯২০-২১ সালে ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অংশ না নিয়ে গান্ধীজির (১৮৬৯-১৯৪৮) ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে এবং সেই সময় জাগরিত খিলাফত আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। ইংরেজ সরকার আন্দোলনকারীদের দমন-পীড়ননীতি প্রয়োগ করে। এ সময় তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে ব্রিটিশ শাসকবর্গের নিগ্রহ, জীবনের কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়েছে।

ব্রিটিশরা কূট-রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মুসলমানদের খিলাফত অর্থাৎ ধর্মজগতে মুসলমানদের এক জাতীয়তা ভাঙনে লিপ্ত হন। মুসলমানরা তুরস্কের খিলাফতকে মান্য করেন। কিন্তু ব্রিটিশ-রাজ সরকারের তুরস্কের অটোমান সাম্রাজ্য নিয়ে চিরকাল রাজনৈতিক ভাবনা ছিল।

১৯১৯ সালে প্যারিস চুক্তি ও ১৯২০ সালে সোভার্স চুক্তির মাধ্যমে ব্রিটিশ-রাজ সরকার তুরস্কের খিলাফত চূড়ান্তভাবে ভেঙে দেয়। ফলে ভারতীয় মুসলমানদের খিলাফত আন্দোলন ব্যাপক গতি পেয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস খিলাফতের দাবিকে সমর্থন করেছিল। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার খিলাফত আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন।

ব্রিটিশ সরকার The Anorchical and Revolutionary Crimes Act, 1919 শীর্ষক এক কালো আইনের মাধ্যমে স্বাধীনতাকামী হাজার হাজার কংগ্রেসি কর্মী ও সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা হরণ করে বিনা বিচারে কারাগারে অন্তরীণ করে। এই কালো আইন ইতিহাসে রাওলাট আইন নামে কুখ্যাত।

সমগ্র ভারতবাসী এই কালো আইনের বিরুদ্ধ আন্দোলন শুরু করে। স্বাধীনতাকামী সাধারণ জনগণ হরতাল, সভা, বিক্ষোভ, শোভাযাত্রা করে সারা ভারতবর্ষ কাঁপিয়ে তুলেছিল। আন্দোলন অহিংসার পথ না ধরে চলে সহিংসার পথে চলেছিল। ব্রিটিশ সরকার আন্দোলন দমন করতে কঠোর ও নিষ্ঠুরতার পন্থা অবলম্বন করেছিল।

ফলে উত্তর প্রদেশের পাঞ্জাবের অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী দ্বারা নিরীহ জনগণের নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। সাধারণ মানুষের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা জন্মাল ব্রিটিশ শাসনের প্রতি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবি আরও বেগবান হলো।

ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সমঝোতা না হওয়ায় গান্ধীজির নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাপক মাত্রা লাভ করল। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। এ সময় অনেক সর্বভারতীয় রাজনীতিবিদদের সান্নিধ্যে একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে কাজ করার দুর্লভ সুযোগ পান।

পরবর্তীকালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫), মোতিলাল নেহেরু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের আপোসমূলক নীতি থেকে বেরিয়ে গঠন করেন বিপ্লবী স্বরাজ দল। এ সময় মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার এ দলের সঙ্গে একজন একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে কাজ করেন এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের দুর্লভ সাহচর্য লাভ করতে পেয়েছিলেন। দেশবন্ধু প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যধন্য ও ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন তিনি। এরপরে চলতে থাকে তার সমাজ ও রাজনৈতিক অঙ্গনে অব্যাহত যাত্রা।

বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত 'লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা জামালপুর' গ্রন্থে রয়েছে, 'এ সময়ে তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন স্থানে মিটিং মিছিলের নেতৃত্ব দেন।[৭]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আদর্শ, সাম্যবাদের আদর্শ, ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের আদর্শের উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন নেতাজি

সুভাষ বসু (১৮৯৭-১৯৪৫)। বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক গুরু হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩)।

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী কলকাতা মিউনিসিপালের ডেপুটি মেয়র (১৯২৪) হিসেবে সেই সময়কার নির্বাচিত মেয়র (১৯২৪-১৯২৫) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেন। অতঃপর সোহ্‌রাওয়ার্দীর পরে উক্ত পদে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ডেপুটি মেয়র হিসেবে নেতাজি সুভাষ বসুকে নিযুক্ত করে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে কাজ করেন।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ দলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে দেশবন্ধুর সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিনি দেশবন্ধুর বেঙ্গল প্যাক্ট চিন্তাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। দেশবন্ধুর অকাল মৃত্যুতে তাঁর বেঙ্গল প্যাক্টের মহতী উদ্যোগ ব্যর্থ হয়।

১৯৩০ সালে গান্ধীজির আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার জড়িত ছিলেন। ভারতবাসীর রাজনৈতিক জীবনে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত ও মতাদর্শগত বিরোধকে দূর করে স্বাধীনতা লাভের পথকে প্রসারিত করেছিল আইন অমান্য আন্দোলন।

এ আন্দোলন পরিচালনার নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন স্বয়ং গান্ধীজি। আইন অমান্য আন্দোলন চলাকালীন হাজার হাজার ভারতীয় নাগরিককে কারারুদ্ধ করা হয়। এর মধ্যে বাংলা প্রদেশের লোক ছিল সর্বাধিক। এ সময় মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসেন ও তাঁদের সঙ্গে কাজ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি এ কে ফজলুল হকের (১৮৭০-১৯৬২) 'কৃষক প্রজা পার্টি'র সঙ্গে কাজ করেছেন। এ দল ছিল বাংলার প্রথম গণমুখী রাজনৈতিক দল। অবিভক্ত ভারতবর্ষব্যাপী এ দলের ব্যাপ্তি না থাকলেও সারা বাংলায় এ দলের ব্যাপ্তি শক্ত অবস্থানে ছিল।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের ১৯৪২ সালের ভারত ছাড় আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রাক্কালে এই আন্দোলন বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। মানুষ যে স্বাধীনতার জন্য সবকিছু হারাতে রাজি ১৯৪২ সালে ব্রিটিশরা এ আন্দোলনের তীব্রতা দেখে বুঝতে পেরেছিল।

এই আন্দোলন সমগ্র ভারতব্যাপী সূচনা হয়েছিল এবং ভারতের জাতীয় জীবনে এক নবযুগের সূচনা করতে সক্ষম হয়। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের সংক্ষেপে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণের পর্ব এ পর্যন্ত।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ভারত ভাগ-পরবর্তী পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। পাকিস্তান জন্মের বীজ হিসেবে

বিবেচনা করা হয় ১৯৪০ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সম্মেলনে গৃহীত লাহোর প্রস্তাবকে।

এই প্রস্তাবে ভারতের উত্তর পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম অংশে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলো নিয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। বাংলার মুসলিম লীগের নেতা এবং বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক এই প্রস্তাব পেশ করেন। এই প্রস্তাবকে 'পাকিস্তান প্রস্তাব'ও বলা হয়।

১৯৪৬-পরবর্তীকালে মুসলমানের স্বার্থরক্ষার জন্য মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের মধ্যে রাজনৈতিক পার্থক্য দেখা দিলো। এ পার্থক্য এদেশের জনগণের স্বার্থে। রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণে যখন দেশের ভূখণ্ডের ইতিহাসের পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তখন নেতৃবৃন্দের চিন্তাধারারও পরিবর্তন হয়। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের চিন্তাধারা ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় পূর্ব বাংলার বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ইংরেজরা শাসন-শোষণ করেছে, কলকাতাকেন্দ্রিক জমিদার-এলিটরা অবহেলা-ঘৃণা-শোষণ করেছে। সমকালের প্রেক্ষাপটে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ১৯৪৬ সাল থেকে মুসলিম লীগের প্রভাবশালী রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

'ময়মনসিংহের চরিতাভিধান' গ্রন্থের প্রণেতা দরজি আবদুল ওয়াহাব লিখেছেন, 'তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন'[৮]।' মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার এ সময় মুসলিম লীগের একজন প্রভাবশালী সক্রিয় কর্মী হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় যোগ দেন। পূর্ব বাংলার মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে কাজ করেন।

সেই সময় অল্প কয়েকজন নেতা ছাড়া সবাই ভারত ভাগের পক্ষে ছিলেন। তাঁরা ভেবেছেন এতে পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের উন্নতি হবে; সাম্প্রদায়িকতাসহ অন্যান্য সমস্যাগুলোর অবসান ঘটবে। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার মুসলিম লীগের সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী হয়েও এ সময় অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন।

১৯৪৬-পূর্ববর্তীকালে তিনি কংগ্রেসি-স্বরাজ-কৃষক প্রজাপার্টি প্রভৃতি দলের সক্রিয় কর্মী হিসেবে যেমন ভারতবর্ষের প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতাদের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন তেমনিভাবে ১৯৪৬ অনুবর্তীকালেও মুসলিম লীগের প্রভাবশালী সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে নিখিল পাকিস্তানের জাতীয় নেতৃবৃন্দের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। তাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন জেলায় মুসলিম লীগের সম্মেলনে গিয়েছেন।

বিশ শতকের ষাট দশেকে প্রগতিশীল আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন তিনি। এ সময় তিনি প্রবলভাবে বাঙালি জনগণের পক্ষে ছিলেন এবং গণতন্ত্র উদ্ধারের জন্য কাজ

করেছেন। তিনি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পক্ষে তাঁর সরাসরি জোরালো সমর্থন-সহযোগিতা ছিল। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশের পক্ষে, বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে ছিলেন তিনি। বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি জামালপুর মহকুমা শহরে অবস্থান করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে থেকে মুক্তিযোদ্ধাসহ প্রতিবেশী হিন্দুদের নিরাপত্তাসহ নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন।

দেশবন্ধুর সাহচর্য

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ছাত্রজীবনেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯২০ সালের দিকে ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ার সময়ই কলকাতাকেন্দ্রিক বড় বড় কংগ্রেসি নেতাদের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। এ সময় তিনি ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের ম্যাট্রিকের ছাত্র। ভারতবর্ষের স্বাধীন হওয়ার বাসনা মনের মধ্যে তিনিও রাখতেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের রাজনৈতিক আদর্শ তাঁকে আকর্ষণ করত।

দেশবন্ধু ছিলেন খ্যাতিমান ব্যারিস্টার, কলকাতা হাইকোর্টে সমকালে তাঁর মতো আইনজ্ঞ ছিল না। গান্ধীজির ডাকে তিনি বিপুল আয়ের রোজগার ছেড়ে, আরাম ত্যাগ করে দেশের জন্য, ভারতবাসীর জন্য সর্বস্ব বিসর্জন দিলেন। এমন ত্যাগী নেতা ভারতবর্ষে আর দেখা যায় না।

১৯২১ সালে দেশবন্ধু প্রবলভাবে রাজনীতির আন্দোলনে যোগ দিলেন। কংগ্রেসের আপোসমূলক নীতির প্রতিবাদে ১৯২৩ সালে তিনি বিপ্লবী স্বরাজ দল গঠন করলেন। তাঁর অনুপ্রেরণায় ছাত্ররা দলে দলে স্কুল ছাড়ল, কলেজ ছাড়ল, উকিল ওকালতি ছাড়ল, মোক্তার মোক্তারি ছাড়ল, চারদিকে ছাড়াছাড়ির এক সাড়া পড়ে গেল।

সারা বাংলায় দেশবন্ধুর জোয়ার। এই অসামান্য ত্যাগের জন্য তিনি দেশবন্ধু উপাধিতে ভূষিত হলেন। দেশবন্ধুর ঐকান্তিক সাংগঠনিক দক্ষতায় স্বরাজ দল ১৯২৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গ প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এ সময় তাঁর উদ্যোগে বেঙ্গল প্যাক্ট স্বাক্ষরিত হয়। অবশ্য পরে তা প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃবৃন্দের কারণে ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু এর ফল ছিল সুদূরপ্রসারী।

দেশবন্ধু ময়মনসিংহে এলে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার তাঁর বক্তৃতা আগ্রহভরে শুনতেন। দেশবন্ধু তাঁর জীবনের অনেকটা জুড়ে ছিলেন। তিনি নিজেকে দেশবন্ধুর ভক্ত ও অনুরাগী কর্মী হিসেবে পরিচয় দিতেন। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের জীবনাদর্শের সাথে দেশবন্ধুর প্রভাব ও মিল লক্ষ করা যায়। দেশবন্ধু পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, ছিলেন সাহিত্যিকও।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারও পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং লেখালিখি করতেন। তিনি দেশবন্ধুর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখতেন। দেশবন্ধু তাঁকে স্নেহ করতেন। পরবর্তী সময়ে দেশবন্ধুর সঙ্গে অবিভক্ত বাংলাসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন সম্মেলনে মিটিং-মিছিলে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন তিনি।

বাংলার নেতৃস্থানীয় কংগ্রেসি নেতা, স্বরাজ দলের নেতাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল। ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬), ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (১৮৮৯-১৯৭০), সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ (১৮৯৩-১৯৭৬) প্রমুখ খ্যাতিমান স্বরাজ-কংগ্রেসি নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।

রাজনীতিতে অংশগ্রহণ

রাজনীতিতে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারকে নিয়ে জামালপুরবাসীর মধ্যে আলোচনা হয়। স্মরণীয় যে, বিশ শতকের অবিভক্ত ব্রিটিশ ভারতের এক টালমাটাল সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি। বঙ্গভঙ্গ, বঙ্গভঙ্গ রদ, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, বিপ্লবী যুবকদের আত্মাহুতির পটভূমিতে তাঁর মানস গঠিত হয়েছিল। এ সমস্ত আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া তাঁর জন্মস্থানের মাটিতেও প্রভাব পড়েছিল।

ব্রিটিশ রাজশক্তির হাত থেকে মুক্তির জন্য এ অঞ্চলে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে। এসব আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে মির্জা আশরাফ উদ্দিনের মানস গঠিত হয়েছিল—এ কারণে পরবর্তীকালে সংঘটিত খিলাফত আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলনে তাঁর বলিষ্ঠ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ লক্ষ করা যায়।

মহাত্মা গান্ধী, আবুল কালাম আজাদ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক প্রমুখ স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের সঙ্গে তিনি নিষ্ঠাবান কর্মী হিসেবে কাজ করেছেন, তাঁদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। অবিভক্ত বাংলার নেতৃস্থানীয় কংগ্রেসি রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন একজন প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে সমকালীন রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তিনি।

আদর্শবোধের কারণে তিনি কংগ্রেস ও এ দলের মনোভাবসম্পন্ন রাজনৈতিক দল এবং সংগঠনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি একই সাথে কংগ্রেস, স্বরাজ, কৃষক প্রজা পার্টি ও কৃষক আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর ভূমিকা ছিল অনন্য। তিনি মুসলমানদের স্বার্থের পক্ষে কথা বললেও সাম্প্রদায়িক ছিলেন না।

১৯৪০ সালে একে ফজলুল হকের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে আলাদা ভূখণ্ডের দাবি উঠলে মুসলমানদের স্বার্থের কথা বিবেচনা

করে এর বিরোধিতা করেননি তিনি। তবে জীবনব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শের মৃত্যু ঘটাননি।

তিনি এ সময় প্রভাবশালী রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী গ্রুপে কাজ করেছেন। পাকিস্তান আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন তিনি।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান সৃষ্টি হলে পাকিস্তানের একটি অংশ এই ভূখণ্ড যা সাবেক পূর্ব বাংলাকে পরে তা পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে গণ্য করা হয়। এই অংশে কেন্দ্রীয় পাকিস্তানি সরকারের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফলে এ অঞ্চলে জনগণের মাঝে তীব্র ক্ষোভ হয়।

কেন্দ্রীয় পাকিস্তানি শাসক পূর্ব বাংলার মানুষের মাতৃভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে সমগ্র পাকিস্তানের জন্য একমাত্র উর্দু রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দিলে শুরু হয় এ অঞ্চলে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন। যদিও সমগ্র পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষের মুখের ভাষা বাংলা ছিল।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে বাংলা ভাষার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে তৎকালীন শাসকদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রভাষা বাংলার জন্য তীব্র প্রতিরোধ জানান ও বাংলা ভাষার পক্ষে কাজ করেছেন। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনের পরেও তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।

১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে তিনি যুক্তফ্রন্ট তথা নৌকা প্রতীকের পক্ষে কাজ করেছিলেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণায় তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

বিশ শতকের ষাটের দশকে প্রগতিশীল আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন তিনি। এ সময় তিনি প্রবলভাবে বাঙলি জনগণের পক্ষে ছিলেন। বাংলাদেশের জনগণ জন্মভূমির মুক্তির জন্য এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে অবতীর্ণ হলে এই স্বাধীনতা যুদ্ধকালে বাংলাদেশের পক্ষে এদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলেন তিনি।

তিনি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে থেকে জামালপুর মহকুমা শহরের অনেক মুক্তিযোদ্ধা ও হিন্দু প্রতিবেশীদের সহযোগিতা করেছিলেন।

কর্মজীবন

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার জামালপুরের বিস্তৃত পাতিলাদহ পরগনার একাংশের বকশীগঞ্জের জোতদার ছিলেন। এ কারণে জীবিকার জন্য নয়, বিভিন্ন

প্রতিষ্ঠান-সভা-সমিতি চালানোর জন্য মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করতে হয়।

তার কর্মজীবন ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রায় সমার্থক হয়ে আছে। কর্মজীবনের এ তথ্যাবলি পারিবারিক ও সুধীজন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে।

১৯৩৬-এ পূর্ব বাংলার কৃষকদের বাড়ি, জমি ঋণের দায়ে নিলাম হতো। এ পরিস্থিতিতে পাস হয় ১৯৩৬ সালে বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ডেটরস অ্যাক্ট (১৯৩৬-এর বেঙ্গল অ্যাক্ট ৭)। এ আইনের অধীনে গঠিত হয় বেশ কিছু ঋণ সালিশি বোর্ড। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার এ অঞ্চলের ঋণ সালিশি বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করেন।

সেই সময় জামালপুরসহ সারা পূর্ব বাংলায় বড় দুরবস্থা ছিল। কৃষকরা মহাজনের শোষণে জর্জরিত। মহাজনের নিকট থেকে কৃষকরা ঋণ করতে বাধ্য হতো। ঋণ গ্রহণ করে চড়া সুদের টাকা বহন করতেই সম্পূর্ণ দেউলিয়া হয়ে যেত। মুসলমানদের অবস্থা ছিল বেশি শোচনীয়।

তৎকালীন জামালপুর মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ঋণ সালিশি বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে মহাজন ও খাতককে সালিসে ডেকে এনে সহজ শর্তে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে এ অঞ্চলের কৃষক সমাজকে কিছুটা হলেও রক্ষা করেছিলেন। উল্লেখ্য, তখন এই বোর্ডের কাজ দেখাশোনা করত কো-অপারেটিভ মিনিস্ট্রি।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার পঞ্চাশের ভয়াবহ মন্বন্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ময়মনসিংহ অঞ্চলে ত্রাণকার্যে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। এ দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুর শিকার হয়। এ অঞ্চলেও প্রাণ হারায় অনেকে। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ছিলেন দুর্ভিক্ষের ত্রাণকার্যের ময়মনসিংহ অঞ্চলের জেনারেল সেক্রেটারি।

তিনি সমকালে গঠিত ইউনিয়ন বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার জামালপুরে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন।

তিনি বকশীগঞ্জের রূপজাহান পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, জামালপুর উচ্চ বিদ্যালয়, সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ (১৯৪৬) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও উদ্যোক্তা। তদানীন্তন জামালপুর কলেজ পরবর্তীকালে পরে আশেক মাহমুদ কলেজ প্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টায় মির্জা সাহেবের নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়। তিনি মেধা ও শ্রম দিয়ে, শিক্ষার্থী দিয়ে সহযোগিতার করেছেন।

তাঁর মামাতো ভাই অবিভক্ত বাংলার এম.এল.সি. আজিজুর রহমান নান্না মিয়াসহ (১৮৯৮-১৯৬০) তিনি এসব প্রতিষ্ঠানে এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে শ্রম ও মেধা দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার কর্মজীবনের একটি পর্যায়ে জামালপুর শহরের আমলাপাড়ায় বসবাস করেন। জানা যায়, ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলে ১৯৪৮ সালে তিনি জামালপুর শহরে চলে আসেন এবং শহরের আমলাপাড়ায় বসতি স্থাপন করে বসবাস শুরু করেন।



জামালপুর শহরে আমলাপাড়ায় অবস্থিত মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের শতবর্ষের পুরোনো ঐতিহ্যবাহী বসতবাড়ি 'মির্জা হাউস'

আমলাপাড়ার তাঁর বসতবাড়িটি ঐতিহ্যবাহী। এই বাড়িটি শতাধিক বছরের পুরোনো। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার জনৈক উকিল বাবুর নিকট থেকে এ বাড়িটি ক্রয় করেছিলেন। 'মির্জা হাউসে'র পুরোনো স্থাপনা এখনো বিদ্যমান।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ময়মনসিংহ ডিস্ট্রিক কাউন্সিলের কাউন্সিলর ছিলেন। ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র (বেসিক ডেমোক্রেসি) প্রবর্তনের ফলে তৎকালীন জেলা বোর্ডগুলো জেলা কাউন্সিলে পরিণত হয়। জেলা কাউন্সিলগুলোর ভূমিকা বুনিয়াদি গণতন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। জেলার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য আর্থিক ও প্রশাসনিক উভয় দিক দিয়ে জেলা কাউন্সিলকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল।

জেলা প্রশাসক পদাধিকার বলে জেলা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন। মৌলিক গণতন্ত্রে চেয়ারম্যানই সকল নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। নির্বাচিত সদস্যের

মধ্যে থেকে ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতো। কাউন্সিলের মেয়াদ উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি বহাল থাকতেন।

জামালপুর শহরে বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের প্রথম ব্যবস্থা করেন তিনিই। ১৯৫৯ সালে জামালপুরে বেসরকারিভাবে ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি, ওয়াটার ওয়ার্কস স্থাপনের মাধ্যমে এ শহরের পানি, বিজলি বাতির ব্যবস্থা করে তিনি বিশাল অবদান রাখেন।

তিনি ১৯৬০ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত জামালপুর পৌরসভার পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যান (বর্তমানে মেয়র) ছিলেন। তিনি পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সততার সাথে পালন করে প্রশংসিত হয়েছেন। উল্লেখ্য, এই জনপদের ভৌগোলিক গুরুত্ব ও অর্থনৈতিক বিবেচনায় ইংরেজ সরকার ১৮৪৫ সালে জামালপুরকে মহকুমায় উন্নীত করে। জামালপুর মহকুমা উন্নীত হওয়ার পর ১৮৬৯ সালে জামালপুর পৌরসভা গঠিত হয়। বাংলাদেশের পৌরসভাগুলোর মধ্যে জামালপুর একটি ঐতিহ্যবাহী পৌরসভা।

১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র (বেসিক ডেমোক্রেসি) প্রবর্তনের ফলে তৎকালীন পৌরসভাগুলোর সরাসরি ভোটে নির্বাচিত মেম্বারগণ পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত করতেন। পৌরসভাগুলো মৌলিক গণতন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল এবং পৌরসভার ব্যাপক উন্নয়ন হয়। সেই সময় পৌরসভার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য আর্থিক ও প্রশাসনিক উভয় দিক দিয়ে পৌরসভাকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল।

মহকুমা প্রশাসক পদাধিকার বলে পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। মৌলিক গণতন্ত্রে চেয়ারম্যানই সকল নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে থেকে ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতো। পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যানের মেয়াদ ৫ বছর উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি বহাল থাকতেন।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ঐতিহ্যবাহী জামালপুর পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে সেই সময় শহরে টেলিফোন স্থাপন, পাবলিক লাইব্রেরি, স্টেডিয়াম প্রতিষ্ঠায় অন্যতম উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেছেন। সেই সময়ের কথা লোকে আজও স্মরণ করে।

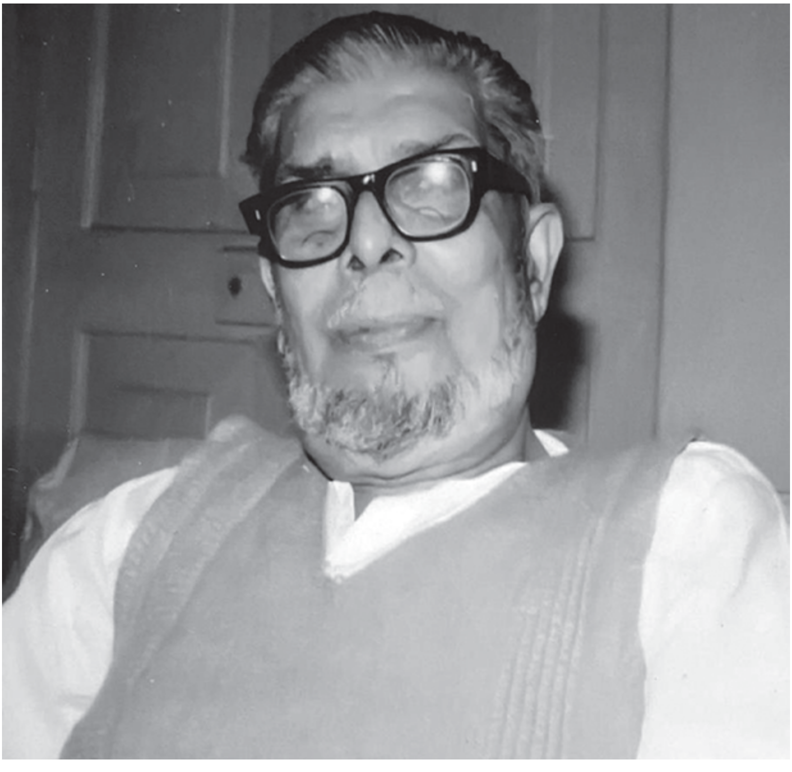
তাঁর সময়ে জামালপুর পৌরসভার যেসব মহকুমা প্রশাসক পদাধিকারবলে পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন তাঁরা হলেন এবিএম গোলাম মোস্তফা সিএসপি, এসএইচ চিশতি সিএসপি, এমআর তরফদার ইপিসিএস এবং একেএম নুরুল ইসলাম খান সিএসপি।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার জামালপুর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের (সমকালে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সমবায়ী সদস্যদের একটি অর্থলগ্নী

প্রতিষ্ঠান) প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম সম্পাদক, পরে পরিচালক ছিলেন। তিনি জামালপুরে কমার্শিয়াল ট্রেনিং কলেজ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন সেখানে টাইপিং, শর্টহ্যান্ড ও টেলিগ্রাফি হাতেকলমে শেখানো হতো।

তিনি সমকালীন সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সমবায়ী উদ্যোগে গড়ে তোলা অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান জামালপুর সাব ডিভিশন সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি লিমিটেডের ভাইস চেয়ারম্যান ও পূর্ব পাকিস্তান কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন লিমিটেডের পরিচালক ছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সদস্যরূপে সমাজের জন্য অশেষ কল্যাণসাধন করেছেন।

পারিবারিক ও সুধীজন সূত্র জানা যায়, মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার জামালপুর মহকুমাকে জেলা করার জন্য নাগরিক কমিটির সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি জামালপুর শহরের রেল স্টেশনের নাম সিংহজানি জংশন হতে জামালপুর টাউন জংশন নাম পরিবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন।



প্রৌঢ় বয়সে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার (বয়স আনুমানিক ৭০ বছর)

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার জামালপুরের দৃষ্টিহীন মানুষের সেবা প্রদানের জন্য ১৯৬৪ সালে জামালপুর ঈদগাহ মাঠে বিনা পয়সায় চক্ষু চিকিৎসার সেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি এখানে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের খ্যাতিমান চক্ষু বিশেষজ্ঞ সার্জন টি. আহমদকে নিয়ে এসেছিলেন। উল্লেখ্য, পরবর্তীকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন।

তাঁর নেতৃত্বে চক্ষু অপারেশন মেডিক্যাল ক্যাম্প কয়েকদিন ধরে কাজ করেছিল। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার জামালপুরে অন্ধ কল্যাণ সমিতি গঠন করেছিলেন।

কর্মজীবনে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার দীর্ঘ দুই দশক ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলের চল্লিশ দশকের পুরো সময় শেরপুর থানা এবং বাংলাদেশ আমলে জামালপুর মহকুমা ও পরে জেলার ১৯৭৬ সাল থেকে আশির দশকের কিছুকাল পর্যন্ত প্রথম শ্রেণির অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালন করেন।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ১৯৫৭ সালে জামালপুর শহরের চন্দ্রায় সুপ্রাচীন বিরাটাকার হরিশচন্দ্রের দিঘি ক্রয় করে তখন তা পুনরায় খনন ও সংস্কারের মাধ্যমে দৃষ্টিনন্দন করে উক্ত দিঘিতে মৎস্যচাষ ব্যাপক জনপ্রিয় করেন। উল্লেখ্য যে, হরিশচন্দ্র রাজার দিঘিটি ব্রিটিশ আমলে Acquired State-এর অধীনে চলে আসে। সেই সময় দীর্ঘকাল যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে দিঘিটি মজা দিঘিতে পরিণত হয়।

এই অবস্থাতেই, Acquired State-এর দিঘিটি নিলামে বিক্রয় করার সিদ্ধান্ত নিলে রামনগরের দুই জনৈক ব্যক্তি তা ক্রয় করেন নেন। তাদের নিকট থেকে ১৯৫৭ সালে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার এটা ক্রয় করেন।



ঐতিহ্যবাহী দৃষ্টিনন্দন রাজা হরিশচন্দ্রের দিঘি

দিঘিটির অনুপম নৈসর্গিক সৌন্দর্যের ছোঁয়া পেতে আজও প্রকৃতিপ্রেমীরা সেখানে ভিড় করেন।

এছাড়া বকশীগঞ্জের কুরখা ও ভরসা বিল দুটি সংস্কার করে শস্যচাষের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখেন।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজ আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। তাঁর কর্মজীবনের এ সমস্ত দিক বিচার করে এ কথা বলা যায় যে, তিনি জীবিকার জন্য নয়, নিজের আদর্শের প্রতিষ্ঠা ও মানবতাকে সমুন্নত রাখতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন।

সাময়িকপত্র সম্পাদনা

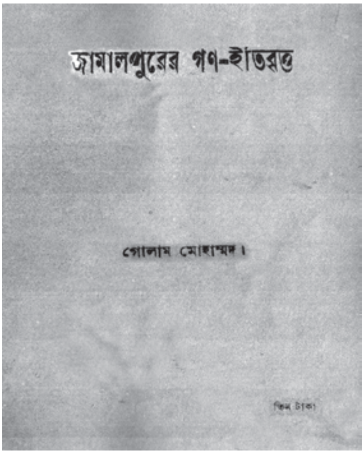
সাময়িক পত্রিকাদিতে দেশ, কাল, মানুষের জীবনযাত্রার নানারূপ প্রতিফলিত হয়। কীর্তিমান পুরুষেরা সকলেই নিজস্ব দর্শন প্রচারার্থ পত্রপত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার দুইটি সাময়িক পত্র সম্পাদনা করেছেন। এই পত্রিকা দুটি হলো–সাপ্তাহিক 'তওফিক' ও 'ঝিনাই'।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের নিজস্ব সম্পাদনায় ১৯৫০ সাল হতে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত জামালপুরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত আমেনা প্রেস থেকে 'তওফিক' পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো। এ সাপ্তাহিক পত্রিকায় সমকালের পল্লি উন্নয়ন, সমবায়, রাজনীতি, সাহিত্যসহ নানা বিষয়ের খবরাখবর ও নিবন্ধ ছাপা হতো। আমেনা প্রেস থেকে সমকালে এতদঞ্চলের লেখকদের বইপত্রও ছাপা হয়েছে। গেজেটিয়ারতুল্য এ অঞ্চলের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ 'জামালপুরের গণ-ইতিবৃত্ত' ১৯৫৪ সালে এ প্রেস থেকেই মুদ্রিত হয়।

বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক, ছড়াকার ও শিক্ষাবিদ আনজুমান আরা জামানের প্রথম প্রকাশিত লেখা গল্প 'কাপড়' এ পত্রিকাতেই ছাপা হয়। সমকালে অনেক লেখকের কবিতা, গল্প, ফিচার 'তওফিক' পত্রিকায় প্রথম ছাপা হয়েছে।

এ পত্রিকাতেই প্রথম কিংবদন্তি রাজা হরিশচন্দ্রের দিঘির করুণ কাহিনির বিস্তৃত বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছিল। এই বর্ণনা সুলিখিতভাবে তুলে ধরেন সম্পাদক নিজেই। সেই তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে জামালপুরের জিলা স্কুলের শিক্ষক, গীতিকার ও অভিনেতা মো. মুখলেসুর রহমান ১৯৮৪ সালে চন্দ্রাবতী নামে একটি নৃত্যনাট্য রচনা করেন, যা এদেশের শিল্পসংস্কৃতির গর্ব। এ নৃত্যনাট্যটি জামালপুরসহ আন্তর্জাকিত অঙ্গনে ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে মঞ্চস্থ হচ্ছে।

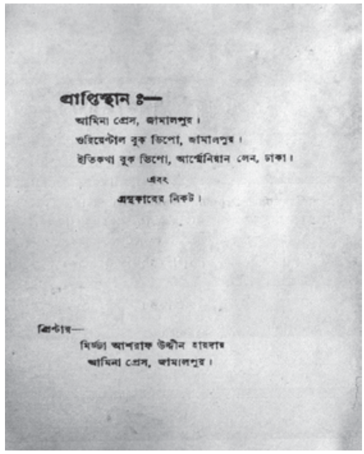
মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের নিজস্ব সম্পাদনায় জামালপুর থেকে 'ঝিনাই' পত্রিকাটি ১৯৬৩ সালে ছাপা হয়েছিল। বর্তমানে এ পত্রিকা দুটির সন্ধান পাওয়া দুষ্কর। তবে বিভিন্ন সূত্রে পত্রিকা সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায়।



জামালপুরের গণ-ইতিবৃত্ত

গোলাম মোহাম্মদ।

তিন টাকা



প্রাপ্তিস্থান ঃ—

আমিনা প্রেস, জামালপুর।

ওরিয়েন্টাল বুক ডিপো, জামালপুর।

ইতিকথা বুক ডিপো, আর্মেনিয়ান লেন, ঢাকা।

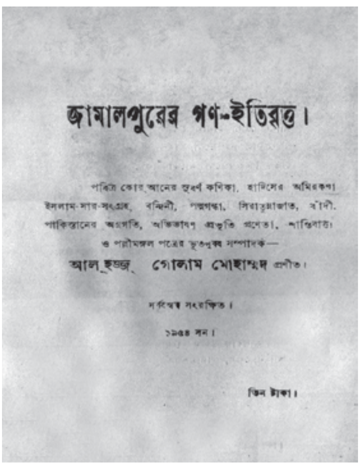
এবং

গ্রন্থকারের নিকট।

প্রিন্টার—

মির্জ্জা আশরাফ উদ্দীন হায়দার

আমিনা প্রেস, জামালপুর।



জামালপুরের গণ-ইতিবৃত্ত।

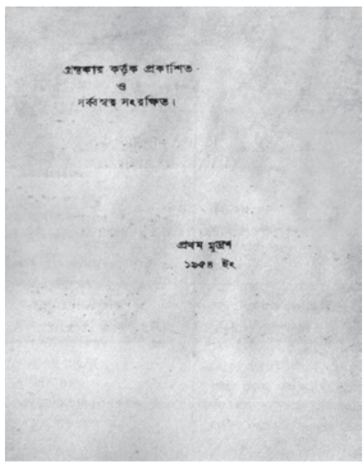
পবিত্র কোর্‌আনের স্বর্ণ কণিকা, হাদিসের অমিয়কণা,
ইসলাম-সার-সংগ্রহ, বন্দিনী, পল্লগন্ধা, সিরাতুম্মোস্তাকীম, বাঁশী,
পাকিস্তানের অগ্রগতি, অভিভাষণ প্রভৃতি প্রণেতা, শান্তিবার্তা
ও পল্লীমঙ্গল পত্রের ভূতপূর্ব সম্পাদক—

আল্‌হজ্জ্‌ গোলাম মোহাম্মদ প্রণীত।

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

১৯৫৪ সন।

তিন টাকা।



গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

প্রথম মুদ্রণ
১৯৫৪ ইং

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের আমেনা প্রেস থেকে মুদ্রিত বইয়ের প্রচ্ছদ ও আখ্যাপত্রের চিত্র

সামাজিক সংগঠনে সংশ্লিষ্টতা

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অনেক সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। জনবান্ধব মানবতাবাদী এই মানুষটি সারাজীবন জনগণের কল্যাণে কাজ করেছেন। ১৯৩৬ সালের দিকে তিনি স্পেশাল ঋণ সালিশি বোর্ডের চেয়ারম্যান হন।

পরবর্তীকালে তিনি স্থানীয় বেঞ্চ অ্যান্ড ডিভিশন কোর্টের সদস্য হয়েছিলেন। তিনি অনেক স্বেচ্ছামূলক ও সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পারিবারিক ও

সুধীজন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় তিনি যেসব সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন সেসবের একটি তালিকা (অসম্পূর্ণ) নিম্নরূপ :

১. রূপজাহান পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় (নিলক্ষিয়া)-এর প্রতিষ্ঠাতা কমিটির সেক্রেটারি।
২. সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ (জামালপুর)-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।
৩. জামালপুর প্রিপারেটরি মডেল প্রাইমারি স্কুল (বর্তমানে জামালপুর হাই স্কুল)-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।
৪. দেউরপাড় চন্দ্রা প্রাইমারি স্কুল (জামালপুর)-এর প্রতিষ্ঠাতা।
৫. নিলক্ষিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় (বকশীগঞ্জ)-এর প্রতিষ্ঠাতা।
৬. জামালপুর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক (বর্তমানে বিলুপ্ত)-এর প্রতিষ্ঠাতা যুগ্মসম্পাদক ও পরে ডিরেক্টর।
৭. জামালপুর কো-অপারেটিভ ইলেকট্রিক সাপ্লাই সোসাইটি লিমিটেড [বর্তমানে পিডিপি (বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, জামালপুর) কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত]-এর প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি।
৮. জামালপুর অন্ধ কল্যাণ সমিতি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। গত শতকের পঞ্চাশ দশকে তিনি জামালপুর শহরের ঈদগাহ মাঠে চক্ষুক্যাম্প করেছিলেন।
৯. পূর্ব পাকিস্তান কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন লিমিটেড-এর ডিরেক্টর।
১০. জামালপুর সাহিত্য সম্মেলন, ১৯৫৩-এর সেক্রেটারি।
১১. জামালপুর জেলা বাস্তবায়ন দাবি শীর্ষক কমিটির সেক্রেটারি।
১২. জামালপুর পৌরসভার ১৯৬০-১৯৬৫ মেয়াদে পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যান।
১৩. ঐতিহ্যবাহী নিলক্ষিয়া জামে মসজিদের পরিচালনা কমিটির প্রধান।
১৪. ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় ময়মনসিংহের ফুড কমিটির সেক্রেটারি।
১৫. ব্রিটিশ আমলে ইউনিয়ন বোর্ড (বকশীগঞ্জ)-এর প্রেসিডেন্ট। বেঞ্চকোর্টের সদস্য।
১৬. শেরপুরের প্রথম শ্রেণির অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট (ব্রিটিশ আমলে)।
১৭. জামালপুর মহকুমা ও পরে এ জেলার প্রথম শ্রেণির অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ১৯৭৬ সাল থেকে আশির দশকের কিছুকাল পর্যন্ত।
১৮. জামালপুর ওয়াটার ওয়ার্কস, পাবলিক হল, স্টেডিয়াম প্রতিষ্ঠাতা উদ্যোক্তাদের প্রধান।
১৯. জামালপুর পাবলিক লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাকালীন প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম সদস্য।
২০. আমেনা প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা। এ প্রেস থেকে প্রকাশিত ও মুদ্রিত 'সাপ্তাহিক তওফিক' পত্রিকার সম্পাদক। বর্তমানে এ প্রেসটি আর নেই।
২১. 'ঝিনাই' সাহিত্য সাময়িকীর সম্পাদক।
২২. বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক ও ক্রীড়ামোদী।
২৩. সিংহজানী রেলওয়ে জংশন স্টেশনকে জামালপুর টাউন জংশন স্টেশন নাম পরিবর্তন করার বাস্তবায়ন কমিটির অন্যতম প্রধান।
২৪. সমবায়ী সদস্যদের পরিচালিত সমবায় প্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

সমাজসেবা

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের আজীবন সাধনা ছিল সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সেবা করা। অথচ তিনি ইচ্ছা করলেই গ্রামের বাড়িতে জমিদারি দেখাশোনা করে আমৃত্যু আয়াসে জীবনযাপন করতে পারতেন। উল্লেখ্য, এদেশে জমিদারি অধিগ্রহণের পূর্বপর্যন্ত তাঁকে তৎকালীন নিলক্ষিয়ার পাতিলাদহের জমিদারি প্রদান করা হলে তিনি জমিদারি দেখাশোনা করেন।

সেই সময় পাতিলাদহের অংশ ছিল কড়িতলা, নাপিতের চর, শিমুল চরা, কুশল নগর, গোপালপুর প্রভৃতি বিস্তৃত মৌজাসমূহ। তিনি যতদিন জমিদারির দায়িত্বে ছিলেন, ততদিন সুষ্ঠুভাবে জমিদারি পরিচালনা করেছেন।

জমিদারির বিষয় সম্পত্তি দেখাশোনা করার জটিল দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এক পর্যায়ে সম্পত্তির কারণে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র শুরু হলে এই নির্লোভ ব্যক্তিটি জমিদারি ছেড়ে আসামে চলে যান। তবে তিনি যদি তখন তাদের মুখোমুখি দাঁড়াতেন; সমঝোতা করতেন, তাহলে প্রাচুর্যময় জীবন পেতেন।

জমিদারি পরিচালনাকালে তাঁর জ্ঞানচর্চা ও স্বাবলম্বী হওয়ার নানা বাধা উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তিনি আসামে গিয়ে জ্ঞানচর্চা ও উপার্জনের চেষ্টা করেন। পরবর্তীকালে এই অভিজ্ঞতার আলোকে 'আসামের জঙ্গলে' শীর্ষক ক্ল্যাসিকতুল্য ভ্রমণকাহিনি লিখেছিলেন তিনি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৩ সালে বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়। সেই সময় অনাহারে প্রায় ৩০ লাখ মানুষ মারা গেছে। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার এ সময় ময়মনসিংহ অঞ্চলে ফুড কমিটির সেক্রেটারি মনোনীত হন।

এ সময় তিনি দুর্ভিক্ষকবলিত এলাকায় ঘুরে বেড়িয়েছেন, ত্রাণকাজে সহযোগিতা করেছেন। এই সময়ে বস্ত্র সংকটও দেখা দিয়েছিল। এ সকল কাজে তাঁর বিরাট ভূমিকা ছিল।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, তিনি বিভিন্ন সময়ে ব্রিটিশ আমলে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টসহ এ বোর্ডের অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি, বেঞ্চ অ্যান্ড কোর্ট ডিভিশনের চেয়ারম্যান, ডিস্ট্রিক বোর্ডের সদস্য, অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট মনোনীত হন। এছাড়া তিনি ১৯৩৬-৩৭ সালে স্পেশাল ঋণ শালিশি বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছিলেন।

উল্লেখ্য, সমকালে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ১৫, ১৬ ও ১৭ ধারায় বিধানানুযায়ী ইউনিয়ন পর্যায়ে বেঞ্চ অ্যান্ড কোর্ট ডিভিশন গঠন করা হতো। এ বেঞ্চ কোর্টে একাধিক ম্যাজিস্ট্রেট নিয়ে গঠন করা হয় এবং তারা যৌথভাবে ফৌজদারি মামলার বিচার করেন।

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ১৫, ১৬ ও ১৭ ধারার আলোকে বিধিমালা রয়েছে যা বেঞ্চের কোর্টের বিচার কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ফৌজদারি কার্যবিধিতে এ বিধানটি এখনো বলবৎ রয়েছে।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ত্রিশ-চল্লিশ দশকে তৎকালীন নিলক্ষিয়ার বিস্তৃত গ্রামের জনগণের নিরাপত্তা, দুর্যোগ মোকাবেলা, জনকল্যাণ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা, চুরি-ডাকাতি রোধসহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য গড়ে তুলেছিলেন গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী। সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে তিনি এ বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন।

এ বাহিনীর তৎপরতায় সমকালে এ এলাকায় চুরি-ডাকাতি কমেছিল। সমকালে সামাজিক অস্থিরতা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিজনিত যেকোনো অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে তাঁর কোনো জুড়ি ছিল না।

বন্যা, খরা এদেশের ইতিহাসের সাথে জড়িত। তিনি নিলক্ষিয়ায় খরা মোকাবিলার জন্য গ্রামের পার্শ্ববর্তী কুরখা ও ভরসা দুই বৃহৎ বিলের জলাভূমির মাঝে ৬ মাইল দীর্ঘ খাল খনন করেছিলেন। এতে কৃষকগণের আবাদি ফসলে গ্রীষ্ম মৌসুমে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা হওয়ায় তাঁরা খাদ্যশস্য উৎপাদনে উপকৃত হয়।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুহূর্তে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের ছিল সহজাত প্রবৃত্তি। বাংলাপিডিয়ার তথ্যমতে ১৯৫৪ সালের বন্যা সর্বোচ্চ সীমা ছাড়িয়ে যায়। এই বন্যা ছিল বাংলাদেশে সংঘটিত প্রলয়ংকরী বন্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই বন্যায় দেশের প্রায় ৬০% ভাগ এলাকা ডুবে যায় এবং স্থানভেদে এই বন্যায় ২৫ থেকে ৩০ দিন পর্যন্ত পানি স্থায়ী ছিল। এটি ছিল এদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে মারাত্মক ও ক্ষয়ক্ষতিময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বিশ্বব্যাপী গণমাধ্যমেও এই দুর্যোগ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়।

১৯৫৪ সালের ভয়াবহ বন্যার তাণ্ডবে সারাদেশের ন্যায় জামালপুরের জনজীবনে হাহাকার নেমে এসেছিল। এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে তাকালে ধু-ধু ১০-১৫ মাইল পর্যন্ত টানা অথই পানি দেখা গেছে বলে উল্লেখিত হয়। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, নিউমোনিয়া, ব্রংকাইটিস ও আমাশয় সর্বত্রই হয়েছিল। সর্বোপরি কলেরায় আতঙ্কে মানুষের প্রাণ ছিল ওষ্ঠাগত। শহরের শেষ প্রান্তে বগাবাইদ, রশিদপুর, নলেরচর, চন্দ্রা, পাথালিয়া, বজ্রাপুর ও লাঙ্গলজুড়া এলাকায় কলেরার প্রাদুর্ভাব ঘটে। নিউমোনিয়া, উদরাময় প্রভৃতি রোগের তেমন কোনো চিকিৎসা সেই সময় ছিল না, এমনকি ওরাল স্যালাইন, পেনিসিলিনও পাওয়া যেত না।

তখনকার দিনে জামালপুরের এলএমএফ ডা. তনির উদ্দিন, ডা. মতিউল্লা, ডা. মনির উদ্দিন, ডা. আবুল হুসেনসহ কয়েকজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার রোগীদের সেবায় ব্যস্ত থাকতেন। তাদের তখন নাওয়া-খাওয়ার সময় ছিল না।

সি-প্লেনে করে সরকারের লোকজন এসে জামালপুরের বন্যা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে গেছে বলে সমকালে বয়সে তরুণ ছিল এমন ব্যক্তি যারা বেঁচে আছেন তাদের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়।

শহরের জনগণ বন্যার্তদের সাহায্য করতে নানান আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ভিন্ন-ভিন্ন আয়োজন করে খাবার ও বিশুদ্ধ পানির সংস্থান করা হয়েছে। টাকা বা অর্থের সংস্থান, বস্ত্র ও লঙ্গরের জন্য অর্থ ও খাবার আয়োজনে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার এগিয়ে আসেন। ঢাকার ত্রাণ সহায়তা জন্য গানের দল গঠন করার কাজেও ভূমিকা রাখেন তিনি। সাদা খোকা ভাই (পরবর্তীকালে ওস্তাদ ফজলুল হক) কাঁধে হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের নিয়ে গান গেয়ে সাহায্য ভিক্ষা করেছিলেন। "ভিক্ষা দাও গো, ভিক্ষা দাও গো/ভিক্ষা দাও গো পুরবাসী বাঁচাও দুস্থে বাঁচাও আর্তে/কাঁদে মানবতা নীরবে নিভৃতে। বাঁচাও দুস্থে বাঁচাও আর্তে।" সাদা খোকার সাথে সমকালের অন্যান্য শিল্পীরাও এ কাজে সাহায্য করেছেন জামালপুরের ত্রাণ তহবিলের জন্য। এ সময়ও তিনি বন্যার্তদের সাহায্য করতে নানা আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন।

এদেশে প্রলয়ংকরী বন্যা পুনঃপুন সংঘটিত হয়। ময়মনসিংহ জেলা গেজেটিয়ারের তথ্যানুযায়ী ১৯৫৯, ১৯৬০ সালে সংঘটিত বন্যায় এ অঞ্চলের সমস্ত নদীর পানি বিপদসীমা অতিক্রম করে। এ বন্যায় ধনসম্পদ, বহু কাঁচা বাড়িঘরের ব্যাপক ক্ষতি হয়। আবার ১৯৬২ সালেও দুইবার বন্যা হয়েছিল। একবার জুলাইতে ও আরেকবার আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে।

এই বন্যায় বহু লোক আক্রান্ত ও মূল্যবান সম্পত্তি বিনষ্ট হয়েছিল। তিনি জামালপুরের বানভাসী মানুষের সাহায্যের জন্য ওস্তাদ ফজলুল হক (১৯৩২-১৯৯৩) প্রমুখকে সঙ্গে নিয়ে গানে গানে ঢাকা শহর ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করেন।

সমাজে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাঁর দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবদ্ধ ছিল। জামালপুরে যেখানেই তিনি সুযোগ পেয়েছেন, তিনি সমাজের জন্য স্কুল, মক্তব, মাদ্রাসা, কলেজ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখেছেন। তিনি জামালপুরে দেউরপাড়া চন্দ্রায় প্রাইমারি স্কুল, জামালপুরে প্রিপারেটরি মডেল প্রাইমারি স্কুলকে জামালপুর হাই স্কুল প্রতিষ্ঠায় অন্যতম অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

তিনি নিজ গ্রামে নিলক্ষিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯৩৫), রূপজাহান পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৩৫) প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা ছিল অতুলনীয়।

উল্লেখ্য, রূপজাহান পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় প্রথমে নিলক্ষিয়া স্কুল ও পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃতপ্রাপ্ত হয়ে হাইস্কুলে উন্নীত হয়। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ও তাঁর মামাতো ভাই অবিভক্ত বাংলার এমএলসি আজিজুর রহমান নান্না মিয়ার (১৮৯৮-১৯৬০) অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এই হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই হাইস্কুলই এতদঞ্চলের মধ্যে প্রথম হাইস্কুল। ষাটের দশকে এই হাইস্কুল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করে।

তার আমলাপাড়া বাসায় দুই-তিনজন গরিব স্কুল-কলেজের ছাত্র থাকত। তারা পড়াশোনা করত।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার পত্রিকা প্রকাশ, বিভিন্ন লেখকদের রচনা প্রকাশ এবং পোস্টার, প্রচারপত্র প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ১৯৫০ সালে জামালপুর শহরে 'আমেনা প্রেস' নামক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এই ছাপাখানা থেকে সমকালে লেখক, কবি, রাজনৈতিক কর্মীরা নানা সহযোগিতা লাভে সমর্থ হন।

এ প্রসঙ্গে বলা যায়, গোলাম মোহাম্মদ (১৮৭৫-১৯৭৬) রচিত ১৯৫৪ সালে আমেনা প্রেস হতে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার-এর পৃষ্ঠপোষকতায় মুদ্রিত হয় 'জামালপুরের গণ-ইতিবৃত্ত' গ্রন্থটি। এই গ্রন্থটিকে এ অঞ্চলের প্রথম গেজেটিয়ারতুল্য ইতিহাসগ্রন্থ বলা হয়ে থাকে।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, ১৯৫০ সালে তিনি আমেনা প্রেস থেকে নিজ সম্পাদনায় 'সাপ্তাহিক তওফিক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪'র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৫'র আবু হোসেন সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকা রেখেছিল এ পত্রিকাটি। এ কারণে তৎকালীন সরকার পত্রিকাটির ডিক্লারেশন বাতিল করে।

পারিবারিক সূত্রে আরও জানা যায়, মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ১৯৬২ সালে জামালপুরে অন্ধ কল্যাণ সমিতি নামে একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মানবতার সেবা।

এই সেবাব্রতে অনুসরণে শহরের ঈদগাহ মাঠে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের পরবর্তীকালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ প্রখ্যাত চক্ষু সার্জন টি আহমদের নেতৃত্বে একটি চক্ষু মেডিক্যাল ক্যাম্প স্থাপন করেন তিনি। এখানে তিনি কয়েকদিন দরিদ্র চক্ষুরোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা-সেবা প্রদানে নিয়োজিত থাকেন। উল্লেখ্য উপমহাদেশখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক টি আহমদের সঙ্গে মির্জা সাহেবের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল।

আত্মকর্মসংস্থানের জন্য কারিগরি শিক্ষার বিকল্প নেই। শিক্ষিত কর্মক্ষম বেকার যুবকদেরকে দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে তিনি জামালপুরে প্রথম দি জামালপুর কমার্শিয়াল ট্রেনিং কলেজ নামে শহরে প্রথম টাইপিং, শর্টহ্যান্ড ও টেলিগ্রাফি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

এখান থেকে প্রশিক্ষণগ্রহণ করে একাধিক প্রশিক্ষণার্থী দেশ-বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন। তাঁর এই প্রতিষ্ঠানটি ৯০'র দশকের শুরুর দিকে বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা মাত্র কয়েকটি কোম্পানির হাতে ছিল। তখন জেলা শহরে খুব সামান্য পরিমাণে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হতো। জামালপুর এদেশের একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী মহকুমা। এই মহকুমা শহরে সন্ধ্যা নেমে এলেই অন্ধকারে ডুবে যেত। হারিকেন, লণ্ঠন বা কুপির আলোতে চলত তাদের জীবন।

সুধীজন ও পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ১৯৫৯ সাল থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি দি জামালপুর কো-অপারেটিভ ইলেকট্রিক সাপ্লাই সোসাইটির মাধ্যমে এ কাজটি করেন। এজন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

তাঁর চেষ্টায় ১৯৬১ সালে জামালপুর শহরে ইলেকট্রিসিটির অনুমোদন দেন তৎকালীন সরকার। এভাবে তিনি জামালপুরে প্রথমবারের মতো বিদ্যুৎ প্রবর্তনে ভূমিকা পালন করেন। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের জীবনে এটি সবচেয়ে স্মরণীয় কীর্তি।

বিদ্যুতের মতো টেলিফোনও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার জামালপুরের ১৯৬২ সালে টেলিফোন ব্যবস্থা চালু করার ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখেন। এর ফলে মূলত তৎকালীন সংবাদকর্মী ও রাজনৈতিক কর্মীরা ব্যাপক সুফল পেয়েছিল। ফলে এদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের ঢাকার কর্মসূচি জামালপুরে পালিত হতো।

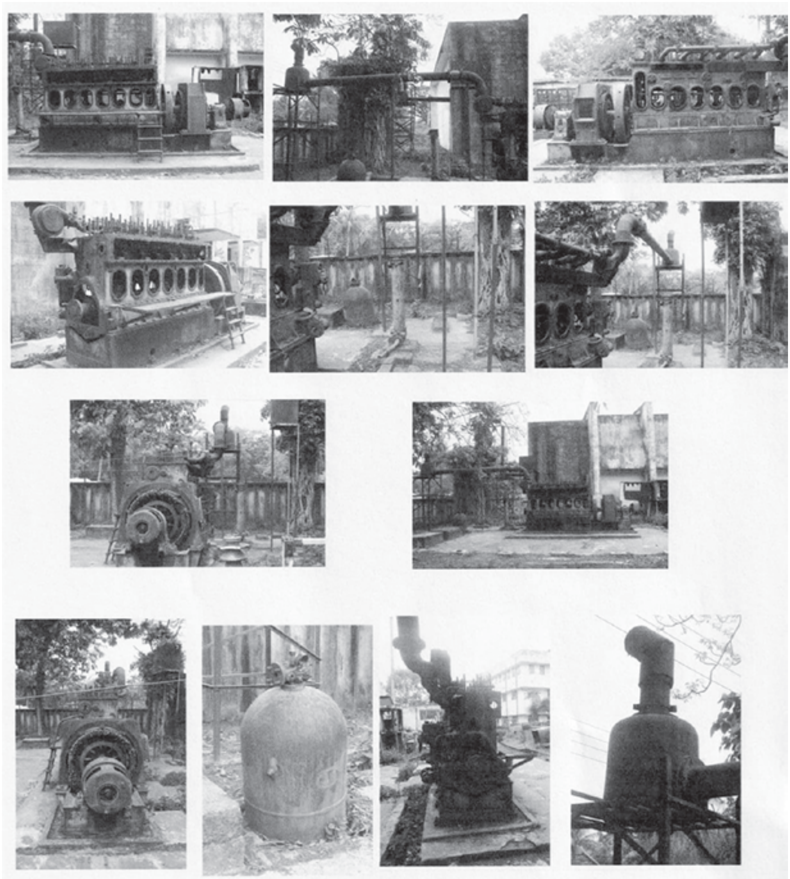
মোটকথা এদেশের স্বাধিকার আন্দোলনে চালুকৃত টেলিফোন ব্যবস্থা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এতে করে আন্দোলনের কেন্দ্র ঢাকা থেকে খবর পৌঁছে যেত সহজেই জামালপুর মহকুমায়। ফলে এ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে স্বাধিকার আন্দোলনের চেতনা বেগবান হতো।

বিশেষ করে এখানকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ঢাকার তৎকালীন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে সমকালীন চলমান রাজনৈতিক ধারায় বিভিন্ন কর্মসূচি পালন, প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মুক্তি সংগ্রাম চালিয়ে নেওয়ার কাজে প্রভূত সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে টেলিফোন ব্যবস্থা।

উল্লেখ্য, ব্রিটিশ ভারতে ১৮৫৩ সালে তদানীন্তন ডাক ও তার বিভাগের আওতাধীন টেলিফোন শাখা সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে ১৮৮৫ সালে 'টেলিগ্রাফ আইন' আইন প্রণীত হওয়ার পর এর আওতায় স্বল্প পরিসরে টেলিফোনের কার্যক্রম শুরু হয়।

পাকিস্তান আমলে ১৯৬২ সালে এই টেলিগ্রাফ শাখা পাকিস্তান টেলিগ্রাফ অ্যান্ড টেলিফোন বিভাগ নামে একটি স্বতন্ত্র সরকারি বিভাগ হিসেবে পুনর্গঠিত হয়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭১ সালে এ অঞ্চলে স্থাপিত সমুদয় টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন স্থাপনাদি নিয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বিভাগ গঠিত হয়।



জামালপুর শহরে প্রথম বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ক্রয়কৃত মেশিনারিজ (বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, জামালপুর অফিসে সংরক্ষিত)

১৯৬০-১৯৬৫ মেয়াদে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার বাংলাদেশের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী জামালপুর পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তখন মহকুমা প্রশাসকেরা পদাধিকারবলে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর চেষ্টায় পৌরসভার সব ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নত হয়। পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে সততার সাথে দায়িত্ব পালন করে প্রশংসিত হয়েছেন। তাঁর সময়ে পৌরসভার স্বচ্ছ কর্মপরিবেশ নিয়ে আজও সেই সময়ের লোকজন স্মরণ করে।

একটি শহরে বা নগরে নগরবাসীর অনিবার্য যে চাহিদাগুলো তার মধ্যে পাবলিক হল, কবরস্থান প্রভৃতি অন্যতম। জানা যায়, পৌরসভা চত্বরে ছিল বর্তমান জামালপুর

জেনারেল হাসপাতালের অবস্থান। ১৯৫৫ সালে পাথালিয়া এলাকায় নিজস্ব ভবন হওয়ার পর হাসপাতাল সেখানে স্থানান্তর হয়। পরে পৌরসভার অভ্যন্তরীণ চত্বরে ষাটের দশকে পাবলিক লাইব্রেরি, পাবলিক হলের কার্যক্রম শুরু হয়।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনকালে রাস্তাঘাট, পাবলিক হল, পাবলিক লাইব্রেরি, ওয়াটার ওয়ার্কস, স্টেডিয়াম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠায় অন্যতম কার্যকর ভূমিকা পালন করেন।

খেলাধুলাতে তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল। সেকালে এ অঞ্চলের যুবকেরা খেলাধুলায় পিছিয়ে ছিল। তিনি এ অঞ্চলে ফুটবল খেলাকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। ছাত্রাবস্থায় থেকে তিনি ছিলেন কৃতি ফুটবলার।

'কালের কণ্ঠ' পত্রিকায় ১৬ই অক্টোবর ২০১৫ তারিখে 'জেলার খেলা : জামালপুর, পেছনের মানুষ', শীর্ষক খবরে মির্জা সাহেবের ক্রীড়াঙ্গনের অবদানকে স্মরণ করে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "জেনারেটর এনে জামালপুরে (ওয়াপদায়) প্রথমবার বিদ্যুৎ বাতি জ্বালিয়েছিলেন আশরাফ উদ্দিন হায়দার। জেলার ক্রীড়াঙ্গনেও আলো জ্বালানোর কাজটা শুরু তাঁর হাত দিয়েই।"[৯]

জামালপুর শহরের দেউরপাড় চন্দ্রায় অবস্থিত প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী রাজা হরিশচন্দ্রের দিঘি। এ দিঘিটিকে ঘিরে লোকপালা প্রচলিত। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার তাঁর নিজস্ব আমেনা প্রেস থেকে তাঁর সম্পাদনায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'তওফিক' পত্রিকায় এই দিঘির করুণ কাহিনির তথ্যাবলি তুলে ধরেন।

সেই তথ্যের ভিত্তিতে পরবর্তীকালে 'চন্দ্রাবতী' নামে একটি নৃত্যনাট্য রচিত হয়।[১০] এতে বোঝা যায়, তিনি ছিলেন ঐতিহ্য চেতনাপ্রিয় ব্যক্তি।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ১৯৫৫ সালে উক্ত সুপ্রাচীন পতিত ব্যবহারের অনুপযোগী দিঘিটি ক্রয় করে সংস্কারপূর্বক তা পুনরায় খননের মাধ্যমে ব্যবহার-উপযোগী করেন। পরবর্তীকালে পরিকল্পনা মোতাবেক মৎস্যচাষ করে তা জনপ্রিয় করে তোলেন। এতে এই অঞ্চলের যুবকদের স্বাবলম্বী হতে প্রেরণা জোগায়।

দিঘিটির নৈসর্গিক সৌন্দর্যের ছোঁয়া পেতে আজও প্রকৃতিপ্রেমী ব্যক্তিরা সেখানে প্রিয়জনকে নিয়ে সেই সৌন্দর্য উপভোগ করেন। কুরখা ও ভোরশা বিল জামালপুরের বকশীগঞ্জে অবস্থিত। এই দুই বিলের মাঝে স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে তিন মাইল দীর্ঘ খাল খনন করে কৃষিতে সেচ তিনি দীর্ঘ খাল খনন দিয়ে নিশ্চিত করে কৃষকদের প্রভূত উপকার সাধন করেছেন। খননকৃত এই খাল এ অঞ্চলে মির্জা খালি নামে পরিচিত। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার সমাজ-হিতৈষী নানা কাজে আমৃত্যু নিয়োজিত ছিলেন।

প্রাচীন কাল থেকেই মানব সমাজে ভিক্ষাবৃত্তি চলে আসছে। উপমহাদেশেও এর ইতিহাস দীর্ঘ দিনের। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলের শোষণ, বঞ্চনা এবং নদী ভাঙন,

দারিদ্র্য, রোগ-ব্যাধি, অশিক্ষা ইত্যাদি কারণে ভিক্ষাবৃত্তির ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। ভিক্ষাবৃত্তি সমাজের অভিশাপ। ভিক্ষাবৃত্তি একটি সামাজিক ব্যাধি। এটি স্বীকৃত কোনো পেশা নয়। ভিক্ষাবৃত্তিতে কারও জীবন অতিবাহিত হতে পারে না। আমাদের কারোর এটা কাম্য নয়। এটি মানবাধিকার লঙ্ঘন। ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ হওয়া উচিত।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের জনহিতকর কাজের মাঝে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ ছিল জামালপুরে 'ভিক্ষাবৃত্তি দূরীকরণ কর্মসূচি'। তিনি ১৯৮০ সালে এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন অফিসে বিশেষ করে জেলা প্রশাসন, সমবায়, বিআরডিপি, মৎস্য ও সমাজসেবা অফিসে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। কিন্তু তাদের কর্মকাণ্ডে হতাশ হয়েছেন।

জেলা প্রশাসনসহ বিভিন্ন দপ্তরে ঘুরে ঘুরে তেমন কোনো সাড়া না পেয়ে নিজ উদ্যোগে দেউড়পাড় চন্দ্রায় তাঁর দিঘির পাড়ে অসংখ্য ঢেঁকি স্থাপন করে সেখানে ভিক্ষুকদের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন তিনি। জামালপুর শহরে ভিক্ষাবৃত্তি রোধের জন্য প্রাথমিকভাবে হলেও তিনি কিছু কাজ করেছিলেন।

অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ও বেঞ্চ কোর্টের সদস্য

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার প্রথম শ্রেণির অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ও বেঞ্চ কোর্টের সদস্যরূপে তৎকালীন শেরপুর থানার বহু ছোটখাটো ফৌজদারি মামলা মীমাংসা করেছেন। তিনি দুইবার অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। একবার বিশ শতকের চল্লিশ দশকে ও দ্বিতীয়বার সত্তর দশকে। এ দায়িত্ব পালনকালে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি।

সেই সময় হিন্দুদের নানারকম বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও সম্পত্তি রক্ষায় তিনি এ সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল। তিনি সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ বা পুলিশের রিপোর্টের ভিত্তিতে বা অপরাধ সংঘটনের নিজের প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অপরাধ আমলে নিয়ে বিচারিক কার্য সমাধান করেছেন।

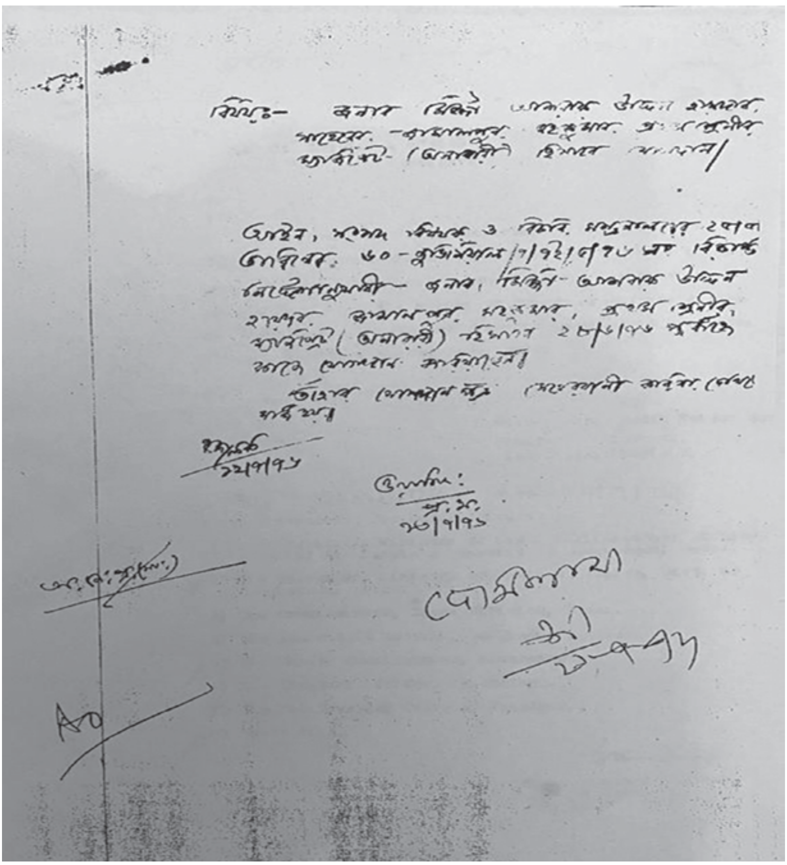
এছাড়া ছোটখাটো বিরোধ তিনি ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে উভয় পক্ষের লোকদের ডেকে সালিশির মাধ্যমে বিষয়টি সুষ্ঠু মীমাংসা করে দিয়েছেন। তাঁর এ ব্যবস্থা উভয়পক্ষ মেনে নিতেন এবং এ ব্যবস্থা সরকারি ব্যবস্থার মতোই কার্যকর হতো।

তিনি অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ও বেঞ্চকোর্টের সদস্য হিসেবে তৎকালীন জেলা ও মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটকে তাঁর এখতিয়ারাধীন অঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা এবং ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত বিষয়াবলির নিরপেক্ষ রিপোর্ট প্রদান করতেন। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়বিচারের জন্য তিনি সাধ্যমতো কাজ করেছেন।

বিষয়ঃ জনাব মির্জ্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার সাহেবের জামালপুর মহকুমার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট (অনারারী) হিসেবে যোগদান

আইন, সংসদ বিষয়ক ও বিচার মন্ত্রণালয়ের ২৫.০৫.৭৬ তারিখের ৬০-জুডিশিয়াল ৭/৭ই/৫/৭৬ এর বি. শর্ত নির্দেশানুযায়ী জনাব মির্জ্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার জামালপুর মহকুমার, প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট (অনারারী) হিসেবে ২৮.০৬.৭৬ পূর্বাহ্নে কাজে যোগদান করিয়াছেন।

তাহার যোগদানপত্র মেহেরবাণী করিয়া দেখিতে মর্জি হয়।



বিষয়ঃ- জনাব মির্জ্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার সাহেবের জামালপুর মহকুমার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট (অনারারী) হিসাবে যোগদান।

আইন, সংসদ বিষয়ক ও বিচার মন্ত্রণালয়ের ২৫/৫ তারিখের ৬০-জুডিশিয়াল/৭/৭ই/৫/৭৬ এর বি শর্ত নির্দেশানুযায়ী জনাব মির্জ্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার জামালপুর মহকুমার, প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট (অনারারী) হিসাবে ২৮/৬/৭৬ পূর্বাহ্নে কাজে যোগদান করিয়াছেন।

তাহার যোগদানপত্র মেহেরবাণী করিয়া দেখিতে মর্জি হয়।

উপস্থাপিত:

মির্জ্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট পদের যোগদান পত্রের চিত্রলিপি

To,
The sub-divisional officer
Jamalpur

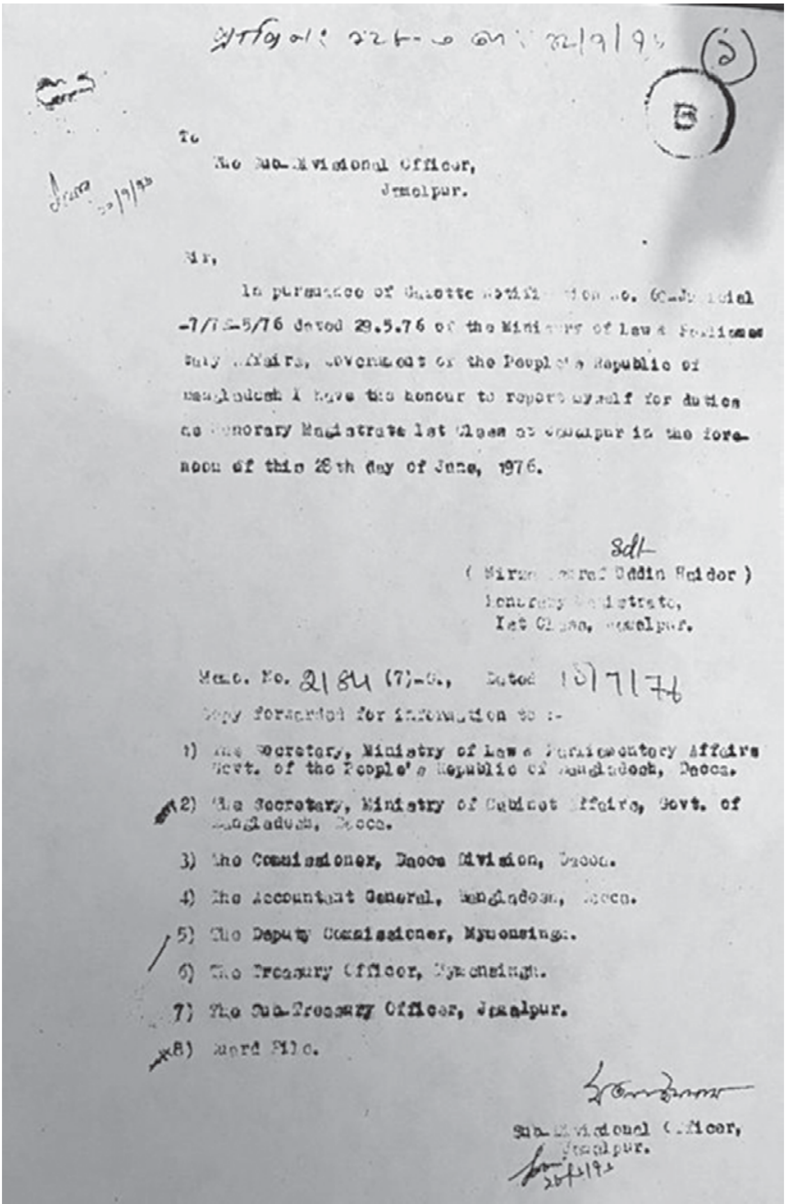
Sir,
In pursuance of gazette notification No.: 60- Judicial-7/75-5/76 dated 29.5.76 of the Ministry of Law and Parliamentary affairs, government of the People's Republic of Bangladesh I have the honor to report myself for duties on honorary magistrate 1st class of Jamalpur in the fore-noon of the 26th day of June,1976.

Sd/-
(Mirza Ashraf Uddin Haider)
Honorary Magistrate
1st class, Jamalpur

Memo No.: 2/84(7) -G Dated 15/7/76
Copy is forwarded for information to:

1) The secretary, Ministry of Laws and parliamentary Affairs, The People's Republic of Bangladesh, Dacca.
2) The secretary, Ministry of Cabinet Affairs, Government of Bangladesh, Dacca.
3) The Commissioner , Dacca Division, Dacca,
4) The Accountant General, Bangladesh, Dacca.
5) The Deputy Commissioner, Mymensingh.
6) The Treasury Officer, Mymensingh.
7) The sub-treasury Officer, Jamalpur.
8) Guard file.

Sd/-
Sub-divisional Officer
Jamalpur



To

The Sub-Divisional Officer,
Jamalpur.

Sir,

In pursuance of Gazette notification no. 60-Judicial -7/76-5/76 dated 29.5.76 of the Ministry of Law & Parliamentary Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh I have the honour to report myself for duties as Honorary Magistrate 1st Class of Jamalpur in the forenoon of this 28th day of June, 1976.

Sd/-
(Mirza Ashraf Uddin Haidar)
Honorary Magistrate,
1st Class, Jamalpur.

Memo. No. 2184 (7)-G., Dated 15/7/76
Copy forwarded for information to :-

1) The Secretary, Ministry of Law & Parliamentary Affairs Govt. of the People's Republic of Bangladesh, Dacca.
2) The Secretary, Ministry of Cabinet Affairs, Govt. of Bangladesh, Dacca.
3) The Commissioner, Dacca Division, Dacca.
4) The Accountant General, Bangladesh, Dacca.
5) The Deputy Commissioner, Mymensingh.
6) The Treasury Officer, Mymensingh.
7) The Sub-Treasury Officer, Jamalpur.
8) Guard File.

Sub-Divisional Officer,
Jamalpur.

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট পদের গৃহীত যোগদান পত্রের চিত্রলিপি

সাহিত্যচর্চা ও সাংবাদিকতা

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার একজন নিবেদিতপ্রাণ রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। সাহিত্য ও সাংবাদিকতার প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল। সাহিত্যের প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। তাঁর লেখালিখির হাত ছিল। তিনি কবিতা লিখতেন। উপন্যাস ও ভ্রমণকাহিনি লিখেছেন। দীর্ঘদিন সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত 'বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা জামালপুরে'র তথ্যানুযায়ী–

> 'পাতিলদহ পরগনার একাংশের জোতদার ছেড়ে তিনি জামালপুর শহরে বসবাস শুরু করেন। এখান থেকে তিনি ১৯৫০ সালে আমেনা প্রেস স্থাপন করে 'তওফিক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন।[১১]

'তওফিক' পত্রিকাটি ছিল সাপ্তাহিক। এ পত্রিকায় জামালপুরের সমকালের রাজনৈতিক অবস্থা, সামাজিক পরিস্থিতি প্রতিফলিত হতো। এ পত্রিকায় তিনি নিজেই সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখতেন। সমকালীন অনেক বাস্তব চিত্র তাতে ফুটে উঠেছে। জানা যা, মির্জা সাহেবের বর্তমান বাড়ি মির্জা হাউসের সামনে ডান দিকে একদা শান্তি প্রেস ছিল। এটি তিনি ক্রয় করে নাম পরিবর্তন করে নাম করেন আমেনা প্রেস। এই প্রেস থেকে সমকালে অনেক গ্রন্থ, পুস্তিকা, হ্যান্ডবিল প্রকাশিত হয়েছে। জামালপুরের গণ-মানুষের কথা তলে ধরার জন্য তিনি এই প্রেস থেকে 'তওফিক' নামে পত্রিকা বের করেন। 'জামালপুরের গণ-ইতিবৃত্ত' গ্রন্থাকার গোলাম মোহাম্মদ লিখেছেন

> '১৯৫০ সাল হতে আমেনা প্রেসের স্বত্বাধিকারী মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার নিজ সম্পাদনায় 'তওফিক' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।'[১২]

১৯৫৩ সালে জামালপুরে বড় একটি সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ছিলেন এ সম্মেলনের জেনারেল সেক্রেটারি। পূর্ব বাংলার ব্রিটিশ সাহিত্যিকদের সাথে তাঁর পরিচয় ও যোগাযোগ ছিল।

জামালপুরের প্রবীণ সাংস্কৃতিক কর্মী, কবি আলী জহির তাঁর লেখা 'শতবর্ষের আলোকে জামালপুরের সাহিত্যচর্চা' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, '১৯৬৭ সনে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার সম্পাদনা করেন 'ঝিনাই' নামের একটি পত্রিকা।'[১৩]

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার রচনা করেন দুটি গ্রন্থ–'আসামের জঙ্গলে' (ভ্রমণকাহিনি) ও উপন্যাস 'মায়ার ভিটা'। 'আসামের জঙ্গলে' একটি ক্ল্যাসিকতুল্য ভ্রমণকাহিনি। এছাড়া তাঁর লেখা অপ্রকাশিত কবিতার পাণ্ডুলিপি ছিল। তাঁর অপ্রকাশিত একটি হামদ-নাতের পাণ্ডুলিপি রয়েছে।

এই পাণ্ডুলিপির হামদ-নাতগুলোর ছন্দবৈশিষ্ট্য অপূর্ব। তিনি হামদ-নাতগুলো একটি পঙ্ক্তিতে দুই পর্বে বিন্যাসে কমবেশি ১২+১২ মাত্রার প্রবহমান পয়ার ছন্দে লিখেছেন। এই হামদ-নাতগুলোতে দুই পঙ্ক্তিতে একটি পূর্ণভাব সমাপ্য হয়েছে।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের এসব সাহিত্যচর্চা ও সাংবাদিকতায় নিহিত আছে সমকালের তাঁর জীবনদর্শন। সাহিত্য, সাংবাদিকতা, ক্রীড়া প্রভৃতি কর্মকাণ্ডে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল অতুলনীয়।

সমকালে কতিপয় ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য

পারিবারিক আভিজাত্য, আত্মীয়তা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংশ্লিষ্টতা এবং অন্যান্য কর্মদক্ষতা ও রাজনৈতিক কর্মী ইত্যাদি কারণে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার তাঁর সমকালে অনেক ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। তিনি যেসব ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে এসেছিলেন তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন বিশ শতকের শুরু থেকে ষাট-সত্তর দশক পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে কীর্তিমান ও বিখ্যাত।

পারিবারিক সূত্র ও সুধীজন থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, শৈশবে তিনি নিজ বাড়িতে প্রিয়জন নানা জয়নুল আবেদিনের নিবিড় সান্নিধ্যে এসেছিলেন। পারিবারিক আত্মীয়তার সূত্রে তিনি সান্নিধ্য পেয়েছিলেন আজিজুর রহমান নান্না মিয়া, বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবুল ফজল মোহাম্মদ আহসান উদ্দিন চৌধুরী প্রমুখের।

সমকালে জামালপুরের নাম করা মোক্তার ছিলেন কফিল উদ্দিন আহমেদ। তিনি মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের আত্মীয়। কফিল মোক্তার একজন হৃদয়বান ব্যক্তি ছিলেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। লে. কর্নেল (অব.) এস.আই.এম. নূরন্নবী খান বীর বিক্রম (বরখাস্ত) তার লেখা 'অপারেশন বাহাদুরাবাদ' (২০১৭) গ্রন্থে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতার কথা বিষয়ে কফিল মোক্তারের অবদানের উল্লেখ করেছেন। [১৩]

রাজনৈতিক জীবনে মির্জা সাহেব পাক-ভারত উপমহাদেশের অনেক বিশিষ্ট রাজনীতিবিদের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। তাঁদের কারও কারও সঙ্গে সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। তন্মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, নুরুল আমিন, আব্দুল মোনেম খান, ওয়াজেদ আলী খান পন্নী, নওয়াব আলী চৌধুরী, খাজা নাজিমউদ্দিন, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আবুল মনসুর আহমদ প্রমুখ। স্বাধীনতাত্তোর এদেশে আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। আরও যাদের সঙ্গে মির্জা সাহেবের পরিচয় ছিল , কমরেড মণি সিংহ, বারীণ দত্ত, খোকা রায়, অনিল মুখার্জী, বিধূভূষণ সেন, প্রফেসর শান্তিময় রায়, মনোরঞ্জন ধর, কৃষক নেতা হাতেম আলী খান, মন্মথনাথ দে, সত্যেন সেন, ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখ।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। তাঁর সঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক কর্মসূচির কাজে ঘুরে বেড়িয়েছেন। দেশবন্ধুর সান্নিধ্য পাওয়া ও পরম স্নেহধন্য হওয়ার সুযোগ তাঁর জীবনের উজ্জ্বল স্মৃতি।

বৃহত্তর ময়মনসিংহের অনেক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা ছিল। তন্মধ্যে গিয়াসউদ্দিন আহাম্মদ (যুক্তফ্রন্ট আমলে খাদ্যমন্ত্রী), আশেক মাহমুদ তালুকদার (১৮৭০-১৯৬০) ঘটি পালোয়ান (বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী), আবদুল হামিদ মোক্তার (১৯০১-১৯৭১), খান বাহাদুর ফজলুর রহমান, মোসাহেব আলী খান (১৮৯১-১৮.১২.১৯৭৩) (১৯৬২ সালে পরোক্ষ ভোটে এমএনএ), সৈয়দ আবদুস সুলতান, কাজেম উদ্দিন আহমদ (১৯০৮-১৯৮৯), নবাবজাদা হাসান আলী চৌধুরী, নাসির উদ্দিন সরকার (১৮৯২-১৯৭৭) (জামালপুর মহকুমা কংগ্রেসের সেক্রেটারি), বিপ্লবী রবি নিয়োগী (১৯০৯-২০০২) (আন্দামান-ফেরত ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী), সৈয়দ আবদুস সাত্তার, প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ, অ্যাডভোকেট আবদুস সোবহান, জর্জিস খান, আমজাদ হোসেন, সুরুজ চৌধুরী, ওয়াজেদ আলী চৌধুরী, মোহাম্মদ রেজা খান, সৈয়দ ইমামুর রশিদ, উমির উদ্দিন তালুকদার, মোঃ আঃ হাই বাচ্চু মিয়া, আঃ হামিদ কবিরত্ন, মোঃ বছির উদ্দিন মাস্টার, আঃ গফুর মণ্ডল প্রমুখ।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার সমকালের তৎকালীন জামালপুর মহকুমার এসডিও, ময়মনসিংহ জেলার ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেটসহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ও পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান পদসহ নানা কার্যসাধনের জন্য সহযোগিতা পেয়েছেন। এই সূত্রে তাঁদের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ও যোগাযোগ ছিল।

জামালপুরে আরও যাঁদের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা ছিল তাদের মধ্যে–ঘটি-বাটি-পেয়ালা, পালোয়ান, তিন সহোদর ভাই ফজলুর রহমান আজনবী, এ.এইচ.এম.এ.কুদ্দুস, রিয়াজুল ইসলাম, এম এস হুদা, আশরাফুদৌলা পাহলোয়ান, প্রিন্সিপাল রইস উদ্দিন, কমর উদ্দীন, মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার পাহলোয়ান, দিদারুল আলম (খুররম), ইঞ্জিনিয়ার আবদুল জব্বার, আখতারুজ্জামান (মতি মিয়া), অ্যাডভোকেট আবদুল হাকিম, আলী আসাদ, তৈয়ব আলী আহমদ, তাছির উদ্দিন আহমদ, হায়দর আলী মল্লিক, তৈয়ব আলী সরকার, জেনারেল খালেদ মোশাররফ, রাশেদ মোশাররফ, হাসান হাফিজুর রহমান, করিমুজ্জামান তালুকদার, মোহাম্মদ আবদুস সামাদ (সত্তরের নির্বাচিত এমএনএ), ডা. নুরুল ইসলাম, মোঃ আঃ রশীদ, নঈম উদ্দিন আহমেদ, ফজলুল করিম, স্পিকার আবদুল করিম, সফির উদ্দীন আহাম্মদ মিয়া, অ্যাডভোকেট আশরাফ হোসেনসহ অনেক ব্যক্তিত্বের।

উল্লেখ্য, আখতারুজ্জামান মতি মিয়া (জন্ম. ১৯৩০- নিখোঁজ ১১.২.১৯৯১) দীর্ঘদিন ছাপাখানাশিল্পের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। মির্জা সাহেবও ছাপাখানা ও প্রকাশনাশিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জামালপুর ও ময়মনসিংহের তদানীন্তন অনেক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মির্জা সাহেব পরিচিত ছিলেন। তন্মধ্যে ক্ষিতীশ তালুকদার, আশুতোষ দত্ত, আব্দুল গফুর মোক্তার, রিয়াজউদ্দিন তালুকদার, মৌলবী মীর আহমদ আলী, তৈয়াব আলী আহমদ, খান সাহেব আশরাফ হোসেন, গোলাম মোহাম্মদ অন্যতম।

কতিপয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার সৎ ও আদর্শবান ব্যক্তি ছিলেন। বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থায় তিনি নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সুখ্যাতি ও জনপ্রিয়তার জন্য জামালপুরের মানুষ শ্রদ্ধাভরে 'মির্জা সাহেব' বলে সম্বোধন করত। তিনি জামালপুরের মানুষের কাছে শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

তাঁর মধ্যে কোনো গোঁড়ামি ছিল না। মনে-প্রাণে তিনি ছিলেন প্রগতিশীল ও মানবতাবাদী মানুষ। তিনি নৈরাশ্যবাদ পছন্দ করতেন না। বিশিষ্ট রাজনীতিক মোহাম্মদ রেজা খান (মৃত্যু ১৮ই আগস্ট ২০২১) ছিলেন তাঁর দীর্ঘদিনের সঙ্গী ও সহযোদ্ধা। তিনি জানিয়েছেন, 'মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ছিলেন জামালপুরের জন্য অন্তঃপ্রাণ ব্যক্তি। জামালপুরের জন্য তাঁর অনেক অবদান রয়েছে। তিনি ব্যক্তিজীবনে ছিলেন ভদ্র, রুচিশীল ও পরোপকারী। তাঁর প্রচণ্ড আত্মসম্মানবোধ ছিল।'

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার বেশি বয়সে ধৈর্যসহকারে পড়াশোনা করে বিএ পরীক্ষার স্তর পর্যন্ত উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। মধ্যবয়সে তিনি জামালপুর শহরের বাসিন্দা হলেও গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল নিবিড়। আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধবের খোঁজখবর নিতেন, যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। তাঁর মতো ব্যক্তিত্ববান মানুষ বর্তমান সমাজে বিরল। ফুটবল খেলাকে খুব ভালোবাসতেন।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার শান্তশিষ্ট দিলখোলা মানুষ হলেও ছিলেন দৃঢ়চেতা। নিজেকে অন্যের বোঝা করতে চাইতেন না। তিনি সর্বদা একটা ইসলামি নীতিবোধ তার মনে লালন করতেন। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জমিদারি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করলেও এ নিয়ে আত্মীয়দের মধ্যে মনোমালিন্য হলে সিদ্ধান্ত নিলেন জমিদারি ছেড়ে আসাম যাবেন।

নিজে নিজেই উপার্জন করবেন। পরবর্তীকালে তিনি তা-ই করেছিলেন। তিনি এই অভিজ্ঞতার আলোকে 'আসামের জঙ্গলে' ক্ল্যাসিকতুল্য ভ্রমণকাহিনি এ প্রেক্ষাপটেই লিখেছিলেন।

এই বিষয়ে পিতা সম্পর্কে পুত্র বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার জানিয়েছেন, 'আব্বা বলতেন অসৎ উপার্জনের এক পয়সাও তোমাদের শরীরে নাই। আমাদের গর্বের বিষয় এখানেই। আমরা এক সৎ, আদর্শবান পিতার সন্তান।'

সমকালীন প্রতিক্রিয়া

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার সম্পর্কে ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসনের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত 'ময়মনসিংহের চরিতাভিধান'-এ নিম্নোক্ত পরিচিতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে :

> আশরাফ উদ্দিন হায়দার, মির্জা : ১৯০৩-১৯৭৩ খ্রী. নিলক্ষিয়া, ইসলামপুর, জামালপুর। রাজনীতিক, সাংবাদিক, সমাজসেবী ও লেখক। বিএ পাশ। ব্রিটিশ বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। দীর্ঘদিন জামালপুর পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান

> পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জামালপুর থেকে প্রকাশিত (১৯৫০) খ্রী. সাপ্তাহিক তৌফিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। গ্রন্থ : আসামের জঙ্গলে, ভিটার মায়া।[১৪]

এই ভুক্তিতে কিছু ভ্রান্তির অবকাশ রয়েছে। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের মৃত্যু হয়েছিল ১৯৮৫ সালের ১০ই জুন। যদিও ভুক্তি প্রণেতা সূত্রে উল্লেখ করেছেন সাক্ষাতে ব্যক্তি আলাপচারিতায় তিনি এ ভুক্তি তৈরি করেছেন।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের সামাজিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম সহযোগী ও সঙ্গী ছিলেন জামালপুরের বিশিষ্টজন প্রবীণ সাংবাদিক এ এ কে মাহমুদুল হাসান দারা মিয়া (জন্ম. ১৬ই মে ১৯৩৫)। তাঁর সম্পর্কে তিনি সংক্ষেপে বলেন, 'মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার জামালপুরের অত্যন্ত সামাজিক ও পারিবারিক একজন মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অমায়িক ও ওজনদার মানুষ। তাঁর সন্তান-সন্ততিরা সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। এরকম খুব কম পরিবারেই দেখা যায়।'

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার প্রচারবিমুখ ছিলেন। এই নিঃস্বার্থ ও প্রচারবিমুখ মানুষটি সব সময় সচেষ্ট থেকেছেন এলাকার মানুষের উন্নয়নের কাজে। তিনি নিজেকে জাহির করেননি।

এ কারণে তাঁর জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর আলোচনা হয়েছে তুলনামূলকভাবে খুবই কম। তবুও তাঁর সাহিত্যচর্চা ও সাংবাদিকতা সম্পর্কে খণ্ডিত আকারে মন্তব্য করেছেন তাঁর কিছু পরিচয় দেয়া হলো।

'জামালপুরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' শীর্ষক এক প্রবন্ধে প্রদীপ কান্তি মজুমদার 'জামালপুর সাহিত্যচর্চা ও সাংবাদিকতার ঐতিহ্য গৌরবের বর্ণনা দিতে গিয়ে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের কথা লিখেছেন।[১৫]

একইভাবে জামালপুরের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কর্মী, কবি আলী জহির তাঁর 'শতবর্ষের আলোকে জামালপুরের সাহিত্যচর্চা' শীর্ষক প্রবন্ধে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের সম্পাদিত 'ঝিনাই' নামের একটি পত্রিকার কথা লিখেছেন।[১৬]

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার জামালপুরে যে সময় সাহিত্যচর্চা ও সাংবাদিকতায় এসেছিলেন সেই সময়টায় প্রতিবন্ধকতা ছিল। তবুও সামগ্রিকভাবে সাহিত্য, সাংবাদিকতা, সমাজসেবা সব মিলিয়ে সমকালে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের যতটুকু পরিচয় পাওয়া যায় তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এ প্রসঙ্গে 'যুগান্তর' পত্রিকায় ১৭ই সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে সাহিত্য সাময়িকী জামালপুর জেলার সাহিত্য নিয়ে বিশেষ আয়োজন 'জামালপুরের সাহিত্য যুগে যুগে' শীর্ষক প্রবন্ধে জামালপুরের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সাযযাদ আনসারী এ অঞ্চলের পত্রপত্রিকার ধারাবাহিকতা ও মুদ্রণশিল্পের বর্ণনায় মির্জা সাহেবের কথা তুলে ধরেছেন।

লেখক জলিল খান তাঁর 'বকশীগঞ্জের ইতিকথা ও লোকসংস্কৃতি' গ্রন্থে এবং লেখক রজব বকশী তাঁর 'জামালপুর জেলার ইতিহাস' গ্রন্থে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের কিছু তথ্য তুলে ধরেছেন।[১৭] বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত 'লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা জামালপুর' গ্রন্থে 'মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের কতিপয় তথ্য রয়েছে।[১৮]

লেখক রজব বকশী তাঁর 'জামালপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস' গ্রন্থে 'জেলার রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস' (১৯৪৭-১৯৭০) বর্ণনা তুলে ধরতে গিয়ে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের আমেনা প্রেস ও 'তওফিক' পত্রিকার তথ্য তুলে ধরেছেন।

বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, প্রবীণ সাংবাদিক উৎপলকান্তি ধর বলেন, 'মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ভাই ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে কংগ্রেসি কর্মী ছিলেন। ১৯৪৬ পরবর্তীকালে তিনি মুসলিম লীগের ধ্যান ধারণার আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন এবং পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।'

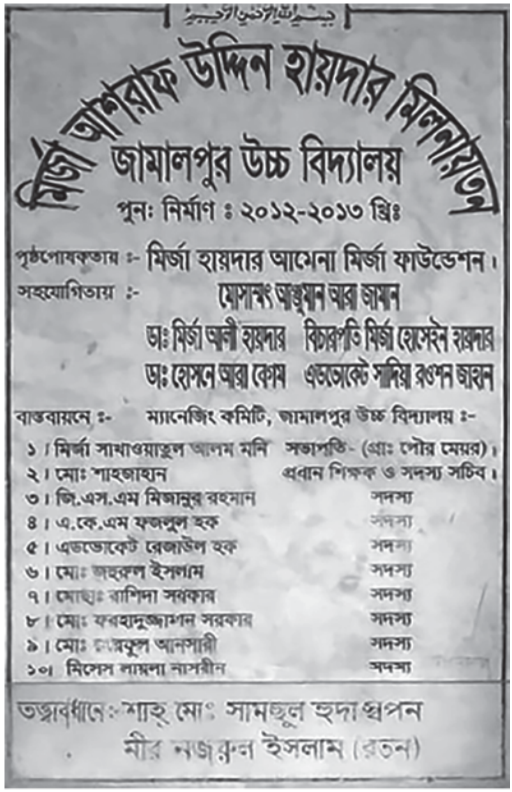
মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার সম্পর্কে সমকালীন প্রতিক্রিয়া উল্লেখ করা হলো। উল্লিখিত সমকালীন প্রতিক্রিয়াসমূহের মূল্যায়নে বলা যায় মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য সমকালীন সাহিত্য-সংস্কৃতিক কর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন।

স্মৃতিরক্ষা ও স্বীকৃতি

জামালপুরের ইতিহাসে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর স্মৃতিরক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। তিনি জামালপুরবাসীর নিকট 'মির্জা সাহেব' নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। তাঁর কর্ম ও অবদানের জন্য জামালপুর হাইস্কুলের অডিটোরিয়ামটি তাঁর নামে নামকরণ করা হয়েছে। এ অডিটোরিয়াম ভবনের দেয়ালে স্থাপিত প্রস্তরখণ্ডে নানা তথ্য লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই অডিটোরিয়ামের পূর্বাপর বর্ণনা দিয়েছেন জামালপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক সলিল কাহালি। তিনি লিখেছেন :

> জামালপুর উচ্চ বিদ্যালয় মিলনায়তন ২০১২-২০১৩ সালে পুনঃনির্মাণ করা হয় এবং মির্জা আশারাফ উদ্দিন হায়দার মিলনায়তন নামকরণ করা হয়। নির্মাণ কাজের আর্থিক দিকটি সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের কনিষ্ঠ সন্তান বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার। তার সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু শাহ মোঃ সামছুল হুদা স্বপন নির্মাণ কাজে সার্বিক তত্ত্বাবধান করেন। প্রকৌশলী মীর নজরুল ইসলাম রতন জামালপুর উচ্চ বিদ্যালয়েরই প্রাক্তন ছাত্র। তিনি নির্মাণ কাজে সকল প্রকার কারিগরি সহায়তা দিয়েছেন। এছাড়া মির্জা পরিবারের সাথে ওদের পারিবারিক সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। তাই মির্জা হোসেইন হায়দারের স্নেহভাজন রতন, মিলনায়তন নির্মাণ কাজে প্রকৌশল গত দিকটি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে লক্ষ রেখে সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছেন।
>
> জামালপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের আরেক ছাত্র শাহনেওয়াজ শাহীন একদিকে বিদ্যালয়ের প্রতি দরদি অন্যদিকে বিচারপতির স্নেহভাজন। তিনি জামালপুর জজ আদালতে চাকুরিরত। সেই সুবাদে বিচারপতির নির্দেশে নির্মাণ কাজে যোগাযোগ রক্ষা করা থেকে সকল প্রকার অর্পিত দায়িত্ব অদ্যাবধি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে নিরলসভাবে করছেন। জামালপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি মির্জা সাখাওয়াতুল আলম মনি এবং প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ও সম্পাদক মো. শাহজাহান সাহেব মিলনায়তন পুনঃনির্মাণে তাদের সহযোগিতা ও সহায়তারও কমতি ছিল না।

তাঁর নামে জামালপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মিলনায়তনের নামকরণ করা হয়েছে। তবে এই স্বীকৃতি আরও বেশি হতে পারত। আমরা মনে করি রাষ্টীয় প্রতিষ্ঠান, রাস্তা, এই এলাকায় রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভবন, হোস্টেল প্রভৃতির মধ্যে কোনো কোনো স্থাপনার নাম



তাঁর নামে করার জন্য প্রস্তাব জানাই। সমকালে ব্রিটিশ সরকার জনহিতকর কাজের জন্য তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখত। ব্রিটিশ রাজ সরকার তাঁকে তৎকালীন জামালপুর মহকুমার শেরপুর থানার জন্য প্রথম শ্রেণির অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকার জামালপুর মহকুমা ও পরে এ জেলার কিছুকাল প্রথম শ্রেণির অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করে সম্মানিত করেছিল।

এই বিষয়ে পিতা সম্পর্কে পুত্র বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার জানিয়েছেন, "আব্বা জামালপুরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, স্থাপনার সাথে সরাসরি যুক্ত থেকেছেন, আবার কোনোটিতে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন। আব্বা নিজের নামে কিছু করেননি। এছাড়া সমকালে জামালপুরের প্রশাসনে সরকারি-বেসরকারি কর্মকাণ্ডে আব্বার ডাক পড়ত। আব্বার একটা জিপ গাড়ি ছিল। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এ গাড়িতে করে আব্বা যেতেন। প্রচুর মানুষের সাথে তাঁর সম্পৃক্ততা ছিল। পারিবারিক, সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর গঠনমূলক অংশগ্রহণ ছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁরা কেউই আব্বাকে মনে রাখেননি। তাঁর নামে জামালপুরে একটা রাস্তার নামকরণও করেননি।"

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের সন্তানরা তাঁর স্মৃতি জাগরূক রাখার জন্য 'মির্জা হায়দার আমেনা মির্জা ফাউন্ডেশন' গড়ে তুলেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁরা নানাবিধ সামাজিক কাজ করছেন।

জীবনপঞ্জি

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের জীবনপঞ্জির এই তথ্যাবলি সুধীজন ও পারিবারিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়।

১৯০৫ : নিলক্ষিয়ায় জন্ম। পিতা : মির্জা আসাদ উদ্দিন হায়দার, মাতা : তৈবুন নেসা। তাঁরা ছিলেন এক ভাই ও এক বোন। শৈশবে নিজ জমিদারবাড়ির পারিবারিক

স্কুল ও মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন। তাঁর পিতৃপ্রদত্ত নাম মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার। জামালপুর-শেরপুরবাসীর নিকট তিনি মির্জা সাহেব নামে পরিচিত।

১৯১৩ : ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি।

১৯২০ : গোপনে ব্রিটিশ বিরোধী কংগ্রেসি আন্দোলনে যুক্ত হন। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা না দিয়ে গান্ধীজির ডাকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ। এ সময় খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ।

১৯২৩ : দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সান্নিধ্য লাভ। তাঁর সঙ্গে সর্বভারতের বিভিন্ন স্থানে মিটিং-মিছিলে নেতৃত্ব দেন। দেশবন্ধুর স্বরাজ দলের সাথে যুক্ত হন।

১৯৩৭ : কৃষক প্রজা পার্টির সাথে জড়িয়ে পড়েন। ঋণ সালিশি বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ।

১৯৩৯ : শেরপুর জি. কে. (গোবিন্দকুমার পিস মেমোরিয়াল) উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন।

১৯৪১ : আনন্দমোহন কলেজ থেকে আইএ পাশ করেন।

১৯৪২ : আনন্দমোহন কলেজে বিএ ক্লাসে ভর্তি হন। ভারত ছাড় আন্দোলনে অংশগ্রহণ। 'আসামের জঙ্গলে' ভ্রমণকাহিনি রচনা। তৎকালীন জামালপুর মহকুমার শেরপুর থানার প্রথম শ্রেণির অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত।

১৯৪৩ : ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে ময়মনসিংহ অঞ্চলের ফুড কমিটির সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন।

১৯৪৪ : আনন্দমোহন কলেজ থেকে বিএ পাশ। উপন্যাস 'মায়ার ভিটা' রচনা।

১৯৪৬ : মুসলিম লীগে যোগদান। মুসলিম লীগের হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর প্রগতিশীল গ্রুপের প্রভাবশালী কর্মী হিসেবে পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন।

১৯৫০ : জামালপুর শহরে আমেনা প্রেস স্থাপন ও সাপ্তাহিক 'তওফিক' পত্রিকা প্রকাশ।

১৯৫২ : ভাষা আন্দোলনে বাংলা ভাষার পক্ষে সমর্থন প্রদান করেন ও 'তওফিক' পত্রিকায় আন্দোলনের পক্ষে সংবাদ প্রকাশ।

১৯৫৩ : জামালপুর মহকুমার সাহিত্য সম্মেলনের সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন।

১৯৫৪ : যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণায় সক্রিয় ভূমিকা পালন।

১৯৫৯ : ভয়াবহ বন্যা সংঘটিত হয়। এ অঞ্চলে সব নদীর পানি বিপদসীমা অতিক্রম করে। এ বন্যায় ব্যাপক ধনসম্পদ, ফসলাদি ও বহু কাঁচা ঘরবাড়ির ব্যাপক ক্ষতি হয়। তিনি ওস্তাদ ফজলুল হককে নিয়ে গানে গানে ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করে অর্থ সংগ্রহ করে বন্যার্তদের মাঝে বিতরণ করেন।

১৯৬০ : জামালপুর পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত।

১৯৬১ : জামালপুরে প্রথম বিদ্যুৎ অনুমোদন ও প্রবর্তনের কাজ করেন।

১৯৬৩ : 'ঝিনাই' নামে একটি সাহিত্য সাময়িকী প্রকাশ।

১৯৬৬ : জামালপুর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালক নিযুক্ত।

১৯৭১ : মুক্তিযুদ্ধের সময় জামালপুরে অবস্থান করেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। এ সময় বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে থেকে প্রতিবেশী হিন্দু ও মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা প্রদান।

১৯৭৬ : দ্বিতীয়বারের মতো ২৯শে জুন জামালপুর মহকুমার প্রথম শ্রেণির অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত।

১৯৮৫ : পরিণত বয়সে ঢাকায় ১০ই জুন ইন্তেকাল করেন। জামালপুর শহরের পৌর কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

রচনা-নিদর্শন

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের অপ্রকাশিত কতিপয় হামদ-নাত তুলে ধরা হলো। এই হামদ-নাতগুলো তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি 'জেন্দা ইসলাম' থেকে লেখকের নিজের অনুসৃত হুবহু বানান রেখে পাঠোদ্ধার করে প্রকাশ করা হলো। রচনাকাল : ষাট দশক। লক্ষণীয় যে, এই হামদ-নাতগুলোয় প্রবহমান পয়ার ছন্দের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

প্রত্যেক চরণে পর্ব সংখ্যা দুইটি। পর্ব দুটির মাত্রার সংখ্যা কম বেশি ১২+১২ প্রায় নির্দিষ্ট এবং দুই চরণে অন্তমিলসহ একটি পূর্ণভাব প্রকাশ পেয়েছে। এই হামদ-নাতগুলো তিনি অত্যন্ত সুকৌশলে ও বুদ্ধি খাটিয়ে রচনা করেছেন।

দুই চরণের মধ্য থেকে প্রথম লাইনের অক্ষরগুলো নিলে 'রাব্বুল আলামিনের প্রতি', 'ঈদে মিলাদুন্নবী দিবসের প্রতি', 'শবে বরাত দিবস', 'হে খোদা কর মুনাজাত কবুল' শীর্ষক অর্থপূর্ণ ও ভাবাবেশ বাক্য হয়।

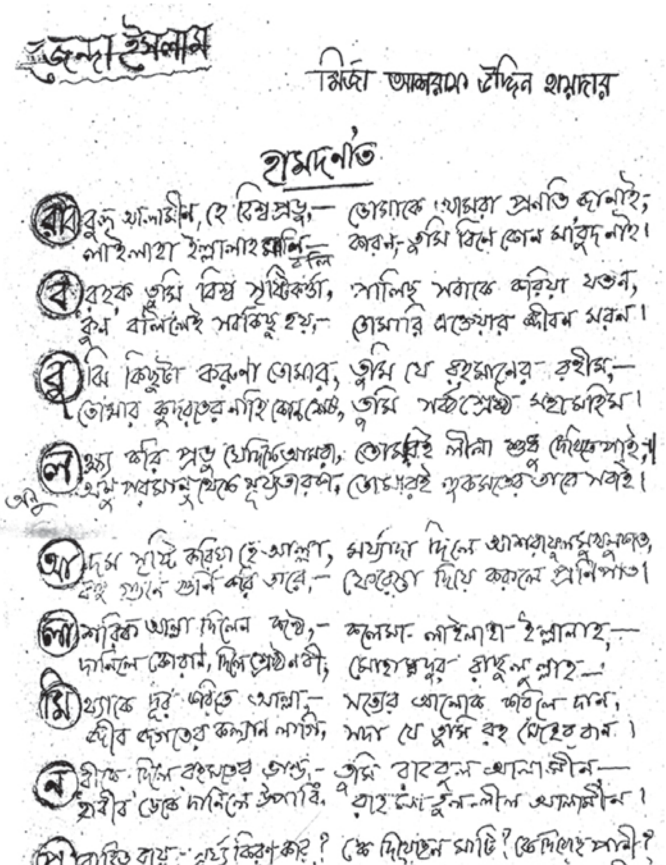
হামদ-নাত

রাববুল আলামীন, হে বিশ্বপ্রভু,–তোমাকে আমরা প্রণতি জানাই,
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলি–কারণ, তুমি বিনে কোন মাবুদ নাই।
বরহক তুমি বিশ্ব সৃষ্টিকর্তা, পালিছ সবাকে করিয়া যতন,
'কুন' বলিলেই সবকিছু হয়–তোমারি এক্তেয়ার জীবন মরণ।
বুঝি কিছুটা করুণা তোমার, তুমি যে রহমানের রহীম,–
তোমার কুদরতের নাহি কোন শেষ, তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ মহামহিম।
লক্ষ্য করি প্রভু যেদিকে আমরা, তোমারই লীলা শুধু দেখিতে পাই।
অনুপরমানু থেকে সূর্য্যতারকা, তোমারই হুকুমতের তাবে সবাই।
আদম সৃষ্টি করিয়া হে আল্লা, মর্যাদা দিলে আশরাফুল মখলুকাত,
বহু গুণে গুণী করি তারে–ফেরেস্তা দিয়ে করালে প্রণিপাত।
লা শারিক আল্লা দিলেন কণ্ঠে–কলেমা লাইলাহা ইল্লাল্লাহ,–
দানিলে কোরান, দিলে শ্রেষ্ঠ নবী, মোহাম্মদুর রাছুলুল্লাহ–
মিথ্যাকে দূর করিতে আল্লাহ,–সত্যের আলোক করিলে দান,
জীবজগতের কল্যাণ লাগি, সদা যে তুমি রহ মেহেরবান।
নবীরে দিলে রহমতের ভাণ্ড,–তুমি রাব্বুল আলামীন–
হাবীব ডেকে দানিলে উপাধি, রাহমাতুল লীল আলামীন।
প্রবাহিত বায়ু সূর্য কিরণ কার? কে দিয়েছেন মাটি? কে দিয়েছে পানী?
যেদিকে তাকাই শুধু দেখিতে পাই, তোমারই অনন্ত মেহেরবাণী।
তিনিই স্রষ্টা–বিশ্বপ্রভু তিনি, ধরায় পেতেছেন প্রেমের সংসার।
জীবজগৎ বাঁধা এক প্রেমডোরে, শুক্‌রিয়া জানাই তাই বারংবার।

টীকা

বরহক–সত্য (এয়ছাই ছুরত দিল খোদায় বরহক–সৈয়দ হামজা)।

তাবে–ইসলামের নবী-রাসুলদের প্রজন্মের অনুসারীদের ধারাবাহিক অংশ সাহাবা যুগ, তাবেয়ী যুগ, তাবে তাবেয়ীন যুগ। (সাবেঈন) তোবেঈন হয়ে চিল্লায় জোর ওই ওই নাচে দীন–কাজী নজরুল ইসলাম)।


জিন্দা ইসলাম
মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার
হামদ-নাত
রাব্বুল আলামীন, হে বিশ্বপ্রভু,— তোমাকে আমরা প্রণতি জানাই;
লাইলাহা ইল্লাল্লাহ বলি— কারণ, তুমি বিনে কোন মা'বুদ নাই।
বরহক তুমি বিশ্ব সৃষ্টিকর্তা, পালিছ সবাকে করিয়া যতন,
কুন বলিলেই সবকিছু হয়,— তোমারি এক্তেয়ার জীবন মরণ।
রহিম কিছুটা করুণা তোমার, তুমি যে রহমানের রহীম,—
তোমার কুদরতের নাহি কোন শেষ, তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ মহামহিম।
লক্ষ্য করি প্রভু যেদিকে আমরা, তোমারই লীলা শুধু দেখিতে পাই,
অণু পরমাণু থেকে সূর্য তারকা, তোমারই হুকমের তাবে সবাই।
আদম সৃষ্টি করিয়া হে আল্লা, মর্যাদা দিলে আশরাফুল মখলুকাত,
[illegible] করি তারে,— ফেরেস্তা দিয়ে করালে প্রণিপাত।
লাশরিক আল্লা দিলেন [illegible],— কলেমা লাইলাহা ইল্লাল্লাহ,—
নাজিলে কোরান, দিলে শ্রেষ্ঠ নবী, মোহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ—
মিথ্যাকে দূর করিতে আল্লা,— সত্যের আলোক করিলে দান,
জীব জগতের কল্যাণ লাগি, সদা যে তুমি রহ মেহেরবান।
নবীকে দিলে রহমতের ভাণ্ড,— তুমি রাব্বুল আলামীন—
হাবীব ডেকে দানিলে উপাধি, রাহমাতুল্লিল আলামীন।
প্রবাহিত বায়ু, সূর্য কিরণ কার? কে দিয়েছেন মাটি? কে দিলেন পানি?
যেদিকে তাকাই শুধু দেখিতে পাই, তোমারই অনন্ত মেহের বাণী।
তিনিই স্রষ্টা— বিশ্ব প্রভু তিনি, যাঁহার পেতেছেন প্রেমের সংসার;
জীব জগত তাঁরি প্রেমডোরে, শুকরিয়া জানাই তাই বারেবার।
আমীন।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের স্বহস্তে লেখা হামদ-নাত পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠার চিত্রলিপি

হে নবী লহ সালাম

ঈদে মিলাদুন্নবী দিবসে,–জানাই নবীজিকে দরুদ ও সালাম,
যাঁর কাছে হলো কোরান নাজিল, যাঁর কল্যাণে পেলাম ইসলাম।
দেলে তাঁর এত দরদ বলেই তিনি, রাহমাতুল লীল আলামীন,–
মানব কল্যাণে দেখালেন পথ সরল–সেরাতুল মুসতাকীম।
মিথ্যার বিরুদ্ধে জেহাদ করিতে, 'শহিদ' হইতে করেন আহ্বান,
জয়ী হয়ে যদি ফিরে আসি ঘরে, 'গাজী' বলে তিনি করেন সম্মান।
লাশরিক আল্লা ঘোষণার মাঝে মানুষেরই তিনি দিলেন ইজ্জত,
নারায়ে তকবীর শিখালেন তিনি, 'আল্লাহু আকবর' বলে বাড়াই হিম্মত।
দুনিয়াতে আজ অশান্তির আগুন, বিভিন্ন শিবিরে বিভক্ত শক্তি–
চলেছে ভিতরে প্রস্তুতি পর্ব্ব–দল ভারী করার চলেছে চুক্তি।
নব জাগরণে মুসলীম জাহান, হাকে 'আসসালামু আলায়কুম'–
তেলের দৌলত আল্লা দিয়াছেন, কাড়িয়া নিয়াছেন জড়তার ঘুম।
নহে আর মুসলীম আজ তুচ্ছ, তারা হৃত মর্যাদা ফিরে পেতে চায়,–
তৃতীয় বিশ্বের শান্তির দাওয়াত, শুনাতে চায় তারা এই দুনিয়ায়।
বীরত্বে যাদের কাঁপিতো মেদিনী, তারা কেন আজি এত হীন বল?
বিশ্ব সভ্যতার জনক যারা ছিল–কেন হলো তারা এতটা দুর্ব্বল?
দিয়াছেন শাস্তি রাব্বুল আলামীন, কাড়িয়া নিয়াছেন, জ্ঞানের মশাল,
ঐশ্বর্য অপচয়ে ভিখারী হয়ে ঘুরিতেছি আঁধারে হয়ে বেসামাল।
বড় হয়েছে যারা আমাদের ধনে, করে তারা কত কিছু আবিষ্কার,
আর আমরা তখন মজহাবী তর্কে, 'ছহি' ও জইফ' হাদিসের করি বিচার।
সেই 'ঘোড়া-তলোয়ার যুগের পর, আছে কি মোদের কোন অবদান?
ঘুমিয়েছে যত মুর-স্যারাসুন, মুঘল-পাঠান, যত মুসলমান।
রহম করেছেন–গফুর রহিম, দৃষ্টি দিয়াছেন তিনি করুণার–
স্বাধীন হয়েছি বাংলাদেশী মোরা, শক্তি পেয়েছি উঠে দাঁড়াবার।
প্রতিজনের আজ জাগিতে হইবে, মানুষ হইবার দিতে প্রমাণ–
বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা শির উঁচু করি–দাঁড়া মুসলমান।
তিনিই মোদেরে দিবেন মদৎ–দৃঢ় সংকল্পে বাঁধরে ঈমান–
'চোখ দেখ তুই-সম্মুখে অই',–'ভাঙ্গা কেল্লায় উড়ে বিজয় নিশান।

টীকা

মিলাদুন্নবী–নবী (স.)-এর জন্ম অনুষ্ঠান। ধীরে ধীরে এর সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত হয়ে ঈদে মিলাদুন্নবী রূপ লাভ করেছে। এর আরও একটি পরিভাষা হলো সিরাতুন্নবী (স.)।

সেরাতুল মুসতাকীম–সরল ও সহজ পথ। (আল্লাহ ও রাসুলের প্রদর্শিত সিরাতুল মুসতাকিম চলিবার আহ্বান–মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্)।

নারায়ে তকবীর–উচ্চ আওয়াজে আল্লাহর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা।

মজহাবী–ইসলাম ধর্মের মত ও পথ অবলম্বী দল।

জইফ–দুর্বল। যে হাদিসের বর্ণনাকারী কোনো হাসান হাদিসের বর্ণনাকারীর গুণসম্পন্ন নয়। (বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে/আমরা তখনো বসে, বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজেছি? ফিকাহ ও হাদিস চষে। হানাফি, শাফিঈ, মালিকী, হাম্বলীর/ তখনো মিটেনি গোল–/এমন সময় আজরাইল আসি/হাঁকিল তলপি তোল।–কাজী নজরুল ইসলাম)।

মুর-স্যারাসন–স্পেনের ইতিহাসে মুর-স্যারাসনের বিজয়।

দামামা–যুদ্ধ, আমামা–পাগড়ি, শিরস্ত্রাণ (বাজিছে দামামা, বাঁধরে আমামা/শির উঁচু করি মুসলমান–কাজী নজরুল ইসলাম)।

প্রার্থনা

শবে বরাত রজনীর প্রার্থনা,–জানাই হে রাব্বুল আলামীন,
আমরা তোমার হাবিবের উম্মত, যে নবী রাহমাতুল লীল আলামীন।

বেশুমার তব কুদরতি শক্তি,–রেজেগ দৌলত সব তব অধীন–
আজিকে তুমি বরাদ্দ করিবে, মোদের ভাগ্য–বরাতের দিন।

বড় বড় শক্তিরা জ্ঞানে বিজ্ঞানে গ্রহ গ্রহান্তরে চলেছে দিনদিন,
টাকার জোড়েই নিতে চাইছে,–দরিদ্র দেশগুলি প্রভাবাধীন।

রাজ্য রক্ষা তরে কিনিতেছি অস্ত্র, কিনি মোটর গাড়ী রেল ইঞ্জিন,
খাদ্য সাহায্য দিতেছে তারা, দিতেছে গম–দেয় সুয়াবীন।

তবু ঐ বিস্ময়কর উন্নতিতেও শান্তি আনিবে না, বিশ্বে কোন দিন,
জারজ সভ্যতা-নাস্তিক মতবাদ, এটম সংঘর্ষেই হবে বিলীন।

দিয়েছ তুমি আরব বিশ্বকে, অফুরন্ত পেট্রল কেরাসীন,
তেমন কিছু বাংলাদেশকেও, দিবে তুমি, মোদের আছে একীন।

বহু অপরাধে-অপরাধী মোরা হয়ে গেছি মোরা চরিত্রহীন–
তবু আমরা তোমারই বান্দা, তোমারই রহমত চাহি চিরদিন।

সেসব ওয়াদার কথা বলিব না–চাহি শুধু রাব্বুল আলামীন-
তোমার ক্ষমা, তোমারই করুণা–রেখো না করে মোদেরে মিসকীন ॥

টীকা

শবে বরাত–সৌভাগ্যের রাত। আরবিতে একে লাইলাতুল বরাত বলে। এ রাতে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা ইবাদতে মশগুল থাকেন।

হে খোদা কর মুনাজাত

হে খোদা কর মুনাজাত কবুল, দূর কর যত বালা মছিবত,
চরম দুর্দ্দিনে মুসলমান চাহে,–তোমার করুণা, তোমার রহমত।

খোদা তুমি দানিলে ইসলাম, তোমার প্রিয় হাবিব মারফত,
পরিপূর্ণ ধর্ম্ম–জীবন বিধি, পরিপূর্ণ করি তামাম বরকত।

দান করিলে অমূল্য কোরান, হলো হাদিস তফসীর শরিয়ত,
জ্ঞান বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করিলে, দিলে গূঢ় তত্ত্ব কথা মারফত।

করেছি না জানি কত মহাপাপ, তাই হারিয়ে ফেলেছি সব নিয়ামত,
কোথা গেল মোদের ভাই ভাই থাকা কোথা গেল সেই একতার মহব্বত?

রহিল কোথা ইসলামী নীতি, পথ ভুলাইলো শান শওকত–
বিধর্ম্মীর বিলাস অনুসারী ছেড়ে দিলু সহজ সরল, সুপথ।

মুগ্ধ হেরি যুদ্ধ বন্দী সুন্দরী নারী–সাথে বেশুমার ধন দৌলত,
চরিত্র হারায়ে হলেম আয়েসী, হারায়ে ফেলিনু শৌর্য্যের তাকত্।

না ছিল উচিত যে কাজ কভু, তাই হয়ে গেল রেওয়াজ মছিবত।
লোভে পাপ পাপে বিনাশ, আসিল তকদিরে ঘোর মছিবত।

জায়েজ করা হলো ক্ষমতা দখল,–নাম হলো করা তার ছিয়াচ্ছত,
একের পর এক খলিফা হত্যা করে, শেষ করে দিলাম খেলাফত।

তবু কারবালা হলো প্রয়োজন, ফরজন্দে রসুলের শাহাদত–
রাজা বাদশাহ হলো খলিফারা, ধর্ম্মীয় জগতে রহিল ইমামত।

বেছি কত মাজহাবে বিভক্ত, দলে উপদলে নবীর উম্মত–
শিয়া, সুন্নী, হানাফী, মালেকী, মতবাদে বিচ্ছিন্ন মুসলীম জগৎ।

বুদ্ধি বিবেচনা হারিয়ে ফেলেছি, মানি না কারো কোন নছিহত–
মসনদ চাই-চাই অঢেল সম্পদ, ঘাটাই তারি লাগি সব হিকমত।

লওহ মাফুজে লিখনাও খোদা, আমাদের নসীবের ইজ্জত,
তওবা করিয়া কহি তোমার কাছে তোমার করুণা তোমার রহমত॥

টীকা

তামাম বরকত–সমগ্র সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি। অর্থাৎ আল্লাহর বান্দার সব বিষয়ে প্রবৃদ্ধি ও সফলতা দান।
শান শওকত–গৌরব, জাঁকজমক। (‘কোথায় সে তেজ ইমান, কোথায় সে শান শওকত’–কাজী নজরুল ইসলাম)
লওহ মাহফুজ–সংরক্ষিত ফলক। ইসলামি পরিভাষায় লওহ মাহফুজ বলা হয়। ঊর্ধ্ব আকাশে সংরক্ষিত ফলক। যার মধ্যে সৃষ্টির শুরু লগ্ন থেকে কেয়ামত পর্যন্ত ঘটমান সবকিছু আল্লাতায়ালা লিখে গেছেন।

আসামের জঙ্গলে

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের ‘আসামের জঙ্গলে’ শীর্ষক ভ্রমণকাহিনি থেকে কিছু অংশ তুলে ধরা হলো। এই অংশটুক ১৯৮৯ সালে জামালপুর সমিতি, ঢাকা থেকে প্রকাশিত স্মরণিকা ‘সম্প্রীতি’তে ছাপা হয়েছিল। চয়নকৃত অংশটুকুতে লেখকের নিজস্ব বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে।

উল্লেখ্য ‘আসামের জঙ্গলে’ শীর্ষক ভ্রমণকাহিনির রচনাকাল ত্রিশ দশক। এই ভ্রমণকাহিনিতে আসামের বাংলা ভাষার কয়েকটি শব্দের প্রভাব লক্ষণীয়। ভ্রমণকাহিনির বাক্য, শব্দ চয়ন ক্লাসিক সমতুল্য।

মঙ্গলদই-এর জঙ্গলে এক রাত্রির রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা

লেখক-পরিচিতি

[লেখক জামালপুর থেকে প্রকাশিত অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক 'তওফিক' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি আজীবন অনেক জনহিতকর কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। ১৯৪২-৪৩ সালে স্থানীয় দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সাহায্যে তাঁর অসামান্য অবদান ছিল। নিলক্ষিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন, খাল খনন, গ্রামে গ্রামে মজাপুকুর সংস্কার ও মৎস্যচাষে উৎসাহদান, জমিদারদের অত্যাচারের সোচ্চার প্রতিবাদ প্রভৃতি তাঁর কর্মজীবনের সমুজ্জ্বল স্বাক্ষর। তিনি দীর্ঘদিন অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।

১৯৮৫ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। বক্ষ্যমাণ আলেখ্যটি তার অপ্রকাশিত হস্তলিপির সংক্ষেপিত অংশবিশেষ–তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফসল।]

সময়টা বৃটিশ শাসনকালের। তখন আমি কার্যব্যপদেশে আসামের মঙ্গলদই মহকুমা শহরে অবস্থান করি। একটা মোটর বাস-সার্ভিসে আমাকে প্রায়শঃই বিস্তীর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ পথ দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। একদিন বিশ মাইল দূরবর্তী ট্যাংলা রেল স্টেশন থেকে মঙ্গলদই-এ ফিরছি। ড্রাইভারের শরীরটা সেদিন ভাল ছিল না। ড্রাইভিং-এর কাজ অনেকটা আমাকেই করতে হচ্ছিল। ফিরতি বারো মাইলের পথে কালাইগাঁও বাজার। যাতায়াত কালে এখানে একটি চা-এর দোকানে চা পানি খাই। দোকানী একটা কিশোরী নেপালি। নাম হরকুমারী। বড় মায়াভরা মুখ। সব সময় যেন হাসি লেগেই থাকে। খুবই পরিচ্ছন্ন। তার মুক্তার মত দাঁতগুলিও তার নেপালী চেহারার মধ্যে খুবই আকর্ষণীয়। আমার নিত্য দিনের যাতায়াতে সে আপন জনের মতই আমার প্রতীক্ষায় থাকত। আমার আগমনে তার সুনিপুণ হাতে আমাকে আপ্যায়ন করত–বাঁশের চোঙ্গায় চা পরিবেশন করে। ভ্রমণের ক্লান্তি জুড়াতে এ চায়ের জুড়ি নেই। সেদিন ট্যাংলা যাওয়ার পথে হরকুমারী হেসে হেসে বলেছিল, 'বাবুজি আজ একটু জলদি এসো। তোমাকে হামার বাড়ীর চা খুয়াব।' আমিও সানন্দে সম্মতি জানিয়েছিলাম। আর এই আমন্ত্রণটা উপেক্ষা না করার জন্যই উৎসহ ভরে আমি নিজেই গাড়ী চালিয়ে আস্ছি।

মধ্য আসামের গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আমাদের রাস্তা। মনে হয় যেন ক্রমশঃ সরু হয়ে আকাশে উঠে গেছে। সেদিন আকাশে মেঘ ছিল। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। জঙ্গলাকীর্ণ রাস্তা ঝাপসা দেখাচ্ছে। হেডলাইট জ্বালিয়েও রাস্তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। তাই গাড়ি খুব ধীরে চালাতে হচ্ছে এমনি অবস্থায় অস্পষ্টভাবে দেখতে পাই বেশ দূরে একটা বড় শুয়োর যেন গাড়ীর আগে আগে হেঁটে যাচ্ছে। উপর্যুপরি কয়েকটা হর্ণ দিলাম। আর যায় কোথায়! যেটাকে আমি এতক্ষণ শুয়োর মনে করেছিলাম, ওটা এক ঝটকায় ফিরে মানুষের মত রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে পড়লো। মাথায় দীর্ঘ চুল। সামনের এক পা হাতের মত করে মাথায় দিয়ে থক্ থক্ শব্দে বিরাট হা করে সামনে এগুতে লাগলো। ওর মুখের সাদা দাঁত আর সাদা লোমে ঢাকা বিশাল বুক আমাদের মনে ভীষণ ত্রাসের সৃষ্টি করে দিল। হর্ণ বাজিয়ে ও গাড়ি ক্লাচ করে শব্দ করাতেও

কোন ফল হলো না। রক্তচক্ষু পিটপিটিয়ে মুখের হাটের বিকট করে লালা ছিটিয়ে সাত আট হাত দূরে থেকে জানিয়ে দিল যে সে একটা বিরাট ভল্লুক? গাড়ী জোরে চালানোর কোন উপায় নেই। গাড়ীর নতুন বাঙালি ড্রাইভার প্রায় মূর্চ্ছিত। অন্যান্য যাত্রীরাও খুব জোরে চীৎকার শুরু করে দিল। অবস্থা বেগতিক দেখে আমি ড্রাইভারকে ধাক্কা দিয়ে সজাগ করে একটা নেকডার তাড়াতাড়ি পেট্রোল ঢেলে দিতে বল্লাম। দিশাহারা ড্রাইভার একটানে ওর গায়ের জামা খুলে ওতেই পেট্রোল ঢেলে আমার হাতে দিল। আমি এটাকে দুখণ্ড করে এক খণ্ড আগুন ধরিয়ে ভল্লুকের দিকে ছুড়ে দিলাম। আকস্মিকভাবে আগুনের এক ঢেলা কাছে পড়তে দেখে ভয়ে ভল্লুকটা চার পায়ে একটু দৌড় দিয়ে রাস্তা থেকে সরে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার ফিরে আসতে চাইল। এবার আগুনের দ্বিতীয় ঢেলা নিক্ষেপ করলাম। আরেকটু এগিয়ে এলে এবারকার ঢেলা ওর শরীরেই লাগতো। এবার ভল্লুকটা সত্যি ভয় পেয়ে রাস্তা ছেড়ে নেমে গেল। আমরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। অতঃপর অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে গাড়ী চালিয়ে নির্ধারিত সময়াপেক্ষা বেশ বিলম্বে কালাইগাঁও এসে পৌঁছালাম।

আমাকে বাড়ির চা খাওয়ানোর প্রতীক্ষমাণ হর-কুমারী বিলম্বে ফেরার কারণ জিজ্ঞেস করায় পথি-মধ্যেকার ভল্লুক যুদ্ধের বিবরণ দিলাম। সেও উৎকণ্ঠা-মাখা ভাষায় বল্ল, এই ভল্লুকটাই দুদিন আগে একজন ডাকপিওনকে মেরেছে। এর মধ্যে ওর ভাই চা নিয়ে এল। আমি তাজ্জব হয়ে দেখলাম−একটা চীনা-মাটির পেয়ালা পিরিচ। ঈষৎ লজ্জা মাখা হাসিতে তরুণী বললো, 'বাবুর্জি আজই আনিয়েছি, রোজ রোজ বাঁশের চোঙ্গায় চা দিতে লজ্জা করে যে।' আমি বললাম এতে লজ্জায় কি আছে, সবাই তো বাঁশের চোঙ্গাতেই চা-পানি খায়। অথচ মনে মনে খুশী হলাম আমার জন্য এটা আলাদা ব্যবস্থা করায়। আর এই সরলা নেপালি মেয়ের মনের খানিকটা জানবার অবকাশ পেলাম। হরকুমারী নিজ হাতে চা করে সযত্নে চীনে মাটির কাপ পিরিচে পরিবেশন করল। চা পান শেষে পরিবেশনকারিণীর খুশীভরা মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হাস্যে মঙ্গলদই অভিমুখে গাড়িতে উঠলাম। তখন সন্ধ্যা ৭টা।

মাইল দেড়েক অতিক্রম করতেই গাড়ীর ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। ভল্লুকের মোকাবেলা করতে গিয়ে ইঞ্জিনের উপর খুব ধকল গেছে−ক্লাচ করে গাড়ির গতি বাড়াতে হয়েছিল? বনেট খুলে দেখলাম। কার-বুরেটের গোলমাল বলে মনে হল। এটা সারানোর জন্য রেঞ্চের দরকার। কিন্তু রেঞ্চ তো গাড়ীতে নেই। কালাইগাঁয়ের চা বাগানের মিস্ত্রীরা আমাদের রেঞ্চখানা চেয়ে নিয়েছিল ওটা ফেরৎ আনতে কারুরই মনে হয়নি। যাত্রীদের উৎসাহে গাড়ী ঠেলেও দেখা গেল। কিন্তু অনড় অবস্থা। ড্রাইভারকে রেঞ্চ আনার জন্য যেতে বল্লাম। যাত্রীরাও ভীতিগ্রস্ত ড্রাইভারের সঙ্গে গেল। টর্চটাও নিয়ে গেল।

ড্রাইভিং সিটে এসে বসি। একাকী। কয়েক মিনিটের মধ্যে জনমানবশূন্য বিরাট নিঃস্তব্ধতা আমার সাহসী মনটাকেও দুর্বল করে ফেলতে লাগলো। হঠাৎ বাম

দিকের জঙ্গলে মচমচানি শব্দের সঙ্গে কোন জন্তুর দ্রুত পলায়নের সাড়া পেলাম। আমাদের গাড়ী দক্ষিণ মুখী রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে। পূর্বদিক থেকে মনে হয়, একটা শূকর দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে ছুটে যাচ্ছিল। বেশীদূর যেতে পারেনি। একটা বাঘ ওকে ধরে ফেলেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে কানের পর্দা ছিঁড়ে যাওয়া শূকরের আর্তচীৎকারে আমি বিহ্বল হয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর আকুল কাতরানি থেমে গেল। এক ভীষণ ভয়াল নিঃস্তব্ধতায় আমার দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হলো। গা ছমছম করা সুমসাম অন্ধকারেও আমার মনে হল, হাত বিশেক দূরে বিরাট আকৃতির এক বাঘ তার সদ্য ধৃত শিকার সামনে নিয়ে রক্ত খাচ্ছে। আর আমি একান্তে নিতান্ত নিঃসহায় অবস্থায় ঘর্মাক্ত শরীরে তাই দেখছি।

এমন সময় আবার ক্রুদ্ধ বাঘের ভয়ঙ্কর গর্জনে আমি প্রমাদ গুনলাম। খুব সম্ভব অন্য একটি বাঘ আনমনে ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল। ওর আভাস পেয়েই আহারে রত বাঘটা এমন গর্জন করে উঠেছে, পাছে ওর শিকারে আরেকজনে ভাগ বসায়! ততক্ষণে নবাগত বাঘটি আমার গাড়ীর সামনেই উঠে এসেছে আর হুঙ্কার দিয়ে বনজঙ্গল কাঁপিয়ে তুলছে। ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্র গর্জন যে কী ভীষণ ভীতিপ্রদ তা এই পরিস্থিতিতে না পড়লে কারো বুঝবার উপায় নেই। সমস্ত ইন্দ্রিয় আমার অস্বাভাবিকভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠলো। চুলের ডগা থেকে শরীরের লোমসমূহ খাড়া হয়ে আমার সর্বাঙ্গ জ্বালা করতে লাগলো। আমি আমার বুকের ঢিবঢিব শব্দ নিজের কানেই শুনতে পাচ্ছি।

এই যখন আমার অবস্থা, তখন পরের বাঘটির গর্জন শুনতে পেলাম বেশ কিছু দূরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। মনে এক অনির্বচনীয় পুলকানুভূতি অনুভব করলাম। এমন সময় কয়েকটা মশাল জ্বেলে কয়েকজন লোকের সঙ্গে আমার গাড়ীর ড্রাইভার কাছে এসে গেল। সাথী মানুষের সঙ্গ যে এত মধুর, এত প্রীতিপ্রদ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তা উপলব্ধি করলাম। ড্রাইভারকে ফ্লাক্স থেকে এক গ্লাস পানি দিতে বল্লাম। পানি খেয়ে যেন ধরে প্রাণ ফিরে পেলাম।

রেঞ্চ নিয়ে ইঞ্জিন হাত দিতেই গাড়ী স্টার্ট নিল। আমরা সবেগে মঙ্গলদই অভিমুখে ছুটলাম। তখন জ্যোৎস্নাও মাথার উপর এসেছে। পথ চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মঙ্গলদই পৌঁছলাম। ভল্লুকের ভয় ও পরিশ্রমে ড্রাইভারের জ্বর এসে গেছে। আর দেড় মাইলের মধ্যেই আমাদের আস্তানা। ওকে ওর বাসায় রেখে আমি একাই গাড়ী নিয়ে চল্লাম। দ্রুত গতিতে ড্রাইভ করছি। সামনে ছোট্ট একটি কালভার্ট। এর কাছেই একটা চিতা বাঘ রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশে যেতে প্রায় চাকার নিচেই পড়ে যাচ্ছিল। গুরুৎ করে ওঠে অসম্ভব দ্রুত গতিতে বের হয়ে গেল। আমিও পুলটা পার হয়ে আমাদের আস্তানায় এসে গাড়ী থামালাম। তখন রাত দশটার বেশী।

আমার গাড়ীর শব্দ শুনে মহীন্দর কুকায়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এতো দেরী কই হলো? হামার তো বুখার। পানি তো আনতে পায় নাই।' লোকটি খুব ভাল। রোজ সে

আমার খাবার যোগাড় করে দেয়, পানি আনে। ওর একটি মেয়ে আছে, আমার ফাইফরমাস খাটে, কোন কোন দিন ২/১ টাকা বখশিশ দিই। আজ ওর মেয়েটিও আসে নি। পানি তো আনতেই হবে, বিশেষ করে প্রকৃতির কাজের প্রয়োজনে।

কাছেই নদী। নিঃস্তব্ধ রাতে তেরো চৌদ্দ হাত নীচে নদীর ঘাটে নেমে যেতে সেদিন কেন জানি গা ছমছম করে উঠলো। আগেও তো রাতের বেলায় নদীর ঘাটে গেছি, কই না তো কখনো এমন গা ছমছম করেনি। কপালে হাত দিয়ে মহীন্দরের জ্বর অনুভব করলাম। এই সামান্য সহৃদয়তায়ই ওরা খুশী হয়। জ্বর নিয়েই সে নদীর ঘাটে যেতে চাইলো। আমি বারণ করলাম। তবুও সে আমার সাথে কয়েক কদম এসে বললো, 'বাবুজি হামার মাথা ঘুরছে, হামি এখাটায় বসি, হাপনি যাইবেন আর আইবেন।' বড় টর্চটা হাতে নিয়ে না জ্বালিয়েই একটা বালতি সহ এক রকম দম বন্ধ করেই দ্রুত নেমে গেলাম।

আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডলে প্রশ্নবোধক তারা কয়টি আমার সম্মুখেই জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। পানির কাছে পৌঁছেছি। হঠাৎ পূর্বদিক থেকে চপ চপ একটা শব্দ কানে এলো। মনে হলো বিশ-পঁচিশ হাত দূরে কোন জন্তু পানি খাচ্ছে। আমার অজ্ঞাতেই হাতের টর্চটি জ্বলে ওঠে। ফোকাস করা অঞ্চলটা আলোতে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠলো। আর আমি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম ওই অঞ্চলটাই শুধু বাঘময় হয়ে গেছে। দেখলাম বিশ-পঁচিশ নয়, তেরো চৌদ্দ হাত দূরে একটা বাঘিনী পানি খাচ্ছে। আর দুটো বাচ্চা বাঘ চেয়ে আছে। বাঘিনী ওর মুখের হা টার মধ্য থেকে জিহ্বা বের করে দুদিকের গালের মাড়ি চেটে নিয়ে স্থির দৃষ্টিতে আলোর দিকে চেয়ে রইলো। এদিকে টর্চের ফোকাসস্থল মহীন্দরেরও চোখে পড়েছে।

সে সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে উঠলো, 'ভাগেন, ভাগেন।' বোধ করি বাঘিনীর কানে মানুষের গলার আওয়াজের ধাক্কা লেগে তার টর্চের আলোতে পড়া বিহ্বলতা ছুটে গেল। ক্রুদ্ধ বাঘিনী লেজ নেড়ে নেড়ে গুর গুর শব্দ করতে লাগলো। আমি টর্চের ফোকাস ঠিক রাখার জন্য ঝপ করে বসে পড়ে বালতির উল্টা পিঠে টর্চ ফিট করছি আর অপলক দৃষ্টিতে মৃত্যুর এ ভয়াল হিংস্র রূপ থেকে চোখ ফিরাতে পারছি না। একবার মনে হল, আমার কি বাঘা আন্ধি লেগে গেল। আবার ভাগেন, ভাগেন ধ্বনির রেশ যেন কত দূর থেকে ভেসে আসছে, শুনতে পাচ্ছি। বালতির ছায়ার আড়ালটুকুই আমার সম্বল। বাচ্চা দুটো আলোর দিকে এগুতে লাগলো। ক্রুদ্ধা বাঘিনী কান বোচা করে লেজ দিয়ে মাটির উপর পটাপট দুই-দিনটি বাড়ি দিল।

আমি বুঝলাম, এখনই সে লাফ দিবে। তবে আলো ঝলকানিতে ও শত্রুর দূরত্ব এবং চেহারা ঠিক করতে পারছিল না। আমি পিছনে হামাগুড়ি দিয়ে দ্রুত সরে যাচ্ছিলাম। বালতি থেকে চার-পাঁচ হাত দূরে যেতেই হঠাৎ আমার পায়ে লেগে একটা ঢেলা গড়িয়ে বালতির উপরেই পড়লো।

আমি বিদ্যুৎ বেগে লাফিয়ে গিয়ে এক হেঁচকা টানে মহীন্দরকে বগলদাবা করেই মোটরের ভিতরে উঠেছি। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ফাটা গর্জনে বাঘিনী ঐ বালতি ও টর্চের উপর লাফিয়ে পড়লো। ওর ক্রুদ্ধ দন্তাঘাতে বালতিটা পর্যন্ত ফুটো এবং টর্চটা দুমড়ে ভেঙ্গে গিয়েছিল। আমি মোটরে উঠেও স্থির ছিলাম না। মহীন্দর ঘাবড়ে বমি করতে থাকে। বমি করার শব্দে হিংস্র বাঘিনী এখানেও হামলা করতে পারে। তাই ভেবে আমার গায়ের জামা খুলে পেট্রোলে ভিজিয়ে সিগারেট লাইটার হাতে ঘটনাস্থলের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি।

বালতি ও টর্চের উপর নিষ্ফল আক্রমণ চালিয়ে মহীন্দরের ফেলে আসা গায়ের জামাটার উপর লাফিয়ে পড়ে বাঘিনী গর্জন করে উঠলো–আমার মনে হল, মোটরের দরজার সামনে এসে গর্জন করছে, আর এখনই প্রতিহিংসাপরায়ণা ক্রুদ্ধা বাঘিনী গাড়ীতেই আমাদের আক্রমণ করবে। আমরা আর্তচীৎকার শুরু করলাম। মানুষের উপর বাঘের আক্রমণের গর্জন মনে করে মহীন্দরের মেয়েসহ আশেপাশের বাড়ীর ৪/৫ জন লোক মশাল জ্বালিয়ে টিন বাজিয়ে আমাদের নিকট চলে এল। অনেকগুলো মশাল থাকায় স্থানটি বেশ আলোকিত হয়েছিল। ততক্ষণে বাঘটা তার আক্রমণ স্থলে পদচিহ্ন রেখে পশ্চাদপসরণ করেছে।

মহীন্দর মেয়েকে বললো, বাবুজী যদি ভাগনের সময় তাকে জাপটে ধরে না নিয়ে শুধু নিজের জান নিয়ে ভাগতো, তবে তার বাপকে আর দেখতে হতো না। আর মহীন্দরও যদি টর্চের আলোতে বাঘ দেখেই ভাগেন ভাগেন বলে চীৎকার না দিতো তবে আমি হয়ত সম্ভবত ফিরে পেতাম না। যে 'বাঘা আন্ধি' আমার লেগেছিল, তা আমার চোখের সামনে শুধু বাঘ আর ভাগই দেখছিল।

[এখানেই কাহিনী শেখ হয়নি। সে রাতেই নিকটবর্তী চা বাগানের শ্বেতাঙ্গিনী অধিকর্তীর অনুরোধে তাঁর একটি হারিয়ে যাওয়া ঘোড়ার ব্যাপারে ১২ মাইল দূরে উধালগিরি থানায় খবর দেয়ার গন্ডার-সঙ্কুল নিষিদ্ধ-এলাকা পেরিয়ে, পথিমধ্যে বিরাটকায় সাপ এড়িয়ে, হরিণ যুথের সৌন্দর্য উপভোগ করে, হলুদ শরীর ও কালো ডোরা বিশিষ্ট রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সামনে কোলাহল বৈপরীত্যময় চরিত্রের অধিকারী নাদুস নুদুস ছোট বাবুর নাচাল অবস্থার মধ্যে হেড লাইটের আলো জ্বালিয়ে পরিত্রাণ পাওয়া প্রভৃতির বিষয়ের অপূর্ব বর্ণনা সমৃদ্ধ পুরো আলেখ্যটি স্বল্প পরিসরে স্মরণিকায় প্রকাশ করা সম্ভব হল না।–সম্পাদক]

টীকা

কার্যব্যপদেশে–কাজের উদ্দেশ্যে।

মঙ্গলদই–ভারতের আসাম রাজ্যের ছোট শহর। বর্তমানে দারাং জেলার অন্তর্গত। মঙ্গলদই শহরটি আসামের রাজধানী গুয়াহাটি থেকে প্রায় ৭০ কি.মি. পূর্বে অবস্থিত।

উধালগিরি থানা–আসাম রাজ্যের উধালগিরি জেলার উধালগিরি সদর থানা।

পাঠ-পরিচিত

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের 'আসামের জঙ্গলে' ভ্রমণকাহিনি থেকে অংশবিশেষ। যুবক বয়সে তিনি প্রাপ্ত জমিদারি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করলেও এ নিয়ে আত্মীয়দের মধ্যে জমিদারির বিষয়-আশয় সম্বন্ধে মনোমালিন্য হয়। তিনি নিজেকে অন্যের বোঝা করতে চাইলেন না–এ কারণেই নিজে নিজে উপার্জনের চেষ্টায় আসামে গিয়েছিলেন। তারই স্মৃতিচারণমূলক রচনা এটি।

আসামের বনজঙ্গল-পাহাড়-নদী-গাছপালা-হিংস্র পশুর ভয়াবহতা সর্বোপরি সেখানকার বাসিন্দারা তাঁকে দিয়েছিল অপার আনন্দ। আসামের এক বাঙালি পরিবারে তিনি আতিথ্য গ্রহণ করেন। তাদের পারিবারিক জীবন ও কথাবার্তার এক অপূর্ব শৈল্পিক বর্ণনা আছে এ রচনায়।

অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় ও সিনেম্যাটিক ঢঙে উপস্থাপিত কাহিনিটির অংশবিশেষ নিঃসন্দেহে আনন্দদায়ক ও কৌতূহলোদ্দীপক। এ ভ্রমণকাহিনির গদ্য ভাষা ক্ল্যাসিক সমতুল্য।

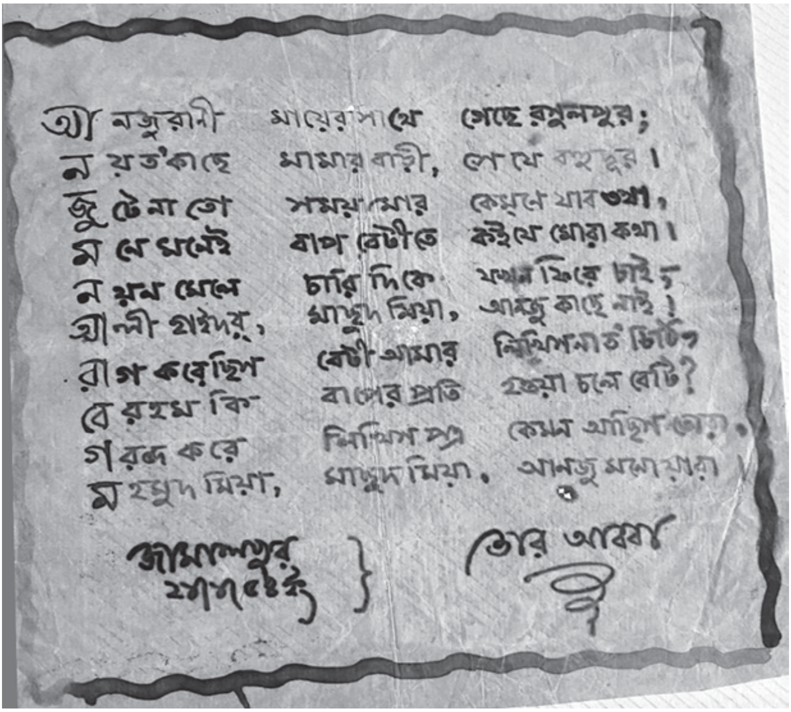
কবিতা

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার তাঁর তিন সন্তানকে নিয়ে অপূর্ব একটি কবিতা রচনা করেছেন। চয়নকৃত এ কবিতাটিতে লেখকের নিজস্ব বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। কবিতাটি নিম্নরূপ–

আনজুরাণী মায়ের সাথে গেছে রসুলপুর;
নয়ত কাছে মামার বাড়ী সে যে বহুদূর।
জুটে না তো সময় মোর কেমনে যাব তথা,
মনে মনেই বাপ বেটীতে কই যে মোরা কথা।
নয়ন মেলে চারদিকে যখন ফিরে চাই,
আলী হায়দর মাছুদ মিয়া আনজু কাছে নাই।
রাগ করেছিস বেটী আমার লিখিস না ত চিঠি?
বে রহম কি বাপের প্রতি হওয়া চলে বেটী?
গরজ করে লিখিসপত্র কেমন আছিস তোরা,
মাহমুদ মিয়া, মাছুদ মিয়া, আনজু মনোয়ারা

জামালপুর
২১/১/৫৪ ইং

তোর আব্বা


আনজুরানী মায়ের সাথে গেছে রসুলপুর;
নয়ত কাছে মামার বাড়ী, সে যে বহু দূর।
জুটে না তো সময় মোর কেমনে যাব তথা,
মনে মনেই বাপ বেটীতে কইযে মোরা কথা।
নয়ন মেলে চারি দিকে যখন ফিরে চাই,
খালী হাইদর, মাছুদ মিয়া, আনজু কাছে নাই!
রাগ করেছিল বেটী আমার লিখিলনাক চিঠি,
বেরহম কি বাপের প্রতি হওয়া চলে বেটি?
গরজ করে লিখিল পত্র কেমন আছিল তারা।
মহমুদ মিয়া, মাছুদ মিয়া, আনজু মনোয়ারা।
জামালপুর ২৮।৩।৫৪ইং
তোর আব্বা

তিন সন্তানকে নিয়ে স্বহস্তে লেখা মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের একটি কবিতার চিত্রলিপি

টীকা

এই কবিতায় প্রতি লাইনে পাঁচ মাত্রার দুটি পর্ব এবং সাত মাত্রার একটি অতিপর্ব রয়েছে। কবিতাটির কাঠামো বিন্যাস কমবেশি ৫+৫+৭ মাত্রার।

আনজুরানী–মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের জ্যেষ্ঠ সন্তান। পুরো নাম আনজুমান আরা বেগম। প্রখ্যাত ডাক্তার ফখরুজ্জামানের সঙ্গে বিবাহের পর তিনি আনজুমান আরা জামান নামে পরিচিত।

রসুলপুর–রংপুরের পীরগঞ্জের রসুলপুর গ্রাম। এ অঞ্চলের জমিদার মনোয়ার হোসেন খান চৌধুরীর কন্যা আমেনা খাতুনের সঙ্গে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

মাহমুদ মিয়া ও মাছুদ মিয়া–মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের দুই পুত্রের ডাক নাম। তাঁদের পুরো নাম মির্জা আলী হায়দার ও মির্জা হোসেইন হায়দার।

আনজু মনোয়ারা–মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের জ্যেষ্ঠ সন্তান। পুরো নাম আনজুমান আরা বেগম। এখানে কবিতার ছন্দের জন্য নামের পাঠান্তর হয়েছে।

চিঠিপত্র

একজন লেখক বা ব্যক্তিকে সবচেয়ে অন্তরঙ্গভাবে ও ঘনিষ্ঠরূপে পাওয়া যায় তাঁর চিঠিপত্রে। চিঠিপত্রও এক ধরনের সাহিত্য। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের সঙ্গে অনেকের পত্রালাপ হয়েছে। সেসব আজ দুর্লভ। নিম্নে চয়নকৃত পত্রটিতে লেখকের নিজস্ব বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে।

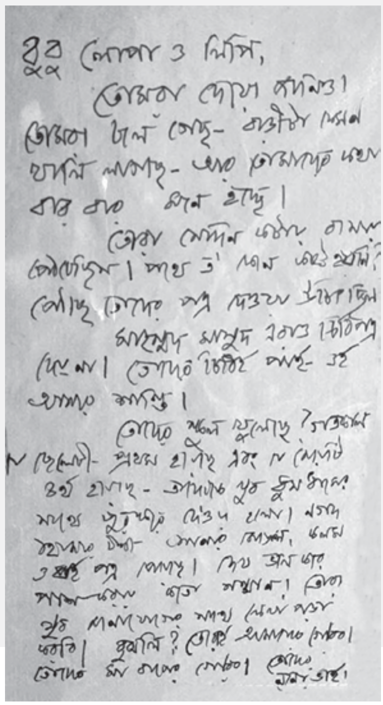
বুবু লোপা ও লিপি,*

তোমরা দোয়া জানিও, তোমরা চলে গেছ বাড়িটা কেমন খালি লাগছে-আর তোমাদের কথা বার বার মনে হচ্ছে।

তোরা সেদিন কটায় বাসায় পৌঁছেছিস। পথে তো কোন কষ্ট হয়নি? পৌঁছে তোদের পত্র দেওয়া উচিত ছিল। মাহমুদ মাসুদ** এরাও চিঠিপত্র দেয় না। তোদের চিঠিই পাই ওই আমার শান্তি।

তোদের স্কুল খুলেছে? গতকাল যে ছেলেটি প্রথম হয়েছে এবং যে মেয়েটি ৪র্থ হয়েছে তাদেরকে খুব ধূমধামের সাথে পুরস্কার দেওয়া হলো। নগত এক হাজার টাকা সোনার ম্যাডেল, কলম ও বইপত্র পেয়েছে। দেখ্ ভালো করে পাশ করায় কত সম্মান। তোরা খুব মনোযোগের সাথে লেখাপড়া করবি। বুঝলি? তোরাই আমাদের গৌরব। তোদের মা বাপের গৌরব।

তোদের
নানা ভাই



পৌত্রী লোপা ও লিপিকে লেখা মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের চিঠির চিত্রলিপি

টীকা

* এই পত্রটির রচনাকাল সত্তর দশক। লোপা ও লিপি হলেন মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের জ্যেষ্ঠ সন্তান আনজুমান আরার দুই কন্যা।

** মাহমুদ ও মাসুদ হলেন মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের দুই পুত্রের ডাকনাম। তাদের পুরো নাম মির্জা আলী হায়দার ও মির্জা হোসেইন হায়দার।

শেষ জীবন ও মৃত্যু

শেষ জীবনে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ঢাকায় তাঁর পুত্র-কন্যার বাসায় বসবাস করতে থাকেন। জীবনসায়াহ্নেও তিনি এলাকার মানুষের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিয়ে বিভোর ছিলেন। শেষ জীবনে ছেলেমেয়েরা তাঁর সাগ্রহ আন্তরিক যত্ন নিয়েছেন।

বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী, দেশের খবর-এলাকার খবর নিয়মিত ঢাকায় থাকলেও রেখেছেন। প্রতিদিন নিয়ম করে নিয়মিত পত্রিকা পড়তেন। ঢাকায় শেষ জীবনে ছেলেমেয়ের বন্ধনে পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতেন।

এরপর ঢাকায় ১৯৮৫ সালের ১০ই জুন প্রায় ৮০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তৎকালীন জামালপুরের নিলক্ষিয়ার আলো-বাতাসে বেড়ে ওঠা মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারকে জামালপুর পৌর কবরস্থানে দাফন করা হয়। তাঁর জানাজার নামাজে সর্বসাধারণসহ বিশিষ্টজনেরা অংশগ্রহণ করেন।

বংশ নয়, আভিজাত্য নয়–ভালো কর্মেই নির্ণীত হয় মানুষের জীবনের মূল্যায়ন। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামী পুরুষ। তিনি ছিলেন একাধারে রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক।

জামালপুরের বকশীগঞ্জে তাঁর জন্ম। স্কুলজীবনেই তিনি সক্রিয়ভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িত হন। তিনি ইন্তেকাল করেছেন। জামালপুরের ইতিহাসে বহুকাল তাঁর স্থান দীপ্যমান থাকবে এবং আলোচিত হবেন অনাগত ভবিষ্যতে।

তথ্যসূত্র

১. বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা : জামালপুর : শামসুজ্জামান খান (প্রধান সম্পাদক) প্রথম প্রকাশ : ২০১৩, বাংলা একাডেমি, পৃ. ২৮
২. জামালপুরের গণ-ইতিবৃত্ত : গোলাম মোহাম্মদ (প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৪), আমেনা প্রেস, জামালপুর, পৃ. ২১৮-২১৯
৩. জামালপুরের গণ-ইতিবৃত্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১
৪. বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা : জামালপুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

৫. ময়মনসিংহের চরিতাভিধান : দরজি আবদুল ওয়াহাব (প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯), ময়মনসিংহ, পৃ. ১৩৭
৬. ময়মনসিংহের চরিতাভিধান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭
৭. বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা : জামালপুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫
৮. বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা : জামালপুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২
৯. ময়মনসিংহের চরিতাবিধান, প্রাগুক্ত, ১৩৭
১০. বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা জামালপুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫
১১. জামালপুরের গণ-ইতিবৃত্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-১৯
১২. জামালপুর জেলার রজতজয়ন্তী স্মরণিকা : জামালপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় (প্রথম প্রকাশ : ২০০৪), পৃ. ৪৬
১৩. অপারেশন বাহাদুরাবাদ ঘাট : লে. কর্নেল এ আই এম নুরুন্নবী খান, বীর বিক্রম (বরখাস্ত), কলম্বিয়া প্রকাশনী, ঢাকা পৃ. ৬৫
১৪. ময়মনসিংহের চরিতাভিধান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭
১৫. জামালপুর জেলার রজতজয়ন্তী স্মরণিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
১৬. জামালপুর জেলার রজতজয়ন্তী স্মরণিকা, প্রাগুক্ত পৃ. ৪৬
১৭. বকশীগঞ্জের ইতিকথা ও লোকসংস্কৃতি : জলিল খান (প্রথম প্রকাশ ২০০৪), মালীচর (নয়াপাড়া), বকশীগঞ্জ, জামালপুর, পৃ. ৪১ ও জামালপুর জেলার ইতিহাস : রজব বকশী (প্রথম প্রকাশ ২০১২) গতিধারা, ঢাকা, পৃ. ২৮০
১৮. বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা : জামালপুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫
১৯. উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত তথ্যাবলি ছাড়াও ২০২২ সালের ২৮শে এপ্রিল ও ২৮শে মে অনলাইন পোর্টাল নিউজ ল ইয়ার্স ক্লাব বাংলাদেশ.কম আর্টিকেলে প্রকাশিত ‘অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট পদের পরিচয় ও একজন মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার’ এবং ‘অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য ক্ষেত্রে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের কৃতিত্বের মূল্যায়ন’ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

মূল্যায়ন

সহকর্মী, বন্ধু, সংস্কৃতিসেবী, সুধীসমাজের সঙ্গে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের মধুর সম্পর্ক ছিল। তিনি একাধারে স্বাধীনতা সংগ্রামী, কবি, সাংবাদিক, লেখক ছিলেন। একজন সুদর্শন, স্মার্ট সামাজিক ও বন্ধুবৎসল হিসেবে তিনি ছিলেন অনন্য। শৈশব থেকেই তিনি খেলার সাথি, বন্ধুদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতেন এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। তাঁর হৃদয় ছিল নরম ও কোমল উর্বর ভূমি। তিনি বন্ধুর মতো ছোট-বড় সকলের সঙ্গে মিশতে খুব পছন্দ করতেন। তিনি আলোকিত মানুষ গড়ার লক্ষ্যে নানা কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন। এর মধ্যে সংস্কৃতি ও শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য তিনি কাজ করেছেন। নৈর্ব্যক্তিক অবস্থানের কারণে সমকালে তার বিপুল গ্রহণযোগ্যতা ছিল। বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত, 'জেলা সাহিত্যমেলা ২০২২' (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থসহ অনেক গ্রন্থে তার মূল্যায়ন তুলে ধরা হয়েছে সাহিত্য, সংস্কৃতির ইত্যাদির প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ। নিম্নে নিজ সন্তানের শৈশবের বন্ধু সন্তানসম একজন প্রবীণ ব্যক্তি জনাব সলিল কাহালির মূল্যায়ন দেওয়া হলো। এই পঁচাশি-ঊর্ধ্ব ব্যক্তি জামালপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক। তিনি জামালপুরের বহু ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী, সাক্ষী ছিলেন বহু ঐতিহাসিক মুহূর্তের। তিনি মির্জা সাহেব সম্পর্কে লিখিত অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন :

> আমার সাথে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার চাচার পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা নদীর ঘাটে যা স্কুলঘাট নামে পরিচিত। তার বাড়ি মির্জা হাউজের সামনে দিয়ে বড় রাস্তা পার হলেই সামান্য একটু দূরেই বহমান ব্রহ্মপুত্র নদ সেখানে প্রত্যেক দিন সাঁতার শিখতে যেতাম। কিন্তু শেখা আর হয় না। ডুবের পর ডুব দিয়েই সময় কাটাতাম। সেই সময় দেখতাম সুন্দর চেহারার বিশিষ্ট এক ভদ্রলোক তার মেয়েকে নিয়ে সাঁতার শিখাতে আসতেন। চোখাচোখি হতো কিন্তু কোনো কথা হয়নি কয়েক দিন। এক দিন তিনি বলেন সাঁতার শিখবি তো আমার কাছে আয়। আমি তার কাছে গেলাম। আমার সাঁতার শেখার পাঠ শুরু হলো। এক হাতে তার মেয়ে আঞ্জুমান আরা বেগমকে আর এক হাতে আমাকে নিয়ে সাঁতার শেখাতে শুরু করেন। এক হাতে আঞ্জুমান আরা বেগম আর অন্য হাতে আমি। সেই সুবাধে আমাদের মধ্যে ভাই-বোনের সম্পর্ক গড়ে উঠল। মির্জা চাচার তিন সন্তানের মধ্যে আঞ্জুমান আরা বেগমই তিন ভাই-বোনের মধ্যে বড়। আঞ্জুমান আর বেগম সাঁতার, নাচে, গানে এবং লেখাপড়ায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জামালপুরের প্রথম মুসলিম নারী এমএ ডিগ্রিধারী। তিনি বাচ্চাদের অন্য দুটি ছড়ায় বই প্রকাশ করেন। তার স্বামী তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের প্রখ্যাত দন্ত চিকিৎসক ফকরুজ্জামান যাকে আমরা জোনা ভাই বলে ডাকতাম। তিনি ১৯৫৫ সালে পাঞ্জাব থেকে বিডিএস ডিগ্রি লাভ করেন। পরে তিনি ঢাকায় প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন। তৎকালীন ২৬ জিন্নাহ এভিনিউ, পরে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে তার চেম্বার ছিল।
>
> মির্জা চাচা যুবকদের জন্য ১৯৬২ সালে জামালপুর থেকে 'দি জামালপুর কমার্শিয়াল ট্রেনিং কলেজ' নামে একটি টাইপরাইটিং, শর্টহ্যান্ড ও টেলিগ্রাফি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সেখান থেকে পাশ করা ছাত্রছাত্রীরা পরবর্তী সময়ে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ

পেত। এতে যুবকদের জন্য একটি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। অন্যদিকে ছাত্র বেতন দিয়ে মির্জা চাচার কিছু অর্থ আয় এবং শিক্ষক বেতনের সংকুলান হতো। এই কলেজের অধ্যক্ষ বাবু নিখিল চন্দ্র দাম শেষ বয়সে অসুস্থ অবস্থায় ঢাকায় চিকিৎসাধীন ছিলেন। উল্লেখ্য, মির্জা চাচার বাড়ির সম্মুখে ডান দিকে এ কলেজ স্থাপিত হওয়ার পূর্বে এ জায়গায় আমেনা প্রেস ছিল। সেই ছাপাখানা থেকে জামালপুরের গণ-মানুষের কথা তুলে ধরার জন্য 'তওফিক' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেন। ঐ পত্রিকায় একটি কলাম ছিল তাতে পাঠক প্রশ্ন করতেন এবং সম্পাদক উত্তর দিতেন। আমি এই কলামটি পছন্দ করতাম।

ডনো সাহেব নামে এক ইংরেজ ভদ্রলোক জামালপুর মহকুমায় এসডিও থাকাকালে এ মহকুমায় শিক্ষার হার অত্যন্ত কম দেখে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ১৮৮১ সালে জামালপুর সরকারি ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয় নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। অনেকেই তখন এই বিদ্যালয়টিকে ডনো সাহেবের স্কুল বলতো। প্রয়াত এই বিদেশি মহাপ্রাণ ব্যক্তির আত্মার প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা। এই স্কুলের দুটি ছাত্রাবাস ছিল। একটি হিন্দু ছাত্রদের জন্য, আরেকটি মুসলমান ছাত্রদের জন্য। দেশ বিভাগের পর হিন্দু ছাত্রদের সংখ্যা কমতে থাকে। দেশ বিভাগের সময় দাঙ্গা (রায়ট) হওয়ায় হিন্দুরা ভারতের চলে যাওয়ার পরে হিন্দু বোর্ডিং ছাত্রশূন্য হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে সেই ছাত্রাবাসে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার সাহেব চেষ্টা করে প্রিপারেটরি মডেল প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ঐখানে তার দুই ছেলে মির্জা আলী হায়দার, মির্জা হোসেইন হায়দার (পরবর্তীকালে বিচারপতি)কেও ভর্তি করেন। উল্লেখ্য, মির্জা চাচার প্রথম পুত্র ডা. মির্জা আলী হায়দার তার ভগ্নিপতি ডা. এফ জামানের অনুসারী ছিলেন। তিনি ঢাকায় একজন প্রতিষ্ঠিত দন্ত চিকিৎসক ছিলেন। ছাত্রজীবন থেকে তিনি স্কাউটিং করতেন ও পরবর্তীকালে তিনি স্কাউটের জাতীয় কমিশনার হয়েছিলেন। তিনি ঢাকায় ইউনিভার্সিটি ডেন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠাতা। আমিও আমার ছোট শ্যালক ইন্দ্রজিৎকে সেই মডেল স্কুলে ভর্তি করাই (পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে উচ্চ পদে চাকুরি করে অবসর নিয়েছেন)। সেই প্রাইমারি স্কুলটি আজ জামালপুর উচ্চ বিদ্যালয় হিসেবে বিরাট অট্টালিকার মতো গড়ে উঠেছে, কলেজ রোডের পার্শ্বে জামালপুর উচ্চ বিদ্যালয়। এ বিদ্যালয়ের ১৯৬৭-৬৮ বার্ষিকী 'ইতিকথা' নামে প্রথম প্রধান শিক্ষক নিজামুদ্দিন আহমেদ সাহেবের লেখা থেকে জানা যায়, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় মরহুম মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার সাহেবের ভূমিকা স্মরণীয়।

মির্জা চাচার এই স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের কথা ক্রমেই লোকপরম্পরায় ছড়িয়ে পড়লে জামালপুরের বিশিষ্ট লোকজন সাহায্য, সহানুভূতি ও সমর্থনে এগিয়ে এলেন। প্রাথমিক ব্যয় নির্বাহের জন্য তদানীন্তন এসডিও নুরুল ইসলাম সাহেব গড়ে তুলতেন জামালপুর শিক্ষা তহবিল। সহকর্মী হিসেবে পেলেন ম্যাজিস্ট্রেট মির্জা মোসলেম উদ্দিন আহম্মদ সাহেব, মহকুমা শিক্ষা অফিসার খন্দকার মোঃ মোকাদ্দেস আলী সাহেব, মহকুমা খাদ্য নিয়ামক আবু আহম্মেদ মাহমুদ তরফদার, মহকুমা আনসার অ্যাডজুটেন্ট শরিফুল হক সাহেব প্রমুখ। এ কাজে আরো যাদের ভূমিকা রয়েছে তাদের মধ্যে স্থানীয় দরদি বন্ধু হিসেবে সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন ক্যাপ্টেন শাহ আব্দুর রহিম চৌধুরী (সুরুয চৌধুরী),

ওয়াজেদ আলী চৌধুরী (চাঁন চৌধুরী), মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার, জনাব আব্দুল হামিদ মোক্তার প্রমুখ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, সে সময় এসডিও ছিলেন নুরুল ইসলাম সামস সিএসপি, তদানীন্তন এসডিও এবিএম গোলাম মোস্তফা প্রমুখ। তাদেরই উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টায় জামালপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় জামালপুর উচ্চ বিদ্যালয়।

উল্লেখ্য, বিদ্যালয়টির সামনের মাঠটি তদানীন্তন এসডিও জনাব এবিএম গোলাম মোস্তফার নামে মোস্তফা পার্ক নামকরণ করা হয়। জামালপুর উচ্চ বিদ্যালয় আজ যেটা জামালপুরে বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের মধ্যে অন্যতম তার প্রতিষ্ঠালগ্নে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার সাহেবের একটা বড় ভূমিকা সব সময় স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অট্টালিকাসম বিদ্যালয়টির একটি অডিটোরিয়াম (মিলনায়তন) ছিল। স্কুলে নানাবিধ অনুষ্ঠান হতো। প্রযুক্তিগত ক্রটির কারণে এই মিলনায়তনের ছাদটি নষ্ট হয়ে যায়। ফলে কংক্রিটের টুকরো খুলে পড়ে মাঝে মাঝে ছাত্র-শিক্ষক আহত হতেন। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার সাহেবের পরিবারের পক্ষ থেকে মির্জা চাচার ছোট ছেলে বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার এই মিলনায়তন পুনর্নির্মাণ করেন। তিনি এই স্কুলে প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত গরিব, দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মাঝে স্কুলড্রেস, জুতা, খাতা, কলম, পেনসিল, স্কেল ও বেতন খরচ বহন করে বৃত্তি প্রদান করে আসছেন। প্রতি বছর এই অনুষ্ঠানে প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক হিসেবে আমিও উপস্থিত হয়েছি।

জামালপুর মিউনিসিপালিটি থেকে বাতিওলা গেন্দা মিয়া নামের একজন সুন্দর চেহারার লোক একটা কেরোসিনের টিন, একটা ফানেল ও একটা মই হাতে বেরিয়ে প্রথমে মিউনিসিপালিটির মোড়ে ল্যাম্পপোস্ট থেকে চিমনিসহ বাতি নামিয়ে তেলাধারে ফানেল দিয়ে তেল ভরে চিমনি মুছে। মই হাতে চলে আসতো আমাদের বাসার কাছে কাচারী মসজিদের সামনে (বর্তমানে আমলা পাড়া জামে মসজিদ) সেখানে ল্যাম্পপোস্টে। সেখানেও তেলাধারে তেল ভরে চিমনি মুছে ছুটে চলত এসডিও সাহেবের বাড়ি। তারপর পুরানা গুদারা ঘাট, সেখান থেকে ফৌজদারী মোড়, তারপর একদম শাহজামাল সাহেবের দরগার সামনে, সেখানেও ল্যাম্পপোস্টে বাতি জ্বালিয়ে চলে আসতো একের পর এক বাতি জ্বালাতে জ্বালাতে। দুর্গাবাড়ির সামনে অর্থাৎ বকুল তলা মিয়া বাড়ির সম্মুখে রাস্তায় তারপর কালিঘাট, বড় মসজিদ হয়ে দয়াময়ী বাড়ির সামনের রাস্তায়– এইভাবে স্টেশন পর্যন্ত। এই আলোতেই চলতে হতো পথচারীদের। আবার শুক্লপক্ষে জ্যোস্নার আলোর জন্য কয়েক দিন আলো জ্বালানো হতো না। হঠাৎ একদিন দেখা গেল আলকাতরা মাখা লম্বা লম্বা কাঠের খুঁটি গরুর গাড়িতে করে বিশেষ বিশেষ জায়গায় রাখা হচ্ছে। এরপর খুঁটিগুলো গর্ত করে পোঁতা হলো। সবারই কৌতূহল কী হবে ঐ খুঁটিগুলো দিয়ে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল জামালপুরে বিদ্যুৎ আসছে। সময়টা ১৯৬১ সালের প্রথম ভাগে। বিদ্যুৎ আনছেন কে? মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার। তার নিরলস প্রচেষ্টায় বজ্রাপুর নামক স্থানে দুটি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী মেশিনের সাহায্যে সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে জামালপুর বিদ্যুতায়িত হলো। তখন থেকেই ল্যাম্পপোস্টে কেরোসিনের বাতির পরিবর্তে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলত সারারাতভর, এভাবে সার্থক হলো জামালপুরে বিদ্যুতায়ন।

ব্রিটিশ পিরিয়ড থেকে জামালপুর স্টেশনের নাম ছিল সিংহজানী রেলওয়ে জংশন। হয়তো সিংহজানী মৌজার উপর প্রতিষ্ঠিত বলে রেল স্টেশনের নাম হয়েছিল। হযরত শাহজামাল সাহেবের নাম অনুযায়ী শহরের নাম জামালপুর। যাত্রী সাধারণকে সিংহজানী স্টেশনে নেমে একটা মস্ত বিড়ম্বনায় পড়তে হতো। স্টেশনের নাম আর শহরের নামের অসংগতি দূর করতে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার সাহেব রেল কর্তৃপক্ষের সাথে পত্রালাপ করে করে শেষ পর্যন্ত সিংহজানী রেল স্টেশন জংশন থেকে জামালপুর রেল স্টেশন জংশন করিয়েছিলেন।

জামালপুরে আগত বাংলাদেশের বরেণ্য ব্যক্তিগণ তার বাড়িতে আতিথেয়তা গ্রহণ করেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব প্রমুখ। উল্লেখ্য, শেরে বাংলা এক সময় জামালপুরের এসডিও ছিলেন।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার চাচা একজন সাহিত্যরসিক ব্যক্তি ছিলেন। তারই উদ্যোগে জামালপুর সরকারি বিদ্যালয় মাঠে (বর্তমানে স্টেডিয়ামের বিপরীতে যা মেলার মাঠ নামে পরিচিত ছিল) একটি সাহিত্য সম্মেলন হয়েছিল। আমন্ত্রিত অনেক কবি-সাহিত্যিদের মধ্যে পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন, গোলাম মোস্তফা সাহেব, আব্বাস উদ্দিন প্রমুখ। আরও কয়েকজন বরেণ্য কবি ও সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন যাদের নাম মনে করতে পারছি না। আমার কয়েকজন সাহিত্যিক কবির সাথে কথা বলার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেই দিনের সাক্ষাৎকার আজও আমাদের জীবনে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

জামালপুর মেলার মাঠে বিশাল মেলার আয়োজন হতো। এতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা থাকত। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার সাহেব এই অনুষ্ঠান আয়োজন ও পরিচালনা করেন। অনেক দর্শক অনুষ্ঠানে আসতেন রীতিমতো টিকিট করে। ওরকম একটি অনুষ্ঠানে ঢাকার বুলবুল ললিতকলা একাডেমির শিল্পীরা আনারকলি নামে নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে। এই নৃত্যনাট্য পরিচালনা করেন বুলবুল ললিতকলা একাডেমির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরীর সহধর্মিণী আফরোজা বুলবুল। সেই অনুষ্ঠানের পরিবেশনা অপূর্ব কলাকৌশল দেখে দর্শকসকল মুগ্ধ হয়। একদিন মণিপুরী নৃত্য পরিবেশিত হবে বলে জোর প্রচার করা হয়। নির্দিষ্ট দিনে মণিপুরী দল না আসায় নালিতাবাড়ি, ঝিনাইগাতি প্রভৃতি জায়গা থেকে উপজাতিদের যেমন গারো, হাজং কিছু ব্যবস্থা করে মণিপুরীদের বদলে তাদের দিয়ে এক অদ্ভুত নৃত্য পরিবেশন করা হয়। আমার পরিষ্কার মনে আছে তাতে বনপাড়ার প্রয়াত যাত্রামোহন গোপ সং সেজে ওদের সাথে যোগ দিয়ে দর্শকদের আনন্দ দিয়েছিল।

খেলাধুলার প্রতিও মির্জা চাচার বিশেষ উৎসাহ ছিল। বর্তমানে জিলা স্কুলের মাঠে (তদানীন্তন মেলার মাঠ) দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ভালো ভালো ফুটবল দল এনে ফুটবল খেলার ব্যবস্থা করেন। এতে জামালপুরবাসী ফুটবল-প্রেমিকদের প্রচুর আনন্দ জুগিয়েছে।

জামালপুর দয়াময়ী বাড়ি সংলগ্ন বাগানের মতো একটা জায়গা ছিল যেটা দয়াময়ী মাতার নৃত্যপূজার জন্য পুষ্প চয়ন করা হতো। জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হওয়ায় সেই

জায়গাটি সরকারের মালিকানাধীন হয়। মির্জা চাচা ঐ স্থানে শিশুদের জন্যে একটা পার্ক তৈরি করেন, নাম দিয়েছিলেন 'পুনাই পার্ক'। গ্রাম দেশে বিশেষ করে জামালপুরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পুনাই পান বলা হয়। এই অর্থেই তিনি পুনাই পার্ক নামটি ব্যবহার করেছেন। আবহমান বাংলার কথ্যভাষার ঐতিহ্যকে তিনি ধরে রাখতে চেয়েছেন। বর্তমানে সেই পুনাই পার্কটি আজকের জামালপুরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে রূপান্তরিত হয়েছে।

মির্জা চাচা জামালপুর মিউনিসিপালিটির ভাইস চেয়ারম্যান থাকাকালীন মিউনিসিপালিটির সংলগ্ন ব্রহ্মপুত্র নদের জল স্পর্শ করে এমন একটি ঘাট তৈরি করেন। বর্ষা মৌসুমে যার সিঁড়িগুলো জলে ডুবে যেত। দুই পাশে ছিল শানে বাঁধানো (কংক্রিটের) বসার হেলান চেয়ারের মতো। গরমকালে কত লোকের সমাগম হতো। দুপাশের বসবার জায়গার স্থানে নরনারীর উপস্থিতিতে ভরে যেত। বর্ষার ভরা জোয়ারের ঢেউয়ে মানুষের বৈকালিক অবসর বিনোদনের একটা সুন্দর জায়গা হয়েছিল। আমি নিজেও সেখানে বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা দিয়েছি। অপর পাড়ের দৃশ্য চমৎকার। ছুঁয়ে চলা নৌকো সেই সাথে আকাশ-ছোঁয়া দিগন্ত একটা অনাবিল আনন্দের ছোঁয়ায় হৃদয়ে স্পর্শ করত। আবার যখন আমি একা বসে থাকতাম, কখন যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে রাত হয়ে গেছে বুঝতেই পারিনি। শুধুই মনে পড়েছে অতীতের কত ছবি, কত স্মৃতি, কত কথা।

ব্রহ্মপুত্র নদের হাত থেকে শহর রক্ষা প্রকল্পের জন্য যখন কংক্রিটের ভারী ভারী চ্যাপ বসিয়ে সম্পূর্ণ পাড় বাঁধানোর হলো। তখন মিউনিসিপালিটি কর্তৃক এই সিঁড়িটাকে ভেঙে ফেলা হলো। সম্পূর্ণ হারিয়ে গেল আমাদের আনন্দ-বেদনার স্মৃতিমাখার সেই মিউনিসিপালিটির সিঁড়ির ঘাট।

মির্জা চাচা জামালপুর মিউনিসিপালিটির ভাইস চেয়ারম্যান থাকাকালীন মিউনিসিপালিটির এই ঘাট সংলগ্ন একটি মিলনায়তন নির্মাণ করেছিলেন। বর্তমান পাবলিক হল তৈরির পূর্বে জামালপুরের সব ধরনের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতো এই মিলনায়তনে।

১৯৫৮ সালের জেনারেল আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করেন। তদানীন্তন পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন জারি হলো। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তখন অনেকেই জেলে অথবা পলাতক। মার্শাল ল নির্দেশ প্রত্যহই জারি হতো রেডিওর মাধ্যমে। জনগণকে বাধ্য হয়েই মেনে চলতে হতো সামরিক ফরমান। এ সময় এক ফরমানে বলা হলো, পাড়ায় পাড়ায় ডিফেন্স পার্টি গঠন করে পাহারা দিতে হবে। ১৯৬১-৬৫ সালে ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে জামালপুরে ডিফেন্স পার্টি গঠনের দায়িত্ব পড়ল মির্জা চাচার উপর। আমাদের পাড়ার ডিফেন্স পার্টি গঠন হলো। তাতে বাড়ির সব বয়স্ক লোকদের ডিফেন্স পার্টির সদস্য করে এক তালিকা তৈরি করা হলো। আমরা যুবকরা প্রতিবাদ জানালাম। বয়স্কদের বাদ দিয়ে আমাদের যুবকদের নিতে হবে। যাই হোক আমাদের কথা তিনি মেনে নিলেন। আমরা যুবকরাই সাতজন সাতজন করে দল করে প্রতি রাতে পাহারা দিতে শুরু করলাম। প্রত্যেক গ্রুপে একজন করে গ্রুপ লিডার নির্বাচিত করে দিলেন মির্জা চাচা।

আমি প্রতি বৃহস্পতিবারের দায়িত্ব পেলাম। আমার গ্রুপে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে মরহুম আব্দুল কাদের যাকে স্কাউট কাদের নাম বলে ডাকতাম, সহপাঠী মরহুম সৈয়দ

জিয়াউল ফুয়াদ, মরহুম আব্দুল মোতালেব, গেদু, অঘোর বন্দু দাসসহ আরও দুজন ছিল যাদের নাম এখন মনে করতে পারছি না। এমনি একদিন ডিউটিরত অবস্থায় মির্জা চাচার বাড়ির কাছে বসে ছিলাম। তখন আমাদের কাজ খুঁজে বের করলাম।

পথগামী রিক্সাচালকদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে একে একে ছেড়ে দেওয়া হতো। একটি রিক্সা আমাদের কথায় না থেমে চলে যেতে ছিল। শেষ পর্যন্ত আমরা ঐ রিক্সাকে ধাওয়া করে ধরে ফেললাম। তাতে বসা তদানীন্তন এসডিও নিজের পরিচয় দিলে আমরা দুঃখ প্রকাশ করে চলে এলাম। ইতিমধ্যে মির্জা চাচার কনে কথাটা পৌঁছে গেল। তিনি ছুটে এসে সব জেনে আমাদের বিশেষ করে আমাকে তিরস্কার করলেন আমি যেন কাল সকাল আটটার মধ্যে এসডিও সাহেবের কাছে দেখা করে গত রাতের ঘটনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে আসি। আমার ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হওয়ায় তিনি নিজেই চলে গিয়ে এসডিও সাহেবের সাথে দেখা করেন, আমাদেরকে তিরস্কার করে কথা বললে এসডিও সাহেব আমাদের যথেষ্ট প্রশংসা করলেন। এ ধরনের যুবকদের দিয়েই ডিফেন্স পার্টি করার জন্য মির্জা চাচাকে ধন্যবাদ জানালেন। এসডিও সাহেবের বাংলো থেকে বের হতেই আমার সাথে দেখা হতেই মির্জা চাচা আমাকে জড়িয়ে ধরে প্রশংসা করে আমাকে দোয়া করলেন।

আমরা কিছু যুবক মিলে শতাব্দীর দূত নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার সাহেব এ সংগঠনের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তার আর্থিক সহায়তা নিয়ে ব্যাটারি কিনে আমাদের প্রতিষ্ঠানের রেডিওতে ভালো ভালো ক্রিকেট খেলার ধারাভাষ্য শুনতাম। তাতে মাঝে মাঝে মির্জা চাচা উপস্থিত থেকে শুনতেন। বর্তমান সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের একটি অংশে আমাদের প্রিয় শতাব্দীর দূত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটি ছিল।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার সাহেব মিউনিসিপালিটির নির্বাচনে দাঁড়ালেন। আমরা পাড়ার যুবকরা তার নির্বাচনে যথেষ্ট শ্রম দিয়ে তাকে বিজয়ী করলাম। কিন্তু ১৯৬১ সালে জেনারেল আইয়ুব খান দীর্ঘ দিন ক্ষমতায় টিকে থাকার বেসিক ডেমোক্রেসি অর্থাৎ মৌলিক গণতন্ত্র নামে এক অদ্ভুত গণতন্ত্র পাকিস্তানবাসীর জন্য চালু করলেন। তাতে জনগণ তাদের ভোটে প্রত্যেকটি ওয়ার্ড থেকে একজন করে মেম্বার নির্বাচিত হবেন। এই মেম্বারদের ভোটে আবার ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন। তখন পদাধিকার বলে এসডিও সাহেব মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান হতেন। আইয়ুব খানের এই কূটকৌশলে মেম্বারদের ভয়ভীতি এবং আর্থিক প্রলোভন দেখিয়ে নিজেদের পদে বেসিক ডেমোক্রেটদের তার সপক্ষে অধিকাংশ ভোট গ্রহণ করে নিজেই আবার দেশের প্রেসিডেন্ট হবেন। কার্যত পরিণতি তা-ই হলো।

মির্জা চাচার একটি পালিত কন্যা ছিল। যত দূর মনে পড়ে তার নাম কমলা। তাকে পিতৃস্নেহে লালনপালন করে সুপাত্রে বিয়ে দিয়েছেন। এছাড়াও তার বাড়িতে আশ্রিত ছিল অনেকেই।

তিনি পাবলিক লাইব্রেরীতে একজন লাইব্রেরীয়ান দিলেন। তার নাম নিরঞ্জন ঘোষ ওরফে কানু ঘোষ। তিনি চমৎকার সেতার বাজাতে পারতেন। সেতারের সুর-মূর্ছনায়

আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। ধীরে ধীরে তার নৈকট্যে এলাম এবং জানতে পারলাম তিনি কালব্যাধি যক্ষ্মায় আক্রান্ত। তখন ঢাকায় মহাখালী হাসপাতালে এই রোগের সুচিকিৎসা হতো। জামালপুরের আমার পরিচিত অনেকেই ওখান থেকে ভালো হয়ে ফিরে আসত। মহাখালী হাসপাতালে মির্জা চাচার বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি ছিল।

আমি মির্জা চাচাকে এই গুণী ব্যক্তিটিকে ঐ হাসপাতালে ভর্তি করার জন্য অনুরোধ করলাম। সংস্কৃতিমনা মির্জা চাচা তাকে সেখানে ভর্তি করে দিলেন নিজে গিয়ে। কিন্তু কানুদা চিকিৎসা শেষ না করেই পালিয়ে চলে এলেন জামালপুরে। পরিণতি যা হবার তাই হলো। দীর্ঘ দিন রোগে ভুগে শেষ পর্যন্ত ভিটেমাটি বিক্রি করে তিনি চলে গেলেন পরপারে। রেখে গেলেন বিধবা স্ত্রী, দুই কন্যা, দুই ছেলে। শেষ পর্যন্ত, তাদেরকে আমার বাড়িতে আশ্রয় দিতে বাধ্য হলাম। সামান্য ভাড়ার বিনিময়ে তারা আমাদের বাসায় দীর্ঘ দিন থেকে গেলেন। কানুদার বড় ছেলে অলকেশ ঘোষ চন্দন বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী।

মির্জা চাচা তার দেশ নিলক্ষিয়া থেকে কিছু দরিদ্র লোক আনিয়ে তার বিদ্যুৎ সংস্থায় চাকুরি দেন। পরবর্তীকালে সরকার ঐ কোম্পানীকে গ্রহণ করলে ঐ সমস্ত লোকগুলোর সরকারি চাকুরি হয়ে যায়। তাদের অনেকেই অবসরের পর সরকারি সুবিধাদি পাচ্ছেন।

আশরাফ উদ্দিন হায়দার সাহেব দুইবার জামালপুর ফৌজদারী আদালতের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হয়েছিলেন। আইন-আদালত সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন ধারণা ও দক্ষতার কারণে তিনি দুইবার ঐ পদে নিয়োজিত হতে পেরেছিলেন।

দেউরপাড় চন্দ্রা জামালপুর সংলগ্ন একটি গ্রাম। ব্রিটিশ আমলে এই গ্রামটি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ঘাঁটি ছিল। সেই গ্রামে রাজা হরিশ চন্দ্রের দিঘি আছে। মির্জা চাচা ঐ হাজামজা দিঘিটাকে সংস্কার করে মাছ-চাষের ব্যবস্থা করেন। সংস্কারকৃত দিঘিটি এখন মির্জা সাহেবের দিঘি নামে পরিচিত হয়েছে।

আমাদের প্রতীতি যে, জামালপুর শহরের বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সেবামূলক কর্মকাণ্ডে মির্জা চাচার ভূমিকা চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে।

বিশিষ্ট অনুবাদক, লেখক আবদুল্লাহ আল-হারুনের মূল্যায়ন এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। তিনি লিখেছেন : 'মির্জা সাহেব মজলিসি ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর আত্মীয় ডা. এফ জামান আমার বাবার ছাত্র ছিলেন।'

এ প্রসঙ্গে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী রঞ্জন কুমার দাম (অপু)র মূল্যায়ন প্রণিধানযোগ্য। তিনি শৈশবে ও কৈশোরে কাছ থেকে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারকে দেখেছেন। তিনি তার সম্পর্কে লিখিত অনুভূতিতে বলেছেন :

আসলে তাঁর সাথে আমার শৈশব-কৈশোর কেটেছে। ঐ বয়সে তো আর এত কিছু বুঝতাম না, তাহলে তাঁর অনেক কথাই আমি লিখে রাখতে পারতাম।

উনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। আমাদের রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, পুরাণের অনেক কিছু তাঁর মুখস্থ ছিল। এছাড়া ঈশপ, নাসিরুদ্দোজা, গোপাল ভাঁড়, আসামের জঙ্গলের কাহিনী, ঠাকুমার ঝুলি ও ভূতের গল্প আমাদের শুনাতেন। নজরুলের জীবনের সাথে

তাঁর কিছুটা মিল ছিল, ছোটবেলায় মা-হারা হয়ে বোনের সংসারে মানুষ হয়েছেন। এজন্য খুব বাউন্ডেলে প্রকৃতির ছিলেন। জারি-সারি, পুথি পাঠসহ বাঙ্গালী সংস্কৃতির আবহে বড় হয়েছেন। একবার উনি গানের দলের সাথেও ঘুরে বেড়িয়েছেন। টপ্পা ও ঠুমরিসহ নজরুল, রবিঠাকুর এবং পঞ্চকবির গান পছন্দ করতেন। আসাম-কামাক্ষ্যা গিয়ে কিছুদিন যাদুবিদ্যা/তন্ত্রসাধনাও করেছেন। জীবনে থিতু হতে তাঁর অনেক সময় লেগেছিল। নজরুলের কবিতা আবৃত্তি করতে পারতেন অনর্গল। খুব ভাল দাবা খেলতেন এবং কুস্তি ও ব্যায়াম করতেন। ফুটবলের পাশাপাশি ক্রিকেটও ভালবাসতেন। তাঁর হাত ধরেই আমার পত্রিকা পড়ার অভ্যাস, খেলাধুলার হাতেখড়ি। শেষ বয়সে তাঁর পারকিনসন রোগ ছিল বলে হাত কাঁপতো। এজন্য লিখতে অসুবিধা হতো। নতুবা উনি হয়তো আরও লিখতে পারতেন। একটা সময় উনি লাঠি কিংবা কারও সাহায্য ছাড়া বেশীদূর হাঁটতে পারতেন না। এজন্য আমি তাঁর সাথে সাথে অফিস পাড়া ও খেলার মাঠে যেতাম। উনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহভরে তাঁর বাহন হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিতেন। তাঁর রসবোধ ছিল অগাধ। নিজেও প্রাণ খুলে হাসতে পারতেন, আবার অন্যদেরও হাসাতে পারতেন।

উনি রাজনীতির কূটকৌশল বুঝতেন না। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষকে ভালবাসতেন। এজন্য তাঁর মুখে আমি প্রায়ই শুনতাম, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপের নাই'। পাকিস্তান আন্দোলন যেমন সমর্থন করেছিলেন কিন্তু লিয়াকত, মোনেম খান ও আইয়ুবের শাসন দেখে রাজনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন। উনি বঙ্গবন্ধুকে ভালবাসতেন এবং সরাসরি অংশগ্রহণ না করেও মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করতেন। তিনি তাঁর বাড়ীর দোতলায় এবং দীঘির পাড়ে বহু হিন্দু পরিবারকে লুকিয়ে রেখে তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৯৭৪ সনের বন্যা ও দুর্ভিক্ষে তাঁর বাসার বারান্দা, সামনের আঙিনায় মানুষকে জায়গা দিয়েছিলেন এবং তাদের খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্ট বেতারে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর খবর শুনে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। আমার সেই ঘটনা এখনো মনে আছে।

আশাবাদী মানুষ কখনো বসে থাকতে পারেন না। মানুষের উপকার কিভাবে করা যায় এজন্য বিভিন্ন অফিসে বিশেষ করে জেলা প্রশাসক, সমবায়, বিআরডিপি, মৎস্য ও সমাজসেবা অফিসে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। কিন্তু তাদের কর্মকাণ্ডে হতাশ হয়েছেন।

জামালপুর পৌরসভা নির্বাচনে (সম্ভবত : ১৯৭৭) যখন আওয়ামী লীগ, ন্যাপসহ জামালপুরের সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দ তাঁর কাছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অনুরোধ নিয়ে আসে, উনি প্রথমে প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মনে একদিকে মানুষকে সেবা করার আগ্রহ আর আরেকদিকে যখন সরকারি বিভিন্ন অফিসে ঘুরে ঘুরে হতাশ, তখন হয়তো তাঁর দারিদ্র্য বিমোচন ও ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণের আশায় জামালপুরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের পরপর ৩ দিন বৈঠকের শেষদিনে উনি নির্বাচন করতে রাজি হয়েছিলেন। উনি ঘড়ি মার্কায় নির্বাচন করেন এবং বিপুল ভোটে জয়লাভের পরিবেশ সত্ত্বেও কুচক্রীদের যোগসাজসে মাত্র ১২ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিলেন। এই রেজাল্ট

জামালপুরবাসীদের মেনে নিতে অনেক কষ্ট হয়েছিল।

তাঁর জনহিতকর কাজের মাঝে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ ছিল 'ভিক্ষাবৃত্তি দূরীকরণ প্রকল্প'। তিনি এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য জেলা প্রশাসকসহ বিভিন্ন দপ্তরে ঘুরেছেন। কিন্তু তেমন সাড়া না পেয়ে নিজ উদ্যোগে দেউড়পাড় চন্দ্রার তাঁর দীঘির পাড়ে অনেকগুলি ঢেঁকি স্থাপন করে সেখানে ভিক্ষুকদের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। অনেক দরিদ্র ছেলেকে তিনি বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ কেন্দ্রে চাকুরী দিয়ে তাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর হৃদয়ের বিশালত্বের কথা বলে শেষ করা যাবে না। নিজের দীঘির মাছ, ফলমূল অকাতরে দান করতেন। রাজশাহী থেকে উনি বিভিন্ন জাতের অসংখ্য আম ও কাঁঠালের চারা তাঁর নিজের বাড়ী ও দীঘির চারপাশে লাগিয়েছেন যা আশপাশের শিশুকিশোরসহ সকল শ্রেণীর মানুষের রসনা তৃপ্ত করতো। এতকিছুর পরও তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রচারবিমুখ।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার জামালপুর জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তার মূল্যায়নে উপর্যুক্ত ব্যক্তিদের কথাই যথেষ্ট। তিনি ছিলেন সমকালে একজন আলোকিত ব্যক্তিত্ব। সামাজিক দায়বদ্ধতায় মানুষের কল্যাণে তিনি কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের গড়ে তোলার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন, পাশাপাশি অসংখ্য মানুষকে সহযোগিতা করেছেন। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে বিশ শতকে আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্রের গঠনমূলক কাজে যে ভূমিকা রেখেছেন তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মৃত্যুর পর পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত লেখালিখির তথ্য

মৃত্যুর পর মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের ওপর লিখিত অনলাইন নিউজপোর্টালে তাঁর সম্পর্কে প্রকাশিত দুটি লেখা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট পদের পরিচয় এবং একজন মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার : সংক্ষিপ্ত কর্মবৃত্ত

শাহ্ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট বা অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট (Honorary Magistrate) একটি ঐতিহ্যবাহী পুরোনো পদ। এই পদটিকে জাস্টিস অফ দি পিস (Justice of the Peace)ও বলা হয়। জানা যায়, ১৭২৬ সালে এই পদের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বা মফস্বল এলাকার কল্যাণের জন্য এ পদটি সৃষ্টি হয়েছে। অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটদের ক্ষমতা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির হয়ে থাকে এবং তা নিয়োগপত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত হয়।

বিচার প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতা যোগ্যতার উন্নতির মাধ্যমে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটরা ক্রমে ক্রমে প্রথম শ্রেণিতে উন্নীত হন। অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটদের কোর্টকে অনারারি ফৌজদারি কোর্ট বা অনারারি কোর্ট বলা হয়। অনারারি কোর্টে ম্যাজিস্ট্রেসির ক্ষমতা শ্রেণি অনুযায়ী একটি বা দুটি বেঞ্চ ও পুলিশ অফিসার এবং অন্যান্য কর্মচারী নিযুক্তসহ সরঞ্জামাদি প্রদান করা হয়।

অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটগণ সমাজে অত্যন্ত সম্মানীয়। তাঁরা ছোটখাট ও লঘু অপরাধের ফৌজদারি বিচারকার্য সম্পন্ন করেন। তাঁরা সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ বা পুলিশের প্রদত্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বা অপরাধ সংঘটনে নিজেদের প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কোনো অপরাধ আমলে নিতে পারেন।

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সালের ৫নং আইন) প্রণয়নের সময় এই আইনের ২২ থেকে ২৫ ধারায় এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিধান করা হয়।

পরবর্তীকালে দি ক্রিমিনাল ল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯২৩ (১৯২৩ সনের ১২ নং আইন) দ্বারা ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর উক্ত বিধানের কিছুটা সংশোধন আনয়ন করা হলে উক্ত আইনের ২৩ ও ২৪ ধারা রদ করা হয়। বিচার বিভাগের প্রয়োজনীয়তার বিবেচনায় প্রায় তিনশ বছরের এই পুরোনো পদটি ফৌজদারি কার্যবিধিতে এখনো বলবৎ রয়েছে।

আইনের প্রখ্যাত ভাষ্যকার গাজী শামছুর রহমান (১৯২১-১৯৯৮) তাঁর 'ফৌজদারী কার্যবিধির ভাষ্য' গ্রন্থে ফৌজদারি কার্যবিধির ২২ ও ২৫ ধারার ব্যাখ্যায় অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট বা জাস্টিস অভ দি পিস সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। আইনের কমিশনের 'আইন-শব্দকোষ' (২০২০) গ্রন্থে এ পদটি সম্বন্ধে বলা হয়েছে :

> জাস্টিস অফ দি পিস একটি অতি পুরাতন পদ। সম্ভবত ১৭২৬ সালে এই পদের সৃষ্টি হয়। The Code of Criminal Procedure, 1898-এর ২৫ ধারা-অনুসারে সুপ্রীম কোর্টের প্রত্যেক বিচারক পদাধিকারবলে সমগ্র বাংলাদেশের জাস্টিস অফ দি পিস; দায়রা বিচারক ও চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণ এবং মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটগণ পদাধিকারবলে তাঁহাদিগের অধিক্ষেত্রভুক্ত এলাকার জন্য জাস্টিস অভ দি পিস থাকেন। ২২ ধারা-অনুসারে সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া বাংলাদেশের বাসিন্দা ও কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিক নহেন; এইরূপ যে-কোনো ব্যক্তিকে বিজ্ঞপ্তি উল্লিখিত কোনো স্থানীয় এলাকার জন্য জাস্টিস অফ দি পিস বা অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করা যাইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে নিয়োগপত্রে তাঁহাদের কর্তব্য ও অধিকারের বর্ণনা দেওয়া হইয়া থাকে।

(উদ্ধৃত : আইন-শব্দকোষ : বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক ও অন্যান্য, আইন কমিশন, পৃ. ৬৮৬)

উল্লেখ্য, অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট কী কী দায়িত্ব প্রতিপালন করেন এবং তাঁর অধিকার ও ক্ষমতা কী, সেসব বিষয়ে ফৌজদারি কার্যবিধিতে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো বিধান নেই। বিশেষ আইন দ্বারা তাদের দায়িত্ব এবং অধিকার নির্ণীত হয়ে থাকে। এ কারণে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট পদধারী ব্যক্তির নিয়োগপত্রে তাঁদের কর্তব্য এবং অধিকারের বর্ণনা দেয়া হয়। পাক-ভারত উপমহাদেশে বেশ কজন খ্যাতিমান ব্যক্তি এ পদ লাভ করেছেন।

তাঁরা সবাই জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও দক্ষতায় অনন্য ছিলেন। অবিভক্ত বাংলায় বেশ কজন স্থানীয় এলিট, জনপ্রতিনিধি, স্বাধীনতা-সংগ্রামী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিক অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাঁরা ক্ষমতানুযায়ী শ্রেণিভেদে এজাহার গ্রহণ, সরাসরি বিচার, অন্য বিচারকের নিকট রেকর্ড দেওয়ার ক্ষমতা, অভিযোগ গ্রহণের সময় হতে সোপর্দ করার ক্ষমতা লাভ করতেন।

অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটরা এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। স্থানীয় পর্যায়ে এই অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটগণ আইনাঙ্গনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁদের এই অবদানের উপর গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। তাঁদেরকে বর্তমান বিচার ব্যবস্থার সামনে আনা হলে এবং এ পদটি স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবহৃত হলে দেশের অভ্যন্তরে ঝুলে থাকা লক্ষ লক্ষ মামলার জট কমাতে সহায়ক হবে।

সমকালে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটদের বিচার প্রক্রিয়াকে কোনোভাবে অস্বীকার করা যায় না। এ প্রেক্ষিতে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট বা জাস্টিস অভ দি পিসদের জীবন ও কর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁরা দেশের জাতীয় ইতিহাসের অংশ। বর্তমান প্রজন্ম বা তাদের প্রজন্মান্তরের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এসব অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটদের সম্বন্ধে ধারণা, পরিচিতি না জানলে ক্ষতি তাদেরই।

এদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যে এরকম একজন অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার (১৯০৫-১৯৮৫)। তিনি ছিলেন একাধারে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী, সমাজসেবী ও সাহিত্যিক। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার বিশ শতকের চল্লিশের দশকে বৃহত্তর জামালপুরের বর্তমান শেরপুর জেলার (তখন শেরপুর থানা) অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। এদেশের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ অর্জনের পক্ষে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। বিশেষ করে বর্তমান জামালপুর ও শেরপুর জেলার ইতিহাস এবং ঐতিহ্যে তাঁর নাম প্রাতঃস্মরণীয়।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য এই যে এ অঞ্চলের বর্তমান প্রজন্মের কাছে তিনি এখন উপেক্ষিত ও প্রায় বিস্মৃত। অথচ এমনটি হওয়ার কথা ছিল না; বিশ শতকের আশির দশক পর্যন্ত তিনি এই অঞ্চলের নানাবিধ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বীজ বপন করেন। যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।

এ অঞ্চলের অনগ্রসর মানুষকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। এই হিসেবে তিনি জাতীয় ইতিহাসের অংশ। তাঁদেরই নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলেই এক সময়ের অবহেলিত এবং অনুন্নত বৃহত্তর জামালপুর মহকুমা এখন শেরপুর ও জামালপুর দুটি সমৃদ্ধ জেলায় পরিণত হয়েছে। এ প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার-এর জীবন ও কর্মের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার প্রয়াস করেছি।

জানা যায়, মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ১৯০৫ সালে বর্তমান বকশীগঞ্জ উপজেলার নিলক্ষিয়ার তৎকালীন পাতিলাদহ পরগনার সম্ভ্রান্ত মুসলিম জোতদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, ব্রিটিশ আমলে বকশীগঞ্জ ছিল দেওয়ানগঞ্জ থানার একটি গ্রাম। ১৯৩৭ সালে দেওয়ানগঞ্জ থানার অন্তর্ভুক্ত বকশীগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা হয়। পরে ১৯৮২ সালে বকশীগঞ্জ থানা, তারপরে ১৯৮৩ সালে উপজেলা করা হয়।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের পিতার নাম মির্জা আসাদ উদ্দিন হায়দার ও মাতার নাম তৈবুন নেসা। এ সম্বন্ধে 'জামালপুরের গণ-ইতিবৃত্ত' (১৯৫৪) গ্রন্থে রয়েছে :

> মির্জ্জা আসাদ উদ্দিন হায়দার, ঢাকার প্রাচীনতম মোগল জমিদার মির্জ্জা জানে নাজনীন হায়দার সাহেবের বংশধর এবং হাজারাদি (বর্তমান ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জের অংশবিশেষ) পরগনার ১৬ আনার মধ্যে পৌনে ৭ আনা অংশের

> জমিদার পরিবারের সন্তান। মির্জ্জা আসাদ উদ্দীন হায়দার সাহেব নিলক্ষিয়ার যোতদার শেখ জয়েনুল আবেদীন সাহেবের কন্যাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফলে মির্জ্জা আশরাফ উদ্দীন হায়দার সাহেব জন্মগ্রহণ করেন। ... এই মির্জ্জাগণ বহুপূর্ব্বে মধ্য এশিয়ার মঙ্গোলিয়ার অন্তর্গত সমরকন্দ নগরীর অধিবাসী ছিলেন। বাবরের ভারত বিজয়ের সময় ইহারা ভারতে আসেন এবং শের সাহেবের সহিত যুদ্ধে বাবরের ভাগ্য বিপর্যয়ের সময় ইহারা পারস্যের সিরাজ নগরে গিয়ে বাস করিতে থাকেন। ইহার পর ভারতে আবার মোগল সাম্রাজ্য কায়েম হইলে ইহারা পুনরায় ভারতে আসেন এবং বাংলার নওয়াব আলিবর্দি খানের বিশেষ আনুকূল্য লাভ করিয়া ঢাকায় বাস করিতে থাকেন। ইহার পর রাজানুগ্রহে তপে হাজরাদি পরগনায় জমিদারী প্রাপ্ত হইয়া তথায় চলিয়া আসেন।

[উদ্ধৃতি : জামালপুরের গণ-ইতিবৃত্ত : গোলাম মোহাম্মদ (প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৪), আমেনা প্রেস, জামালপুর, পৃ. ১৮-১৯]

শিশুকালে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের মা ইন্তেকাল করেন। তিনি তাঁর নানির আদর-স্নেহে লালিতপালিত হন। আশরাফ উদ্দিন হায়দার পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর ১৯১৩ সালে তাকে ঐতিহ্যবাহী ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে ভর্তি করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানে তিনি কয়েক বছর পড়াশোনা করেন। এ সময় মহাত্মা গান্ধীর (১৮৬৯-১৯৪৮) ডাকে অবিভক্ত বাংলাসহ সারা ভারতবর্ষে অসহযোগ আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। এই আন্দোলনের তীব্রতা এতই বেশি ছিল যে প্রথম বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫) সময়ও ভারতবর্ষের এ রকম মূর্তি ধারণ করেনি।

দেশের অন্যান্য স্থানের মতো বৃহত্তর জামালপুরেও গান্ধীবাদের ধারা ছড়িয়ে পড়ে। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা না দিয়েই গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে নেমে পড়েন। তিনি এ সময় কংগ্রেস দলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। পরবর্তীকালে স্বরাজ দলের কর্মী হিসেবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের (১৮৭০-১৯২৫) সঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ান এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদীর একজন খাঁটি স্বাধীনতা সংগ্রামের কর্মী হিসেবে নিজেকে তৈরি করেন। এ সময় তিনি দেশবন্ধুর সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন স্থানে মিটিং-মিছিলে নেতৃত্ব দেন।

অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে ছাত্রজীবন ত্যাগ করার কারণে তিনি কিছুটা দেরিতে ১৯৩৯ সালে বর্তমান শেরপুর জেলার গোবিন্দকুমার (জি. কে.) পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

[(তথ্যসূত্র : বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা : জামালপুর : শামসুজ্জামান খান (প্রধান সম্পাদক), প্রথম প্রকাশ : ২০১৩, বাংলা একাডেমি, পৃ. ৭৫]।

তবে পারিবারিক একটি সূত্রে জানা যায়, তিনি ১৯৩৯ সালে বকশীগঞ্জের রূপজাহান (আর. জে.) পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় হতে ম্যাট্রিক পাশ করেন। অতঃপর তিনি

১৯৪১ সালে বর্তমানে সরকারি আনন্দমোহন (এম. এম.) কলেজ থেকে আইএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে এ কলেজে বিএ ক্লাসে ভর্তি হন কিন্তু লেখাপড়া সম্পন্ন না করেই দেশের ডাকে এ অঞ্চলের জাতীয়তাবাদী প্রগতিশীল রাজনীতিসহ নানা জনহিতকর কল্যাণমূলক কাজে নিজেকে যুক্ত করেন। পরবর্তীকালে তিনি পড়াশোনা করে আনন্দমোহন কলেজ থেকে বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

(তথ্যসূত্র : ময়মনসিংহের চরিতাভিধান, পৃ. ১৩৭)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বপর্যন্ত বৃহত্তর জামালপুরের বকশীগঞ্জ, দেওয়ানগঞ্জ ও শেরপুর (তখন থানা) অঞ্চলে অনেক জনসেবামূলক কাজ করেন। এরপরে এতদঞ্চলে নানা জনকল্যাণমূলক কাজে তিনি আরও বেশি সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। জনহিতকর কাজের জন্য ব্রিটিশ রাজ সরকার তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখত। এ সময় ব্রিটিশ সরকার তাঁকে অঞ্চলের জন্য অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট বা জাস্টিস অফ দি পিস নিযুক্ত করে। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে প্রথম শ্রেণির অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করে প্রশংসিত ও সম্মানিত করেছিল। চল্লিশ দশকের পুরো সময় তাঁর বেঞ্চকোর্টে তিনি স্থানীয় ছোটখাটো অনেক ফৌজদারি মামলার সুষ্ঠু বিচার করে নিষ্পত্তি করেন।

পারিবারিক সূত্রে ও সুধীজন থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, তিনি সমকালে গঠিত ইউনিয়ন বোর্ড (বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদ), স্পেশাল ঋণ শালিসি বোর্ডসহ বিভিন্ন সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। সমকালীন জাতীয় রাজনীতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২), মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীসহ সমকালের অনেক নেতৃবর্গের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও পরিচয় ছিল।

(তথ্যসূত্র : Sebahotnews.org/2019; Accessed, ১৫ই জুন ২০১৯)

এই অঞ্চলের প্রবীণ রাজনৈতিক দলের কর্মীদের নিকট থেকে জানা যায়, ১৯৪৬-পরবর্তীকালে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার মুসলিম লীগের প্রভাবশালী কর্মী হিসেবে পাকিস্তান আন্দোলনে ভূমিকা পালন করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা লাভের পর এ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে নাকি বাংলা হবে এই নিয়ে পূর্ব বাংলায় তীব্র আন্দোলন হলে তিনি বাংলা ভাষার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছিলেন।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার বাংলাদেশ আমলেও সত্তর দশকে দ্বিতীয়বার জামালপুরের প্রথম শ্রেণির অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই দায়িত্ব তিনি দক্ষতার সঙ্গে পালন করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের (১৯২০-১৯৭৫) সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও যোগাযোগ ছিল। বঙ্গবন্ধু জামালপুর,

দেওয়ানগঞ্জ, শেরপুরে এলে তাঁর খবর রাখতেন। জামালপুর শহরের আমলাপাড়ায় অবস্থিত মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের ঐতিহ্যবাহী বাড়ি 'মির্জা হাউস'-এ মওলানা ভাসানী, প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ এসেছেন।

পারিবারিক ও সুধীজনদের নিকট থেকে জানা যায়, মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার এ অঞ্চলে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে বেশকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বকশীগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী নিলক্ষিয়া রূপজাহান পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর হাইস্কুল এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

উপর্যুক্ত সূত্রে থেকে আরও জানা যায়, তিনি নিলক্ষিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জামালপুরের দেউরপাড়া চন্দ্রা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অন্যতম প্রধান উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন।

একজন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মী হিসেবেও তিনি এ অঞ্চলে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি বেশকটি ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও প্রতিষ্ঠার সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি এ অঞ্চলে শান্তি-শৃঙ্খলা নিরাপত্তা রক্ষার জন্য গ্রাম-প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করেন।

প্রখ্যাত কামেল পুরুষ হযরত শাহজামাল (র.)-এর পুণ্যভূমি জামালপুরের মাটি— অথচ তাঁর নামে কোনো মৌজা, গ্রামহাট-বাজার বা কোনো স্থাপনার নাম ছিল না। প্রাগুক্ত সূত্র থেকে জানা যায়, মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার জামালপুর শহরের রেল স্টেশনের নাম সিংহজানী জংশন থেকে জামালপুর টাউন জংশন নাম পরিবর্তনে কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। ফলে ১৯৫৪ সালের ১৪ই আগস্ট এক সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী জামালপুর টাউন জংশন নামকরণ করা হয়।

এ অঞ্চলে সংবাদপত্র প্রকাশ ও সাংবাদিকতায় তাঁর ভূমিকা অনন্য। তিনি এ অঞ্চলের পাকিস্তান আমলে সাংবাদিকতার উন্মেষকালে সাংবাদিকতা করেছেন এবং 'তওফিক' নামে ১৯৫০ সালে সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের প্রকাশক-সম্পাদক-মুদ্রকের ভূমিকা পালন করেছেন।

তাঁর প্রতিষ্ঠিত মুদ্রণালয়ের নাম ছিল আমেনা প্রেস। এ প্রেস থেকে গোলাম মোহাম্মদের প্রণীত 'জামালপুরের গণ-ইতিবৃত্ত'সহ কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত ও মুদ্রিত হয়েছিল। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার সাহিত্যিক হিসেবেও সমকালে সুধীমহলে পরিচিত ছিলেন। তাঁর রচিত দুটি গ্রন্থ : 'আসামের জঙ্গলে' ও উপন্যাস 'মায়ার ভিটা' বিখ্যাত। 'আসামের জঙ্গলে' গ্রন্থটি একটি ভ্রমণকাহিনি। এছাড়া তাঁর অপ্রকাশিত কবিতা ও হামদ-নাতের পাণ্ডুলিপি ছিল।

পূর্বোক্ত তথ্যে আরও জানা গেছে তিনি ১৯৫৩ সালে জামালপুরে আয়োজিত একটি সাহিত্য সম্মেলনের অন্যতম সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৭ সালে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার সম্পাদনা করেন 'ঝিনাই' নামের আরও একটি পত্রিকা।

(তথ্যসূত্র : 'রজত জয়ন্তী : জামালপুর জেলা' স্মরণিকা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ২০০৩, পৃ. ৪৭)

এ অঞ্চলের কৃষকদের তিনি সমবায় কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করতে অন্যতম অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। পল্লিউন্নয়ন, ব্যবসা ও কৃষির সাথে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল। দরিদ্র জনসাধারণকে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করতে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল নিরন্তর। তাঁকে এখনকার সমবায় আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব বলা যায়।

তিনি ১৯৫৫ সালে সমকালের সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ও রেজিস্ট্রিকৃত এবং নিয়ন্ত্রিত জামালপুর সেন্টাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখেন। উল্লেখ্য, সমকালে বিভিন্ন অঞ্চলে কো-অপারেটিভ ব্যাংকগুলো বর্তমানে ব্যাংক অর্থে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ছিল না। কতগুলো গ্রামে নিয়ে রেজিস্টার্ড সোসাইটির অর্থ এসব কো-অপারেটিভ ব্যাংকে জমা থাকত। এখান থেকে কৃষকগণ টাকা উত্তোলন ও জমা রাখতে পারতেন।

(তথ্যসূত্র : Sebahotnews.org/2019; Accessed, ১৫ই জুন ২০১৯)

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার বৃহত্তর জামালপুর অঞ্চলে সমবায় গঠনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তিনি ১৯৫৯ সালে দি জামালপুর কো-অপারেটিভ ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই সোসাইটি লি. প্রতিষ্ঠা ও অনুমোদনের বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করেন।

সমকালে মহকুমা ও থানাগুলোতে খুবই সামান্য পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বিতরণের ব্যবস্থা ছিল। এ কাজগুলো কয়েকটি কোম্পানির মাধ্যমে হতো। ১৯৫৯ সালে সরকার ওয়াটার অ্যান্ড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট অথরিটি গঠনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ সময় মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার এ অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহে উক্ত সোসাইটির মাধ্যমে অবদান রাখেন। এছাড়া তিনি শহরে পানি সরবরাহের জন্য ওয়াটার ওয়ার্কস নির্মাণ কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

উল্লিখিত সূত্রে আরও জানা যায়, তিনি ১৯৬৫ সালে জামালপুর সাব ডিভিশন কো-অপারেটিভ মালটি পারপাস সোসাইটি লি. ও ১৯৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তান কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন লি. (বর্তমানে বিবর্তিত হয়ে সমবায় অধিদপ্তর) এ দুটি প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার এ অঞ্চলে দৃষ্টিহীন মানুষের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য অন্ধ কল্যাণ সমিতি গঠন করে অবদান রাখেন। তিনি ১৯৬২ সালে জামালপুরে অন্ধ কল্যাণ সমিতি প্রতিষ্ঠা করে বিনা পয়সায় চক্ষু চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করেন। তিনি এখানে কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রখ্যাত চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার টি. আহমেদের নেতৃত্বে চক্ষু অপারেশনের জন্য মেডিক্যাল ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ১৯৬০ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত জামালপুর পৌরসভার (স্থাপিত ১৮৬৯) বেসিক ডেমোক্রেসির বিধান মোতাবেক পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যান (বর্তমানে মেয়র) ছিলেন। তিনি এ সময় পাবলিক হল, পাবলিক লাইব্রেরি, স্টেডিয়াম প্রতিষ্ঠায় অন্যতম উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন।

স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৭৩ সালের শেষের দিকে তিনি মহকুমা শহর জামালপুরে প্রথম পৌরসভা নির্বাচনে দেওয়াল ঘড়ি প্রতীকে চেয়ারম্যান (মেয়র) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এ নির্বাচনে তিনি মাত্র কয়েকটি ভোটের ব্যবধানে হেরে গেলেও জামালপুরের নানা সামাজিক কর্মকাণ্ডে তাঁর অংশগ্রহণ ছিল।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার জামালপুরের চন্দ্রায় ১৯৫৭ সালে সুপ্রাচীন বিরাটকায় হরিশচন্দ্রের দিঘি ক্রয় করে তা পুনরায় খনন ও সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য চাষ জনপ্রিয় করেন। উল্লেখ্য, হরিশচন্দ্র রাজার দিঘিটি ব্রিটিশ আমলে অ্যাকুয়ার্ড স্টেটের অধীনে চলে আসে। দীর্ঘকাল ধরে যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে মজা দিঘিতে পরিণত হয়। এই অবস্থায় অ্যাকুয়ার্ড স্টেট হরিশচন্দ্র রাজার দিঘিটি নিলামে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিলে রামনগরের দুইজন জনৈক ব্যক্তি ক্রয় করে নেন। তাদের নিকট থেকে ১৯৫৭ সালে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার এই দিঘিটি ক্রয় করেন।

এছাড়া বকশীগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী কুরখা ও ভরসা বিল দুটি সংস্কার করে কৃষিশস্যের চাষের উন্নতিতে অবদান রাখেন। মোটকথা, তিনি সারাজীবন ধরে জনদরদি ভূমিকায় অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পক্ষে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় দৃঢ় অবস্থানে ছিলেন। প্রতিবেশী বহু মুক্তিযোদ্ধাসহ অনেক হিন্দুকে নিরাপত্তাবিধানে সহযোগিতা করেছেন তিনি।

এ সময় তিনি নিজ সন্তানদেরকে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ ভালো করে রপ্ত করতে ও গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ডা. মির্জা আলী হায়দার ও কনিষ্ঠ পুত্র মির্জা

হোসেইন হায়দার থ্রি নট থ্রি রাইফেল, হাতবোমা নিক্ষেপ করাসহ কয়েক ধরনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার-এর কীর্তিকথা এ অঞ্চলের প্রবীণদের মুখে এখনো শোনা যায় এবং স্থানীয় ইতিহাসের বিভিন্ন পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাঁকে এতদঞ্চলের মানুষ শ্রদ্ধাভরে মির্জা সাহেব বলে সম্বোধন করতেন। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের অবদানের পরিপ্রেক্ষিতে জামালপুর হাইস্কুলের অডিটোরিয়ামটি তাঁর নামে নামকরণ ও প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

তাঁর স্মৃতিকে জাগরূক রাখার জন্য সন্তানরা 'মির্জা হায়দার আমেনা মির্জা ফাউন্ডেশন' গড়ে তুলেছেন। এই প্রতিষ্ঠান সমাজের জন্য নানা সেবামূলক কাজ করছে। তবুও তাঁর স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য জামালপুর শহরের প্রধান একটি রাস্তার নামকরণ করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে জামালপুর জেলার জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা প্রশাসক এবং পৌরসভার মেয়রসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। তা না হলে সময়ের স্রোতে এ কীর্তিমান ব্যক্তির নাম, স্মৃতিচিহ্ন হারিয়ে যাবে। নতুন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরের সন্তানেরা এ ইতিহাস ও ঐতিহ্য জানতে পারবে না। ফলে জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, জাতীয় জীবন বাধাগ্রস্ত হবে।

উল্লেখ্য, বাংলা একাডেমির 'লোকজ-সংস্কৃতি গ্রন্থমালা : জামালপুর' গ্রন্থে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের নামে একটি ভুক্তি আছে এবং সেখানে তার ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের ইতিহাসসহ সমাজসেবার অবদান উল্লেখ করা হয়েছে।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ১৯৮৫ সালের ১০ই জুন ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক কন্যা ও দুই পুত্রসন্তান রেখে যান। তাঁর স্ত্রীর নাম আমেনা খাতুন (মৃত্যু. ০৯.১১.২০০৯)।

তাঁর পুত্র-কন্যা-পৌত্ররাও কীর্তিমান। তাঁর মামাতো ভাই আজিজুর রহমান নান্না মিয়া অবিভক্ত বাংলার আইন সভার সদস্য (এমএলসি) ছিলেন। তাঁর কন্যা কানিজ ফাতেমার সঙ্গে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবুল ফজল মোহাম্মদ আহসান উদ্দিন চৌধুরীর (১৯১৫-২০০১) বিবাহ হয়।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার পুত্র-কন্যাদের উচ্চ শিক্ষা দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁর কন্যা আনজুমান আরা জামান (জন্ম. ০৪.১১.১৯৪৪; মৃত্যু. ০৯.০৬.২০১২) ছিলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ১৯৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ ডিগ্রিধারী। তিনি বৃহত্তর জামালপুরে নারীদের মধ্যে প্রথম মুসলিম নারী হিসেবে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন।

তিনি সংস্কৃতিমান ও রুচিশীল মানুষ ছিলেন। নানা সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন। কবিতা লিখতেন। তার দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থ দুটি হলো

'সোনামনিদের ছড়া' (২০০৫), 'মনের মতো ছড়া' (২০০৬)। তাঁর 'সোনামনিদের ছড়া' গ্রন্থটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন কবি, গীতিকার খোশনূর।

'মনের মতো ছড়া' বইটির প্রচ্ছদ অলংকরণ করেছেন শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী এবং ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী গ্রন্থটির প্রশংসা করেছেন। পাঞ্জাব থেকে বিডিএস ডিগ্রি অর্জনকারী পূর্বপাকিস্তান, বর্তমানে বাংলাদেশের দন্তের পৃথিকৃৎ চিকিৎসক সার্জন ফখরুজ্জামানের (মৃত্যু. ১২.০৩.১৯৯৯) (এফ জামান) সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। (তথ্যসূত্র : আমার দেশ আমার জীবন : সৈয়দ আব্দুস সাত্তার, পৃ. ১৮)।

তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ডা. মির্জা আলী হায়দার বাংলাদেশের প্রখ্যাত দন্ত চিকিৎসক। তিনি ছিলেন দন্ত চিকিৎসক সমাজের অতিপ্রিয় মুখ। তিনি ইউনিভার্সিটি ডেন্টাল কলেজের ডিএমসিআর ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ ডেন্টাল কলেজ এসোসিয়েশনের সভাপতি এবং স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার ছিলেন। তিনি ২০১৭ সালের ২২শে মার্চ ইন্তেকাল করেন। তার স্ত্রী ডা. হোসনে আরা বেগম ইউনিভার্সিটি ডেন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ এবং উক্ত কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের কনিষ্ঠ পুত্র মির্জা হোসেইন হায়দার (জন্ম. ১৯৫৪) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের অন্যতম জ্যেষ্ঠ বিচারক ছিলেন। বিচারপতি পদে আসীন হওয়ার পূর্বে তিনি প্রায় বাইশ বছরের বেশি সময় আইন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। আইনজীবী হিসেবে তিনি যেমন খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তেমনি বিচারক হিসেবেও প্রজ্ঞা ও ন্যায়নীতির জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি বিশ বছর বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

কর্মক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনন্য বিচারক। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭৩-১৯৭৪ সেশনে চালু হওয়া প্রথম এলএল.বি. অনার্স ও পরে এলএল.এম. কোর্সের প্রথম ব্যাচের ছাত্র। এই কোর্সের উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তিনিই প্রথম বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। বিচারপতি থাকাকালীন তিনি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ অনেক মামলার ঐতিহাসিক এবং সময়োপযোগী রায় দিয়েছেন।

তিনি হাইকোর্ট বিভাগে আইনজীবী হিসেবে কাজ শুরু করেন ১৯৮১ সালে। খ্যাতনামা আইনজীবী খন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমদের (১৯২৫-২০১৪) সঙ্গে জুনিয়র হিসেবে কাজ করার দুর্লভ সুযোগ লাভ করেন তিনি।

(তথ্যসূত্র : বকশীগঞ্জের ইতিকথা ও লোকসংস্কৃতি, পৃ. ৮৬-৮৭)

বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার ২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০২১ সালে আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর স্ত্রী অ্যাডভোকেট

সাদিয়া রওশন জাহান বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের খ্যাতিমান আইনজীবী এবং বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতির (সংক্ষেপে BELA) নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের পরিবারের বৈশিষ্ট্য খুব কম পরিবারেই দেখা যায়। পাক-ভারত উপমহাদেশে এরকম অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটদের জীবন ও কর্মের ওপর গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

বর্তমানে বাংলাদেশে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের মতো প্রগতিশীল চিন্তাধারাটি বিলুপ্ত হতে বসেছে। এসব অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটদের বিচার প্রক্রিয়া দেশের বিচার বিভাগের ইতিহাস ও ঐতিহ্য।

এরকম বেশ কজন অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট এদেশে রয়েছেন–যাঁদের কর্ম ও চিন্তাধারা এ দেশের জাতীয় ইতিহাসের অংশ। যাঁরা নিজ নিজ অঞ্চলে নেতাজি-গান্ধীজি-চিত্তরঞ্জন দাশের আদর্শে অটল থেকে কাজ করে গেছেন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে।

তাঁদের নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে এক সময়ের অবহেলিত ও অনুন্নত দেশ এখন সমৃদ্ধ এবং উন্নত বাংলাদেশের পথে প্রাগ্রসরমান। বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের জীবন, কর্ম ও চিন্তাধারা এবং তাঁর মতো এ দেশে উপেক্ষিত এবং বিস্মৃত প্রায় অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট বা জাস্টিস অভ দি পিস'রা বিচার বিভাগের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।*

(এ লেখাটি তৈরিতে বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দারকে কয়েকটি তথ্য প্রদানে সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।)

*এ লেখাটি ২০২২ সালের ২৮শে এপ্রিল অনলাইন নিউজপোর্টাল লইয়ার্স ক্লাব বাংলাদেশ.কম-এ প্রকাশিত হয়।

অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট পদের কার্য ও গুরুত্ব : এ পদে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের কৃতিত্বের মূল্যায়ন

শাহ্ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট (Honorary Magistrate) বা অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট একটি ঐতিহ্যবাহী ও অতি পুরোনো পদ। ব্রিটিশ ভারত উপমহাদেশে এ পদটি ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থা থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। এ পদধারীগণ সমাজে অত্যন্ত সম্মানীয় বলে বিবেচিত হয়।

জানা যায়, স্থানীয় বা মফস্বল এলাকার কল্যাণের জন্য ১৭২৬ সালে এ পদের সৃষ্টি হয়। অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট পদটিকে জাস্টিস অভ দি পিস (Justice of the Peace)ও বলা হয়। অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটগণের ক্ষমতা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির হয়। তাঁদের প্রজ্ঞাপনমূলে নিয়োগপত্রে ম্যাজিস্ট্রেসির ক্ষমতার শ্রেণি উল্লেখ থাকে। অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটগণের কোর্টকে অনারারি ফৌজদারি কোর্ট বা অনারারি কোর্ট বলে। অনারারি কোর্টে ন্যূনতম ১ জন সাব ইন্সপেক্টর, ১ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর ও ৩ জন পুলিশ থাকে।

উল্লেখ্য, অনারারি কোর্টের সাংগঠনিক লোকবলের এই সংখ্যাটি তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার মধ্যে সর্বপ্রথম অনারারি কোর্ট শেরপুরের (তখন থানা); এখানে ব্রিটিশ শাসনামলের উনিশ শতকের সত্তর দশকে অনারারি কোর্ট ও এ কোর্টের অধীনে দুটি বেঞ্চ চালু হয় এবং তা বিশ শতকের সত্তর দশক পর্যন্ত চলমান ছিল।

এখানকার অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটগণ অত্যন্ত বিচক্ষণতার ও দক্ষতার সাথে ছোটখাটো ফৌজদারি মামলা বিচার করতেন যে, জামালপুর মহকুমার হাকিম এতদঞ্চলের কোনো মামলা পেতেন না।

[তথ্যসূত্র : ময়মনসিংহের ইতিহাস : কেদারনাথ মজুমদার ও অন্যান্য। দেজ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ : ২০০৫ , পৃষ্ঠা : ৭২০]

স্থানীয় অঞ্চলের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট বা জাস্টিস অভ দি পিস'রা পদাধিকার (Ex-officio) অনুযায়ী এ পদে মনোনীত নন, তারা উক্ত পদে The Code of Criminal Procedure, ১৮৯৮-এর ২২ ধারার বিধান মোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত। এ পদে তাঁদের নিয়োগ সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তি আকারে জারি করা হয়। ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের ২২ ধারায় বলা হয়েছে :

> Justice of the Peace for the mafassal-The Government may, by notification in the official gazette, appoint such persons resident within Bangladesh and not being the subject of any foreign State as

> it thinks fit to be justice of the Peace within and for the local area mentioned in such notification.

আইনের প্রখ্যাত ভাষ্যকার গাজী শামছুর রহমান (১৯২১-১৯৯৮) তাঁর 'ফৌজদারী কার্যবিধির ভাষ্য' (১৯৯৪) গ্রন্থে এ আইনের ২২ ধারার ভাষ্যে লিখেছেন :

> জাস্টিস অব দি পিস্ কি দায়িত্ব প্রতিপালন করেন এবং তার অধিকার ও ক্ষমতা কি, সে সব বিষয়ে ফৌজাদরী কার্যবিধিতে কোন বিধান নেই। বিশেষ আইন দ্বারা তাদের দায়িত্ব ও অধিকার নির্ণীত হয়। নিয়োগপত্রে তাদের কর্তব্য এবং অধিকারের বর্ণনা দেয়া যেতে পারে।

[উদ্ধৃতি : ফৌজদারী কার্যবিধির ভাষ্য : গাজী শামছুর রহমান, খোশরোজ কিতাব মহল, চতুর্থ সংস্করণ : ১৯৯৪, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৩৭]

আইন কমিশন থেকে প্রকাশিত 'আইন-শব্দকোষ' (২০২০) গ্রন্থে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট বা জাস্টিস অভ দি পিস সম্বন্ধে বলা হয়েছে :

> The Code of Criminal Procedure, ১৮৯৮-এর ২২ ধারা অনুসারে সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া বাংলাদেশের বাসিন্দা ও কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিক নহেন, এইরূপ যে-কোনো ব্যাক্তিকে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত কোনো স্থানীয় এলাকার জাস্টিস অভ দি পিস বা অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করা যাইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে নিয়োগপত্রে তাঁহাদের কর্তব্য ও অধিকারের বর্ণনা দেওয়া হইয়া থাকে।

[উদ্ধৃতি : আইন-শব্দকোষ : বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক ও অন্যান্য, আইন কমিশন, দ্বিতীয় সংস্করণ : মার্চ ২০২০, পৃষ্ঠা ৬৮৬]

ব্রিটিশ শাসিত ভারত উপমহাদেশে, পরবর্তীকালে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলেও মফস্বল স্থানীয় এলাকায় আইনের শাসন এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটগণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানকালেও অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট পদের কার্য ও এ পদের গুরুত্ব অপরিসীম।

অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটগণ তাঁদের নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের মধ্যে দিবারাত্রি আইন ও ন্যায়বিচার লঙ্ঘন সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রাখেন। অধিক্ষেত্রের মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা বা শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা থাকলে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটগণ প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন এবং আইন-শৃঙ্খলা যথাযথভাবে পালনের জন্য নির্দেশ দিয়ে আদেশ জারি করেন। এ পদটির গুরুত্ব ও কাজ এখনো প্রাসঙ্গিক।

অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটগণ তাঁর নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের ক্ষমতা অনুযায়ী ১টি বা ২টি বেঞ্চের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। তাঁরা এজাহার গ্রহণ করা, অন্য বিচারকের নিকট রেকর্ড দেওয়ার ক্ষমতা, সোপর্দ বা বিচারার্থে প্রেরণ করা, সরাসরি বিচারের ক্ষমতা, বিশেষ করে ফৌজদারি কার্যবিধির ১১০ ধারার বিচারের ক্ষমতাসহ অনেক ছোটখাটো এবং লঘু অপরাধের ফৌজদারি বিচারকার্য সম্পন্ন করেন।

[তথ্যসূত্র : ময়মনসিংহের ইতিহাস। প্রাগুক্ত। পৃ. ৭১৯-৭২০]

উল্লেখ্য, ফৌজদারি কার্যবিধির ২২ ধারার বিধান অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটগণের কার্যাবলি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট করে কোনো বিধান ফৌজদারি কার্যবিধি বা অন্য কোনো আইনে নেই। এজন্য তাঁদের প্রজ্ঞাপনমূলে নিয়োগপত্রের শর্তাদিতে বিশেষ আইনে উল্লেখিত থাকে। ব্রিটিশ আমল থেকে বাংলাদেশ আমলেও এদেশের মানুষ অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটগণের বিচারিক অধিক্ষেত্রের কার্যাবলি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছিল। এ বিষয়ে ফৌজদারি আদালতের নথিপত্র থেকে অনেক তথ্যাদি জানা যায়।

তাঁরা সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ বা পুলিশের প্রদত্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বা অপরাধ সংঘটনে নিজেদের প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কোনো অপরাধ আমলে নিতে পারেন এবং বিচারিক কার্য সমাধা করেন। তবে অদ্যাবধি ফৌজদারি কার্যবিধির ২২ ধারায় অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট-এর ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা বা প্রসারতার বিষয়ে কোনো বিধিবিধান উল্লেখ করা হয়নি। এ কারণে ফৌজদারি কার্যবিধির উক্ত ধারার বিধান মোতাবেক বিধি প্রণয়ন করে তাঁদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

এক্ষেত্রে উক্ত ধারাটি সংশোধনপূর্বক তাঁদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি নির্ধারণ করে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের বিধানটি এখনো স্থানীয় এলাকাতে জারি করা যায়। এই পদটি স্থানীয় এলাকায় যোগ্য ব্যক্তিদেরকে অর্পণ করা গেলে অনেক কল্যাণ বয়ে আনবে। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতেও ফৌজদারি কার্যবিধির অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের ধারাটির প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। এ পদটি স্থানীয় বা মফস্বল এলাকায় যোগ্য ব্যক্তিদেরকে প্রদান করা গেলে বা জারি হলে দেশের অভ্যন্তরে ছোটখাটো বহু ফৌজদারি মামলা দায়েরের সংখ্যা কমবে।

সুতরাং অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট পদটি এখনো প্রয়োজনীয় ও সময়োচিত। এ পদের গুরুত্ব প্রয়োজনীয়তা বর্তমান সময়েও উপেক্ষা করা যায় না।

ব্রিটিশ ভারত উপমহাদেশে বেশ কজন অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট এদেশের সামাজিক রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। তাঁরা এদেশের ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনেও অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। আজকের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্র তাঁদের অবদানের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তাঁরা আজ আর কেউ জীবিত নেই।

এই পরিপ্রেক্ষিতে এ সমস্ত অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটদের জীবন-কর্মের মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। তাঁরা এদেশের জাতীয় ইতিহাসের বিরাট এক অংশ। বর্তমান প্রজন্ম অনেকেরই অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট পদধারী ওইসব ব্যক্তির কর্ম সম্পর্কে ধারণা নেই। অথচ তাঁদেরই উত্তরাধিকারী বর্তমান বা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, তারা তাঁদেরকে না চিনলে বা না জানলে ক্ষতি তাদেরই।

আজকের বা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পথকে উজ্জ্বল করার জন্য ঐ সমস্ত অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটরা হলেন পথপ্রদর্শক, তাঁদের নিকট জাতির ঋণের শেষ নেই। তাঁদের সম্বন্ধে জানা অপরিহার্য প্রয়োজন। এদেশের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অগ্রগামী কর্মী, ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহের তিনটা ঐতিহাসিক সময়-কালের মানুষ মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার (১৯০৫-১৯৮৫) হলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন একাধারে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামী, সাংবাদিক, লেখক ও ক্রীড়াবিদ এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতি আস্থাশীল অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন উদারপন্থি ব্যক্তি।

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রগতিশীল সব আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন তিনি। মানবকল্যাণই ছিল তাঁর আদর্শ। কোনো আন্দোলনে তিনি সরাসরি সক্রিয়ভাবে এবং কোনো কোনো আন্দোলনের পক্ষে দৃঢ় অবস্থানে থেকে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছেন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন-মহান ভাষা আন্দোলন-মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা যত সামান্যই হউক না কেন চেতনাগত ও তাৎপর্যের বিবেচনায় তা অসাধারণ এবং চিরন্তনতার দাবি রাখে।

তিনি বিশ শতকের চল্লিশ ও সত্তর দশকে দুইবার তৎকালীন জামালপুর মহকুমার সে সময়কার শেরপুর থানার এবং পরবর্তীকালে জামালপুর জেলার শেরপুর থানার (বর্তমানে জেলা) প্রথম শ্রেণির অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।

উল্লেখ্য, ব্রিটিশ ভারতের বৃহত্তম জেলা ময়মনসিংহের শেরপুর থানায় উনিশ শতকের সত্তর দশকে সর্বপ্রথম অনারারি কোর্ট চালু হয়েছিল। এ অঞ্চলে প্রথম শ্রেণির ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের এবং তাঁর অধীনে নিয়মিত ২টি বেঞ্চ অনেক বছর ধরে চলেছিল। বর্তমান শেরপুর জেলার ফৌজদারি আদালত ঐতিহ্যবাহী অনারারি কোর্টের উত্তরাধিকার বহন করছে।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারকে ঐতিহ্যবাহী তৎকালীন শেরপুর থানার অনারারি কোর্ট ও নিয়মিত দুটি বেঞ্চের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে এতদঞ্চলের ফৌজদারি মামলার ভার অর্পণ করা হলে, তিনি সুষ্ঠু ও ন্যায়বিচার করেন। অনেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁর প্রতি বিচারের ভার দিলে তা তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে নিরপেক্ষভাবে নিষ্পত্তি করে দিতেন।

এতদঞ্চলের ছোটখাটো বিরোধ তিনি ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে উভয় পক্ষের লোকদের ডেকে সালিশির মাধ্যমে বিষয়টির সুষ্ঠু মীমাংসা করে দিতেন। তাঁর এ ব্যবস্থা সরকারের ব্যবস্থার মতোই কার্যকর হতো। তিনি অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে তৎকালীন জিলা ও মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেটকে ফৌজদারি মামলার নিরপেক্ষ রিপোর্ট প্রদান করতেন। একজন নিরপেক্ষ অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে সমকালে তাঁর খ্যাতি ছিল।

এ কারণে সমকালের জিলা ও মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটসহ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের নিকট তাঁর উচ্চ মর্যাদা ছিল। এই অভিজ্ঞতাই পরবর্তীকালে তাঁর দ্বারা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কল্যাণকর কাজ সম্পন্ন করতে সহজ হয়।

অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য ছাড়াও মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের মূল্যায়নের ধারা বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

পারিবারিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, ব্রিটিশ সরকার সমকালে তাঁকে ইউনিয়ন বোর্ড (বর্তমান ইউনিয়ন কাউন্সিল), বেঞ্চ কোর্ট ও স্পেশাল ঋণ শালিশি বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করে। তিনি সুষ্ঠু ও সফলভাবে সেসব দায়িত্ব পালন করেছিলেন। উল্লেখ্য, ঋণগ্রস্ত কৃষককুলকে সাহায্য করার জন্য ১৯৩৬ সালের ৭ নম্বর আইনের অধীনে ঋণ সালিশি বোর্ড স্থাপিত হয়।

এই বোর্ড পাঁচ বছরের জন্য স্থাপিত হয়েছিল এবং পরে এর কার্যকাল আরও দু বছরের জন্য বাড়ানো হয়। তৎকালীন জামালপুর মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি ঋণ সালিশি বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে ঋণগ্রস্ত কৃষক সমাজকে কিছুটা হলেও রক্ষা করেছিলেন।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার এদেশের প্রগতিশীল রাজনীতিতে বিরাট অবদান রেখেছেন। তিনি ব্রিটিশ বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে আজীবন সংগ্রামী ছিলেন। বিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকের দিকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের বহু ধরনের ঘটনা ঘটে–তিনি এসব ঘটনায় বিরাট ভূমিকা রেখেছেন। তিনি ছাত্রজীবনেই প্রগতিশীল ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন।

তাঁর সময়কালে জামালপুরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব খুব কম ছিল। জামালপুর ডনো হাইস্কুল (বর্তমানে জিলা স্কুল) ছাড়া আর কোনো স্কুলের অস্তিত্ব ছিল না। ময়মনসিংহ জিলা স্কুলই ছিল সে সময় একমাত্র ভরসা। তিনি এ স্কুলেই ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করতে থাকেন। তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। স্কুলের খেলাধুলা-সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় তাঁর সফল অংশগ্রহণ ছিল।

সে সময় ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অনেক কর্মীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তিনি বিপ্লবী যুগান্তর দলসহ প্রগতিশীল ছাত্র ও কংগ্রেসের সব আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েন। গান্ধীজির ডাকে অসহযোগ আন্দোলন তখন অবিভক্ত বাংলাসহ সারা ভারতবর্ষে তুঙ্গে। তিনি ছাত্রজীবন ত্যাগ করে গান্ধীজির আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সাড়া দেন। ফলে তাঁর পড়াশোনা বিঘ্ন ঘটে।

আসন্ন ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অংশ না নিয়ে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে দেশের ডাকে তিনি ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। রাজনৈতিকভাবে সচেতন ছিলেন তিনি। কংগ্রেসের কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ ও এ

অফিসে যাতায়াত করতেন তিনি। বিভিন্ন রাজনৈতিক কার্যকলাপে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল।

সভা, শোভাযাত্রা, হরতাল, বিক্ষোভ, প্রতিবাদ-প্রতিরোধে তিনি সোচ্চার ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিশ শতকের বিশ-ত্রিশ-চল্লিশ দশকের অবিভক্ত বাংলার প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। এদের মধ্যে অনেকেরই তিনি সান্নিধ্য লাভ করেছেন। এ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ হয়েছে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গী ছিলেন এবং বিভিন্ন মিছিল-মিটিং শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দিয়েছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের (১৮৭০-১৯২৫) রাজনীতির অনুরাগী ছিলেন তিনি। দেশবন্ধুকে তিনি তার রাজনৈতিক নেতা হিসেবে পরম শ্রদ্ধা করতেন।

মিছিল, শোভাযাত্রা, পিকেটিং করতে গিয়ে সঙ্গীসহ কয়েকবার সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ পুলিশের কাছে ধরা পড়েছেন, নির্যাতিত হয়েছেন এবং কয়েকবার সঙ্গীসহ তাকে পুলিশে গাড়িতে উঠানো হয়েছে। নির্যাতনের পর ছাড়া পেয়েছেন তিনি। এরকম একাধিকবার সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক সরকারের জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তিনি।

বিশ শতকের বিশের ত্রিশের ভারতবর্ষের বিক্ষুব্ধ সময়ের ঘটনাবলি তাঁকে আলোড়িত করেছিল। এ সময় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছিল। এর কারণ আর কিছু নয়, ইংরেজ সরকারের শাসন, শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়ন। এ সময় মহাত্মা গান্ধীর (১৮৬৯-১৯৪৮) নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলন অবিভক্ত বাংলাসহ সারা ভারতবর্ষে বেগবান হয়। সে সময় ভারতবর্ষের বিশেষ করে অবিভক্ত বাংলায় যে অগ্নিমূর্তি ধারণ করেছিল প্রথম বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫) সময়েও তা হয়নি।

এই অগ্নিযুগের চালচিত্র ঔপনিবেশিক দলিলপত্রে প্রমাণ পাওয়া যায়। ব্রিটিশরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবার পর এই সময়েই স্বাধীনতার জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে ওঠে। জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করে। সে সময় ব্রিটিশ সরকারের জোর-জুলুমের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ (১৯৩০) ও অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০-১৯২২) মুসলমান, হিন্দু, শিখ সকলেই অংশগ্রহণ করেছিল। অবিভক্ত বাংলাসহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী অমূল্য জীবন উৎসর্গ করেছেন।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ছাত্রাবস্থায় রাজনীতির সঙ্গে দীর্ঘ সময় যুক্ত থাকায় দীর্ঘ বিরতির পর আবার লেখাপড়া শুরু করে কিছুটা দেরিতে ম্যাট্রিক (১৯৩৯) (বর্তমানে এসএসসি) পাস করেন, শেরপুরের বর্তমানে গোবিন্দকুমার পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মতান্তরে বকশীগঞ্জের রূপজাহান পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে। অতঃপর

ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ থেকে আইএ (১৯৪১) (বর্তমানে এইচএসসি) এবং একই কলেজে বিএ (১৯৪২-৪৩) ক্লাসে ভর্তি হন।

এ সময় দেশে দুর্ভিক্ষ চলেছিল। এই দুর্ভিক্ষ ইংরেজি ১৯৪৩ এবং বাংলা ১৩৫০ সালে সংঘটিত হয়। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার এই পঞ্চাশে ঘটিত মন্বন্তরে ত্রাণকার্যে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। তিনি বিএ পরীক্ষার সন্নিকটের সময় একাডেমিক ডিগ্রির দিকে আগ্রহী না হয়ে ময়মনসিংহ অঞ্চলের ত্রাণকার্যের জেনারেল সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন।

এ দায়িত্ব পালনের কারণে কলেজ কর্তৃপক্ষ সেসময় আসন্ন বিএ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ না দিয়ে একতরফাভাবে তাঁকে অকৃতকার্য ঘোষণা করা হয় বলে পারিবারিক সূত্রে জানা যায়। পরে তিনি আবার লেখাপড়া করে এ কলেজ থেকেই বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

[তথ্যসূত্র : ময়মনসিংহের চরিতাভিধান : দরজি আবদুল ওয়াহাব, ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসন; প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৯, পৃ. ১৩৭]

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ১৯৪৬-পরবর্তীকালে মুসলিম লীগে যোগ দিলে এ দলের একজন প্রভাবশালী কর্মী হিসেবে পাকিস্তান আন্দোলনেও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।

[তথ্যসূত্র : ময়মনসিংহের চরিতাভিধান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭]

তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন দিয়েছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে যখন বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নের দ্বন্দ্ব সম্মুখে এসে দাঁড়াল তখন তিনি পূর্ব বাংলার গণমানুষের গণতান্ত্রিক চেতনার লড়াইয়ের পক্ষে ছিলেন বলে স্থানীয় প্রগতিশীলদের নিকট থেকে জানা যায়। ১৯৫২ সালে মহান ভাষা আন্দোলনে বাংলা ভাষার পক্ষে তাঁর দৃঢ় অবস্থান ছিল।

সেই সময়কার স্থানীয় সুধীজনের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যে ও পারিবারিক সূত্রে আরও জানা যায়, এতদঞ্চলে ভাষা আন্দোলন সকলের আন্দোলন ছিল। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ভাষা আন্দোলনে বাংলা ভাষার পক্ষে ছিলেন এবং রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে বাংলা ভাষার পক্ষে কাজ করেন। তিনি ভয়ডরহীনভাবে মাথা উঁচু করে চলতেন, কারও মন জুগিয়ে চলেননি কখনো।

এই অঞ্চলের সমকালের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট থেকে জানা গেছে, মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চালাকালে প্রবলভাবে পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করেন। এ সময় তিনি জামালপুর শহরের আমলাপাড়ার বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেন।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পক্ষে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা এবং সহানুভূতি ছিল। এতদঞ্চলের

বহু হিন্দুর নিরাপত্তাবিধান ও প্রতিবেশী অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি তার দুই পুত্রসন্তানকে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন।

বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোর কথা প্রসঙ্গে বলেন, "বড় ভাই (মির্জা আলী হায়দার) সাইন্সের ছাত্র ছিলেন। তিনি আশেক মাহমুদ কলেজের কেমিস্ট্রি ল্যাবের সরঞ্জামাদি দিয়ে হাত বোমা তৈরি করার প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন।

আমি ক্যাডেট কলেজের ছাত্র হওয়ায় থ্রি নট থ্রি রাইফেল চালানোর কৌশল জানা ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা দুই সহোদর এসব প্রশিক্ষণ দিয়েছিলাম।" এ সময় আব্বা বলতেন, "ভালো করে ট্রেনিংটা প্রদান করিও।"

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার জোতদার পরিবারের সন্তান হওয়ায় উত্তরাধিকারসূত্রেই প্রচুর ভূসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার করেছেন। সকল মানুষের মাঝেই তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল। তিনি ছিলেন বড় হৃদয়ের মানুষ। তৎকালীন জামালপুর অঞ্চলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকত।

তাঁর সমকালে এ অঞ্চলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব ছিল। এ অঞ্চলে কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজে অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি। তাঁর কর্মের মধ্যে এটাই তাঁর জীবনকে প্রোজ্জ্বল করে রয়েছে। তিনি বকশীগঞ্জের রূপজাহান পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, জামালপুর উচ্চ বিদ্যালয়, আশেক মাহমুদ কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং উদ্যোক্তা। এছাড়া অপরাপর প্রতিষ্ঠানেও শ্রম ও মেধা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন বলে পারিবারিক সূত্রে জানা যায়।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার এ অঞ্চলের মানুষের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। এলাকার মানুষ তাঁকে মির্জা সাহেব বলে সম্বোধন করত। এখনো তাঁর নাম মির্জা সাহেব বলে এ অঞ্চলের মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। তিনি জামালপুরের মানুষ, মাটিকে খুব ভালোবাসতেন। জানা যায়, তাঁর হাত ধরেই জামালপুর শহরে বিদ্যুৎ ও পানির সরবরাহ আসে।

তিনি ১৯৫৯ সালে জামালপুর শহরে বেসরকারিভাবে ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি, ওয়াটার ওয়ার্কস স্থাপনের অন্যতম উদ্যোক্তা। এসব নাগরিক সেবার মাধ্যমে এ শহরের পানি, বিজলি বাতির ব্যবস্থা করে বিরাট অবদান রেখেছেন তিনি।

তিনি ১৯৬০ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত জামালপুর পৌরসভার (প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৬৯) পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যান (বর্তমানে মেয়র) ছিলেন। উল্লেখ্য, সে সময় এদেশে বিতর্কিত মৌলিক গণতন্ত্রের বিধান জারি ছিল। সেই হিসেবে এ অঞ্চলের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট পদাধিকারবলে চেয়ারম্যান হতেন এবং ভাইস

চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন জনসাধারণ কর্তৃক সরাসরি ভোটে নির্বাচিত কমিশনারবৃন্দের (তখন মেম্বার, বর্তমানে কাউন্সিলর) ভোটে; দীর্ঘ পাঁচ বছর কাল তিনি উক্ত পদে আসীন থেকে অনেক উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন করেছেন।

সে সময় যুগ-সভ্যতার সেবা পৌর নাগরিকদের ঘরে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বভার দক্ষতার সাথে পালন করেছিলেন। তাঁর সময়ে বিভিন্ন দিকে পৌরসভার উন্নতি হয়েছে। শহরের পাবলিক লাইব্রেরি, স্টেডিয়াম, প্রতিষ্ঠায় তিনি উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেছেন।

তাঁর কর্মকালে ১৯৫৯ সালের বিতর্কিত মৌলিক গণতন্ত্র জারি থাকা সত্ত্বেও তিনি পৌরসভার প্রভূত উন্নয়নে অনেক মঞ্জুরি করে এনেছিলেন তা পৌরসভার নানা উন্নয়নের কর্মকাণ্ডের কাজে লাগিয়েছেন।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার এ অঞ্চলের অর্থনীতির উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। স্থানীয় এলিট ও সুধীজনদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, তিনি জামালপুর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের (সমকালের সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সমবায়ী সদস্যদের একটি অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান) প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। দি জামালপুর কমার্শিয়াল ট্রেনিং কলেজ নামে তিনি এখানে প্রথম টাইপিং শটহ্যান্ড এবং টেলিগ্রাফি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

তিনি সমকালে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সমবায়ী উদ্যোগে গড়ে তোলা অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান জামালপুর সাব ডিভিশন সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি লি.-এর ভাইস চেয়ারম্যান ও পূর্বপাকিস্তান কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন লি. এবং জামালপুর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লি.-এর ডিরেক্টর ছিলেন। সম্মিলিত উদ্যোগে গড়ে তোলা এসব প্রতিষ্ঠানের অন্যতম অগ্রণী ভূমিকা তিনিই রেখেছেন। তিনি এ অঞ্চলে সমবায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ।

জামালপুর মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করার পক্ষে তাঁর ভূমিকা উল্লেখ করার মতো। তিনি জামালপুর মহকুমাকে জেলা করার জন্য গঠিত নাগরিক কমিটির সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। জামালপুর শহরের রেল স্টেশনের নাম সিংহজানী জংশন হতে জামালপুর টাউন জংশন নাম পরিবর্তনে অন্যতম অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। ১৯৫৯ সালের বিতর্কিত মৌলিক গণতন্ত্রের আদর্শের বলে তদানীন্তন জিলা বোর্ডকে নতুন আঙ্গিকে ডিস্ট্রিক কাউন্সিল করা হলে তিনি ময়মনসিংহ ডিস্ট্রিক কাউন্সিলের (বর্তমানে জেলা পরিষদ) একজন প্রভাবশালী কাউন্সিলর হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের খেলাধুলায় সুনাম ছিল। তিনি একজন দক্ষ খেলোয়াড় ছিলেন। তখন এ অঞ্চলে ফুটবল, হাডুডু খেলায় সারা বছর মুখর থাকত। জাতীয় দলের ক্রীড়াবিদদের পদচারণা ছিল। তিনি জাতীয়, বিভাগীয়

পর্যায়ে ফুটবল খেলায় অংশ নিয়েছেন।

এ অঞ্চলে ফুটবল টিম নিয়ে আসা এবং তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে খেলাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। তখন এখানে তাঁর নেতৃত্বে কয়েকটি ফুটবল ক্লাব গড়ে উঠেছিল। তিনি এসব ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সংগঠন উন্নয়নে অবদান রাখেন। তিনি ফুটবলের অত্যন্ত অনুরাগী এবং ফুটবলপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। এ সম্পর্কে ২০১৫ সালের ১৬ই অক্টোবর 'কালের কণ্ঠ' পত্রিকার প্রকাশিত 'জেলার খেলা : জামালপুর : পেছনের মানুষ' শীর্ষক সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছে–জেনারেটর এনে জামালপুরে (ওয়াপদায়) প্রথমবার বিদ্যুৎ বাতি জ্বালিয়েছিলেন মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার। জেলার ক্রীড়াঙ্গনেও আলো জ্বালানোর কাজটা শুরু তার হাত দিয়ে।'

ব্রিটিশ ভারত উপমহাদেশের একাধিক ফুটবল ঐতিহ্যের গৌরব গাথার সাক্ষী ছিলেন তিনি। বাঙালি ফুটবলের গৌরবগাথা তিনি মুখে মুখে বলতে পারতেন। তাঁর সময়কার আন্তর্জাতিক ফুটবল দল ছিল ইংল্যান্ডের আইলিংটন কোরিন্থিয়ান। এ দলটি আধুনিক ফুটবলের পথিকৃৎ। পারিবারিকসূত্রে জানা যায়, এ দলের ঢাকার খেলাটির তিনি অতিথি দর্শক ছিলেন। ১৯৩৭ সালের ২১শে নভেম্বর পৃথিবী বিখ্যাত এ দলটির সাথে নবগঠিত ঢাকা স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন দলের এক খেলা হয়েছিল।

ঢাকার পল্টন মাঠের এ খেলায় ঢাকা কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ কলেজের কয়েকজন শিক্ষার্থী ছিল। এ খেলায় অংশ নেওয়া পাখি সেন (আসল নাম বি. সেন) তখন জগন্নাথ কলেজের ছাত্র। তিনি অলৌকিক একটি গোল করে বাঙালি দলের খেলোয়াড়দের বিজয় নিশ্চিত করেছিলেন।

এই খেলার একটি বিখ্যাত বর্ণনার অংশবিশেষ হলো : 'মন্টু ঘোষ বল নিয়ে দৌড়ুচ্ছেন। কোরিন্থিয়ানরাও ছুটছেন মন্টু ঘোষের পেছনে। মন্টু হঠাৎ বল ঠেলে দিলেন পেছনে দাঁড়ানো পাখি সেনকে। বিপক্ষ দলের কোনো খেলোয়াড় ছিলেন না তাঁর কাছে। গোলকিপারও বলের গতি আঁচ করতে পারেননি। পাখি সেন মওকামতো বল পেয়ে বল ঢুকিয়ে দিয়েছেন গোলে। ঢাকার মাঠের কয়েক হাজার দর্শকের সে কী উল্লাস! যেন আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে।'

[তথ্যসূত্র : 'দুনিয়া মাতানো বিশ্বকাপ' : শামসুজ্জামান খান, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৭, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১২]

বাঙালির ফুটবল গৌরব গাথার এটি স্মরণীয় ঘটনা। এ খেলায় ব্রিটিশ দল ঢাকা স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের কাছে পরাজয় বরণ করে। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ঐতিহাসিক এ খেলাটি অতিথি দর্শক হিসেবে সামনের সারিতে বসে দেখার স্মৃতি চলচ্চিত্র-নাটকের সংলাপের মতো মুখে মুখে বলতে পারতেন। ফুটবলের প্রসঙ্গ এলে তিনি এই স্মরণীয় খেলাটির কথা বলতেন। আজও অনেকে তাঁর নিকট থেকে শোনা এ খেলার আনন্দময় স্মৃতিচারণ করেন।

সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। তাঁর লেখালিখির হাত ছিল। বাংলা,

ইংরেজি, আরবি, ফার্সি ও উর্দু ভাষায় তাঁর দখল ছিল। তিনি কবিতা লিখতেন। উপন্যাস ও ভ্রমণকাহিনিও লিখেছেন। সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫০ সালে জামালপুর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'তওফিক' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি। ১৯৬৭ সালে 'ঝিনাই' নামে একটি সাহিত্য সাময়িকী অত্যন্ত দক্ষ হাতে সম্পাদনা তিনিই করেছিলেন।

[তথ্যসূত্র : রজতজয়ন্তী স্মরণিকা, জামালপুর জেলা; প্রকাশ : ২০০৩, পৃ. ৪৭]

তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন আমেনা প্রেস ও সমবায় প্রেসেরও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি। তাঁর আমেনা প্রেস থেকে গোলাম মোহাম্মদের 'বন্দিনী' নামক উপন্যাস এবং 'জামালপুরের গণ-ইতিবৃত্ত'সহ ঐ সময়কার এ অঞ্চলের অনেক কবি-সাহিত্যিক অনেক গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা এবং সাময়িকী প্রকাশিত হয়েছে। পাকিস্তানি দুঃশাসনের ষাটের বাঙালির গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ অঞ্চলের স্বাধিকার আন্দোলন-সংগ্রামের পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল, আইয়ুব বিরোধী জারি ও গণসংগীতের পুস্তিকা তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমবায় প্রেস ও অন্যান্য প্রেস থেকেই ছাপা হতো। উল্লেখ্য, তিনি সমবায় প্রেসেরও অত্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

তাঁর প্রেস ও পত্রিকা পাকিস্তানি শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে জনমত তৈরিতে ব্যাপক অবদান রেখেছে। বিশ শতকের পঞ্চাশ-ষাট-দশকের পূর্ববাংলার তৎকালীন প্রগতিশীল অনেক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও যোগাযোগ ছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের (১৯২০-১৯৭৫) সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও পরিচয় ছিল। এসব প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জামালপুরে এলে তাঁরা কোনো না কোনো সময় সমবায় প্রেসে ও তাঁর আমলাপাড়ার বাসায় এসেছেন।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের সাহিত্যচর্চা সাংবাদিক জীবনেই উন্মেষ ঘটেছিল। তাঁর রচিত দুটি গ্রন্থ–'আসামের জঙ্গলে' (ভ্রমণকাহিনি) ও উপন্যাস 'মায়ার ভিটা'–এ সম্পর্কে বিভিন্নগ্রন্থ ও পত্রপত্রিকায় বিবরণ পাওয়া যায়। প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া তাঁর লেখা অপ্রকাশিত হামদ-নাতসহ একটি কবিতার পাণ্ডুলিপি রয়েছে বলে তাঁর পরিবার সূত্রে জানা যায়। তিনি জামালপুর সাহিত্য সম্মেলন, ১৯৫৩ অনুষ্ঠানের সেক্রেটারি জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেছিলেন বলে জানা যায়।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার সৃষ্টিশীল, আলোকিত ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সন্তানদের যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি একজন সফল পিতা। তাঁর পুত্র-কন্যা-পৌত্রগণ কৃতী ও সফল। তাঁর কন্যা আনজুমান আরা জামান (জন্ম. ০৪.১১.১৯৪৪; মৃত্যু. ০৯.০৬.২০১২) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ১৯৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ ডিগ্রিধারী এবং তিনি ছিলেন জামালপুর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম নারীদের মধ্যে এমএ ডিগ্রিধারী প্রথম নারী।

বর্তমান বাংলাদেশের দন্তের পথিকৃৎ চিকিৎসক ফখরুজ্জামানের (মৃত্যু ১২.০৩.১৯৯৯) সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

আনজুমান আরার লেখালিখির হাত ছিল এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত ছিলেন। তাঁর দুটি মৌলিক ছড়ার বই প্রকাশিত হয়েছে। এই বই দুইটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী ও গীতিকবি খোশনূর। গ্রন্থদুটি হলো : 'সোনামনিদের ছড়া' (২০০৫) ও 'মনের মতো ছড়া' (২০০৮)। উল্লেখ্য, 'মনের মতো ছড়া' বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরণ শিল্পী ছিলেন কাইয়ুম চৌধুরী।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের জ্যেষ্ঠপুত্র ডা. মির্জা আলী হায়দার (মৃত্যু : ২২.০৩.২০১৭) ছিলেন প্রখ্যাত চিকিৎসক এবং ইউনিভার্সিটি ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতালের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি এবং বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার।

কনিষ্ঠপুত্র বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার (জন্ম ১৯৫৪) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের অন্যতম জ্যেষ্ঠ বিচারক (অবসর গ্রহণ : ২৮.০২.২০২২) ছিলেন। তিনি বিশ বছর বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন। বিচারপতি পদে আসীন হওয়ার পূর্বে তিনি প্রায় বিশ বছরের বেশি সময় আইন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। আইনজীবী হিসেবে তিনি যেমন খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তেমনি বিচারক হিসেবেও প্রজ্ঞা ও ন্যায়নীতির জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের পৌত্রী বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, লেখক সামাই হায়দার (জন্ম. ২৫শে মে ১৯৮৪) আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন পরিব্রাজক। তিনি অর্থনীতি-বিষয়ে উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করেন। তাঁর লেখালিখি, ভ্রমণ ও শিল্পসাহিত্যে প্রতি গভীর অনুরাগ রয়েছে। ভ্রমণবিষয়ে তিনি আন্তর্জাতিক পত্রপত্রিকা ও সাময়িকীতে নিয়মিত লেখেন।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ : 'টিলমান্ডস ট্রাভেল টেলস' (গুবা বুকস : ২০২০) বিখ্যাত। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের পরিবারের অপরাপর সদস্যগণও কীর্তিমান। এ পরিবারের অনেক সুসন্তানের জন্ম হয়েছে যাঁরা সমাজের নানাক্ষেত্রে অবদান রাখছেন।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের মূল্যায়নের জন্য একজন লোকের উপযুক্ত হওয়াই যথেষ্ট। অথচ দেখা যায় তাঁর সন্তান-সন্ততির মধ্যে কয়েকজন যোগ্যতার দিক থেকে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। বাংলাদেশে এরকম বৈশিষ্ট্যে খুব কম পরিবারেই রয়েছে। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের কৃতিত্বের মূল্যায়ন সম্পর্কে প্রখ্যাত সাংবাদিক এ.এ.কে. মাহমুদুল হাসান দারার [(জ. ১৯৩৫) দারামিয়া] উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন :

> 'মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার এতদঞ্চলের অত্যন্ত উঁচু মাপের সামাজিক মানুষ ছিলেন। শিল্প-সাহিত্যের সমঝদারি করতেন, একজন সংস্কৃতিমান মানুষ ছিলেন। তাঁর ছেলে-মেয়েরা যোগ্যতার দিক থেকে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। এই

> বৈশিষ্ট্য খুব কম পরিবারেই রয়েছে। আশরাফ উদ্দিন হায়দারের পরিবার সম্পর্কে বলে শেষ করা যাবে না।'

বর্তমানে তাঁর মতো প্রগতিমনস্ক ধারাটি লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছে, তাঁকে অনুসরণে তা আবার উজ্জীবিত হতে পারে।

এই বিখ্যাত ব্যক্তি ১০ই জুন ১৯৮৫ সালে ইন্তেকাল করেন। তিনি ১৯০৫ সালে তৎকালীন বৃহত্তর ময়মনসিংহের অন্তর্গত জামালপুর মহকুমার বকশীগঞ্জে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম জোতদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম মির্জা আসাদ উদ্দিন হায়দার ও মাতার নাম তৈবুন নেসা। তিনি ছিলেন দুই ভাই-বোনের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। তাঁর বোনটি অল্প বয়সে ইন্তেকাল করেন।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার একজন বড় মাপের ওজনদার ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সামাজিক মানুষ হয়েও এ অঞ্চলে তিনি বিপুলভাবে উপেক্ষিত, বিস্মৃত এবং অবহেলিত। তাঁর যথাযথ মূল্যায়ন আজও করা হয়নি। তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী প্রায় নীরবেই অতিক্রান্ত হয়, কেউ স্মরণ করে না তাঁর কর্মকীর্তিকে। অত্যন্ত দুঃখজনক এই যে, বর্তমান প্রজন্ম তাঁর নামও তেমন জানেন না। একটি জাতি বড় হয় অতীতকে জেনেই। অথচ প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলে যাচ্ছে, এক প্রজন্মের কর্ম অন্য প্রজন্মের কাছে পৌঁছানো যাচ্ছে না। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের কর্ম, চিন্তাধারা এ দেশের জাতীয় ইতিহাসের অংশ।

তাঁর জীবন ও কর্মের প্রাসঙ্গিকতা সমকালে যেমন ছিল বর্তমানকালেও অব্যাহত আছে এবং ভবিষ্যতেও তেমনি থাকবে। তিনি যে কাজ করেছেন সেজন্য তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান-মূল্যায়নের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। অন্তত জামালপুর শহরের একটি প্রধান সড়ক তাঁর নামে নামকরণ করার মাধ্যমে তাঁর স্মৃতিকে জাগরূক রাখা যায়।

শহরের একটি সড়ক 'মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার সড়ক' বা তাঁর স্মৃতিবিজড়িত শহরের আমলাপাড়ায় 'মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার স্মৃতিসড়ক' নামকরণের জন্য জামালপুরের জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, পৌরসভার মেয়র, জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্টদের প্রতি দাবি জানাই। তবেই আমরা শিক্ষিত জাতি হিসেবে গর্ব করতে পারব। বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ও তাঁর পরিবারের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।*

(লেখাটি তৈরিতে বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দারের নিকট থেকে দুষ্প্রাপ্য কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, এজন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।)

* এ লেখাটি ২০২২ সালের ২৮শে মে অনলাইন
নিউজপোর্টাল ল ইয়ার্স ক্লাব বাংলাদেশ.কম-এ প্রকাশিত হয়।

‘সাপ্তাহিক তওফিক’

ইতিহাসের অনালোচিত অধ্যায় ‘সাপ্তাহিক তওফিক’

সংবাদপত্র সভ্যতার অংশবিশেষ। বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশে জামালপুরের নামটি বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়ে থাকে। কারণ, জামালপুর থেকে বিশ শতকের পঞ্চাশ দশকে ‘সাপ্তাহিক তওফিক’ পত্রিকা প্রকাশিত হতো। পত্রিকাটিতে আনজুমান আরা জামান, প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ, গোলাম মোহাম্মদ, আলী আছাদ, সি এম শফি সামি (তখন ৭ম শ্রেণিতে পড়ত, পরবর্তীকালে পররাষ্ট্র সচিব), মোঃ শামসুল হুদা প্রমুখ লিখতেন। সংবাদপত্র পাঠ না করলে কারও জ্ঞান ও শিক্ষা পূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারে না। সুতরাং জাতীয় জীবনে সংবাদপত্রের শিক্ষা অপরিসীম। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সমাজসেবা ও সমাজ সংস্কার প্রভৃতি ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের দান অতুলনীয়। এটি সরকারের সঙ্গে জনগণের সংযোগ সাধন করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে জামালপুর জেলার পত্রপত্রিকা প্রকাশ, সাংবাদিকতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে মির্জা সাহেব একটি অনন্য নাম। এ জেলার মফস্বল সাংবাদিকতা, সংবাদপত্র প্রকাশের ইতিহাস লিখতে গেলে তার নাম আসবেই। এ প্রসঙ্গে ২০২১ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত ‘যুগান্তরে’র সাহিত্য সাময়িকীতে জামালপুর জেলার সাহিত্য নিয়ে বিশেষ আয়োজনে সাযযাদ আনসারী তার ‘জামালপুরের সাহিত্য যুগে যুগে’ প্রবন্ধে লিখেছেন :

> বঙ্গ লক্ষ্মী প্রেসটির স্বত্বাধিকারী হন মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার। তিনি তৌফিক [তওফিক] নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতেন।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের (১৯০৫-১৯৮৫) সম্পাদনা ও প্রকাশনায় তার আমেনা প্রেসে মুদ্রিত ‘সাপ্তাহিক তওফিক’ লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই জামালপুর মহকুমার বাংলা ভাষাভাষী মানুষের জাগরণের কালে তাদের মেধা, মনন, শিল্প, সাহিত্য ও রাজনীতির বিকাশে ভূমিকা পালন করে। এই পত্রিকা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা লাভের কয়েক বছর পরে ১৯৫০ সালে জামালপুর থেকে প্রকাশিত হয়। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ‘তওফিক’ পত্রিকার একাধারে সম্পাদক, মুদ্রক ও প্রকাশক ছিলেন।

‘তওফিক’ পত্রিকাটি সপ্তাহে একবার প্রকাশিত হতো। জামালপুর শহরের মিঞা বাড়ির বাসিন্দা সৈয়দ এ.এম ছাকেবুদ্দীন নিকট থেকে ‘তওফিকে’র যে কয়টি সংখ্যা সংগ্রহ করা হয়েছে তন্মধ্যে ষষ্ঠ বর্ষের ১৮০তম সংখ্যার প্রকাশ কাল ২১শে মার্চ ১৯৫৫, মূল্য ১ আনা ছয় পয়সা। এটি বড় আকারের পত্রিকা (ডবল ডিমাই) এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ অর্থাৎ ৪ পাতা।

'তওফিক' ছিল সমকালের অন্যান্য পত্রিকা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়' ক্রমেই যখন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মোহ ভাঙল তখন এই পত্রিকা ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪'র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৫'র আবু হোসেন সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকা রেখেছে। এ কারণে তৎকালীন সরকার এই পত্রিকাটির ডিক্লারেশন বাতিল করে। এই প্রসঙ্গে আলোচ্য পত্রিকার মেক-আপ সম্পর্কে কিছু কথা বর্ণনা করা প্রণিধানযোগ্য।

উল্লেখ্য, তওফিকের কভার পেজের প্রতিটি সংখ্যার বাম দিকের শিরোদেশে কুরআনের সূরা আত-ত্বিনের ৪ নং আয়াত 'নিশ্চয়ই মানুষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানিত জীব' এই কথা মুদ্রিত থাকত। এই বাণীর নিচে থাকত 'তওফিক জামালপুরের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার ডালা বহন করে' এবং ডান দিকের শিরোদেশে থাকত পবিত্র কুরআনের সুরা আল-আহযাবের ২১ নং আয়াত 'নিশ্চয়ই রছুলুল্লাহ তোমাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ'।

ঠিক এই বাণীর নিচে মুদ্রিত থাকত 'তওফিক জামালপুরবাসীর অভাব অভিযোগের দাবি পেশ করে'। তওফিক-এর প্রতিটি সংখ্যার কাঠের হ্যান্ডসেটে সাপ্তাহিক তওফিক ইংরেজিতে THE WEEKLY TOWFIQ ও তার নিচে 'জামালপুর পাবলিকের মুখপত্র' কথাটি মুদ্রিত থাকত এবং এটির নিচে সম্পাদক হিসেবে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের স্বাক্ষর মুদ্রিত হতে দেখা যায়। তওফিকের সবার উপরে সমকালের তদানীন্তন নিখিল পাকিস্তানের চাঁদ তারা পতাকার ছবি মুদ্রিত হতে দেখা যায়। তওফিক-এর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ছিল–ডিএ ১৩৯।

আলোচ্য পত্রিকাটি সম্পর্কে জামালপুরের বিদ্বৎসমাজের আগ্রহ ও অনুরোধে সংগৃহীত এ পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যার প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদ, ফিচার প্রভৃতি নিম্নে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হলো।

নিম্নে আলোকচিত্র সংবাদের কম্পিউটারে টাইপকৃত পাঠোদ্ধার নিম্নরূপ :

পূর্ব্ববঙ্গে পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা আরও কয়েক দিনের জন্য স্থগিত।
প্রধান মন্ত্রীর সদলবলে করাচী প্রত্যাবর্ত্তণ বর্ত্তমান মাসের শেষের দিকে পার্লামেন্টার শাসন ব্যবস্থার কায়েম হইবার আভাষ দান।

প্রধান মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আলী রাষ্ট্র সচিব জেনারেল ইসকান্দর মীর্জা, স্বাস্থ্য সচিব জনাব আবু হোসেন সরকার সহ বিগত ৫ দিন ঢাকায় অবস্থাণ করিয়া করাচী ফিরিয়া গেলেন।

তিনি সকল মহলের সহিত বর্ত্তমান পরিস্থিতি আলাপ আলোচনা করেন এবং তাঁহার আগমন আংশিক ভাবে সফল হইয়াছে বলেন। এই মাসের শেষের দিকে তিনি পুনরায় ঢাকায় আসিবেন এবং পার্লামেন্টারী শাসন প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা নাকি করিবেন বলিয়া প্রকাশ। পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা আরও কয়েকদিনের জন্য স্থগিত হওয়ায় সকলের দৃষ্টি এখন করাচীর দিকে সিমাবদ্ধ রহিল।

৩

নিশ্চয় মানুষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানিত জীব।
—কোরান

তওফিক—
জামালপুরের আশা আকাঙ্ক্ষার ডালা বহন করে।

তওফিকের জন্য এজেন্ট আবশ্যক।

Regd No. D A—139

সাপ্তাহিক

তওফিক

THE WEEKLY TOWFIQ

জামালপুর পাবলিকের শক্তিশালী মুখপত্র।

নিশ্চয় রছুলল্লাহ তোমাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ।
—কোরান

তওফিক—
জামালপুরবাসীর অভাব অভিযোগের দাবী পেশ করে।

পুরাতন সংখ্যা ।০
বার্ষিক ৫৲ টাকা
সডাক।

জামালপুর
ময়মনসিংহ।

সম্পাদক ঃ

সহ : সম্পাদক :
আলী এশরাক

৬ষ্ঠ বর্ষ ১৮০ সংখ্যা ৭২ ... সোমবার, : ২১শে মার্চ্চ, ১৯৫৫ সন মূল্য প্রতি সংখ্যা /৬ পয়সা

পূর্ব্ববঙ্গে পার্লামেণ্টারী শাসন ব্যবস্থা আরও কয়েক দিনের জন্য স্থগিত।

প্রধান মন্ত্রীর সদলবলে করাচী প্রত্যাবর্ত্তণ বর্ত্তমান মাসের শেষের দিকে পার্লামেণ্টারী শাসন ব্যবস্থার কায়েম হইবার আভাষ দান।

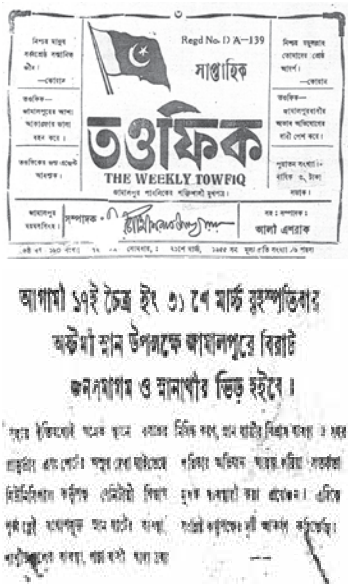
প্রধান মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আলী রাষ্ট্র সচিব জেনারেল ইসকান্দর মীর্জ্জা, স্বাস্থ্য সচিব জনাব আবু হোসেন সরকার সহ বিগত ৫ দিন ঢাকায় অবস্থাণ করিয়া করাচী ফিরিয়া গেলেন।

তিনি সকল মহলের সহিত বর্ত্তমান পরিস্থিতি আলাপ আলোচনা করেন এবং তাঁহার আগমন আংশিক ভাবে সফল হইয়াছে বলেন। এই মাসের শেষের দিকে তিনি পুনরায় ঢাকায় আসিবেন এবং পার্লামেণ্টারী শাসন প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা নাকি করিবেন বলিয়া প্রকাশ। পার্লামেণ্টারী শাসন ব্যবস্থা আরও কয়েকদিনের জন্য স্থগিত হওয়ায় সকলের দৃষ্টি এখন করাচীর দিকে সিমাবদ্ধ রহিল।

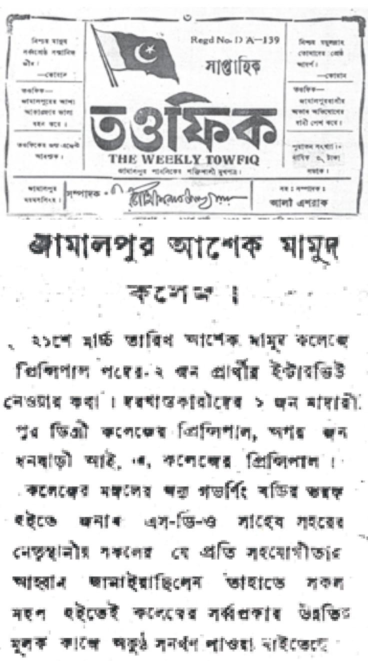
আলোকচিত্র সংবাদের কম্পিউটারে টাইপকৃত পাঠোদ্ধার নিম্নরূপ :

আগামী ১৭ই চৈত্র ইং ৩১শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার অষ্টমী স্নান উপলক্ষে জামালপুরে বিরাট জনসমাগম ও স্নানার্থীর ভিড় হইবে।

সহরে ইতিমধ্যেই অনেক স্থানে বসন্তের প্রাদুর্ভাব এবং পেটের অসুখ দেখা যাইতেছে মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষ সেনিটারী বিভাগ পূর্ব্বাহ্নেই যথোপযুক্ত স্নান ঘাটের ব্যবস্থা, পাণীয়জলের ব্যবস্থা, পচা বাসী খাদ্য দ্রব্য নিষিদ্ধ করণ, স্নান যাত্রীর বিশ্রাম ব্যবস্থা ও সহর পরিষ্কার অভিযান আরম্ভ করিয়া সতর্কতা মূলক ব্যাবস্থাদী করা প্রয়োজন। এদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।


Regd No. D A—139
সাপ্তাহিক
তওফিক
THE WEEKLY TOWFIQ

আগামী ১৭ই চৈত্র ইং ৩১শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার অষ্টমী স্নান উপলক্ষে জামালপুরে বিরাট জনসমাগম ও স্নানার্থীর ভিড় হইবে।


Regd No. D A—139
সাপ্তাহিক
তওফিক
THE WEEKLY TOWFIQ

জামালপুর আশেক মামুদ কলেজ।

আলোকচিত্র সংবাদের কম্পিউটারে টাইপকৃত পাঠোদ্ধার নিম্নরূপ :

জামালপুর আশেক মামুদ কলেজ।

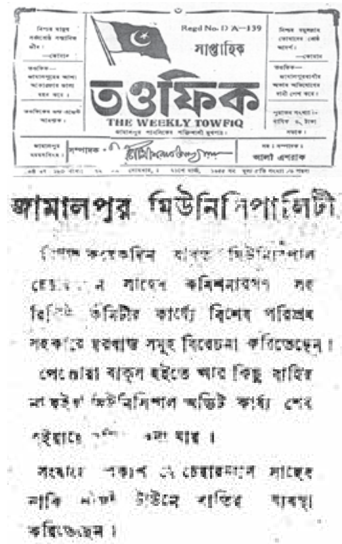
২১শে মার্চ্চ তারিখ আশেক মামুদ কলেজে প্রিন্সিপাল পদের- ২ জন প্রার্থীর ইন্টারভিউ নেওয়ার কথা। দরখাস্তকারীদের ১ জন মাদারী পুর ডিগ্রী কলেজের প্রিন্সিপাল, অপর জন ধনবাড়ী আই, এ, কলেজের প্রিন্সিপাল। কলেজের মঙ্গলের জন্য গভর্ণিং বডির তরফ হইতে জনাব এস-ডি-ও সাহেব সহরের নেতৃস্থানীয় সকলের যে প্রতি সহযোগীতার আহ্বান জানাইয়াছিলেন তাহাতে সকল মহল হইতেই কলেজের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূলক কাজে অকুণ্ঠ সমর্থণ পাওয়া যাইতেছে।

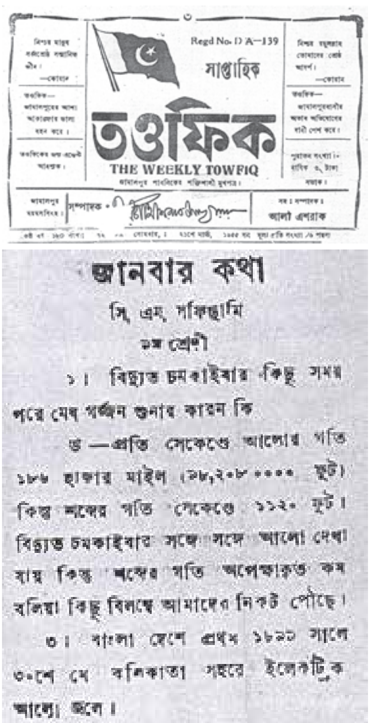
আলোকচিত্র সংবাদের কম্পিউটারে টাইপকৃত পাঠোদ্ধার নিম্নরূপ :

জামালপুর মিউনিসিপালিটী

বিগত কয়েকদিন যাবত মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান সাহেব কমিশনারগণসহ রিভিউ কমিটীর কার্য্যে বিশেষ পরিশ্রম সহকারে দরখাস্ত সমূহ বিবেচনা করিতেছেন। পেণ্ডোরা বাক্স হইতে আর কিছু বাহির না হইয়া মিউনিসিপাল অডিট কার্য্য শেষ হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

সংবাদে প্রকাশ ও চেয়ারম্যান সাহেব নাকি প্রায়ই টাউনে বাতির ব্যবস্তা করিতেছেন।


Regd No. D A—139
সাপ্তাহিক
তওফিক
THE WEEKLY TOWFIQ
আলো এশরাক
জামালপুর মিউনিসিপালিটী
বিগত কয়েকদিন যাবত মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান সাহেব কমিশনারগণ সহ রিভিউ কমিটীর কার্য্যে বিশেষ পরিশ্রম সহকারে দরখাস্ত সমূহ বিবেচনা করিতেছেন। পেণ্ডোরা বাক্স হইতে আর কিছু বাহির না হইয়া মিউনিসিপাল অডিট কার্য্য শেষ হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।
সংবাদে প্রকাশ ও চেয়ারম্যান সাহেব নাকি প্রায়ই টাউনে বাতির ব্যবস্থা করিতেছেন।


Regd No. D A—139
সাপ্তাহিক
তওফিক
THE WEEKLY TOWFIQ
আলো এশরাক
জানবার কথা
১। বিদ্যুত চমকাইবার কিছু সময় পরে মেঘ গর্জন শুনার কারন কি
উ:—প্রতি সেকেণ্ডে আলোর গতি ১৮৬ হাজার মাইল (৯৮,২০৮০০০০ ফুট) কিন্তু শব্দের গতি সেকেণ্ডে ১১২০ ফুট। বিদ্যুত চমকাইবার সঙ্গে সঙ্গে আলো দেখা যায় কিন্তু শব্দের গতি অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া কিছু বিলম্বে আমাদের নিকট পৌছে।
৩। বাংলা দেশে প্রথম ১৮৯৯ সালে ৩০শে মে কলিকাতা সহরে ইলেকট্রিক আলো জ্বলে।

আলোকচিত্র সংবাদের কম্পিউটারে টাইপকৃত পাঠোদ্ধার নিম্নরূপ :

জানবার কথা

সি, এম, সফিছামি

৯ম শ্রেণী

১। বিদ্যুত চমকাইবার কিছু সময় পরে মেঘ গর্জন শুনার কারন কি

উ:–প্রতি সেকেণ্ডে আলোর গতি ১৮৬ হাজার মাইল (৯৮,২০৮০০০০ ফুট) কিন্তু শব্দের গতি সেকেণ্ডে ১১২০ ফুট। বিদ্যুত চমকাইবার সঙ্গে সঙ্গে আলো দেখা যায় কিন্তু শব্দের গতি অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া কিছু বিলম্বে আমাদের নিকট পৌছে।

৩। বাংলা দেশে প্রথম ১৮৯৯ সালে ৩০শে মে কলিকাতা সহরে ইলেকটিক আলো জ্বলে।



নিশ্চয় মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানিত জীব। —কোরান

তওফিক— জামালপুরের আশা আকাঙ্ক্ষার ডালা বহন করে।

তওফিকের জন্য এজেন্ট আবশ্যক।

Regd No. D A—139

সাপ্তাহিক

তওফিক

THE WEEKLY TOWFIQ

জামালপুর পাবলিকের শক্তিশালী মুখপত্র।

নিশ্চয় রসুলল্লাহ তোমাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। —কোরান

তওফিক— জামালপুরবাসীর অভাব অভিযোগের দাবী পেশ করে।

পুরাতন সংখ্যা ।• বার্ষিক ৫৲ টাকা সডাক।

জামালপুর ময়মনসিংহ। | সম্পাদক : [signature]

সহঃ সম্পাদক : আলী এশরাক

৬ষ্ঠ বর্ষ ১৮০ সংখ্যা। সোমবার, ২১শে মার্চ, ১৯৫৫ সন মূল্য প্রতি সংখ্যা /৬ পয়সা



২ তওফিক

ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী ছাত্রদের প্রতি অনুরোধ।

সোমবার, ২১শে মার্চ ১৯৫৫ সন

আমাদের আরজ :

একটু কাজ করবে ভাই ?

[illegible]

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

[৪র্থ পৃষ্ঠার পর]

[illegible]

তোমাদের—
তওফিক ভাই,

আলোকচিত্র সংবাদের কম্পিউটারে টাইপকৃত পাঠোদ্ধার নিম্নরূপ :

ম্যাটিক পরীক্ষার্থী ছাত্রদের প্রতি অনুরোধ।

আমাদের আরজ :

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে বর্ত্তমানে জামালপুরে কয়েকজন ন্যায় নিষ্ট কর্ত্তব্য পরায়ণ অফিসারের সমাবেশ সাধিত হইয়াছে এবং প্রত্যেকেই যৎপরোনাস্তি তীক্ষ্ণ পর্যাবেক্ষণ দ্বারা স্ব স্ব বিভাগকে ক্রটী শূন্য করিবার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

বিগত ১৩ই মার্চ্চ তারিখে পুলিস কো-অপারেসন বার্ষিকীতে তাঁহারা তাঁহাদের যে মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন এজন্য বাস্তবিকই আমরা গর্ব্ববোধ করিতেছি।

গত ২০ বৎসর অর্থাৎ একটা জেনারেসন যাবত আমাদের মধ্যে যে কয়জন লোক উচ্চ শিক্ষিত হইয়াছেন তাঁহাদের শতকরা ৯৯ জনই চাকুরীতে নিয়োজিত কাজেই স্বাভাবিক ভাবেই দেশের মঙ্গলজনক সংগঠন কার্য্যে তাঁহাদেরকেই আদর্শ সৃষ্টির ব্যবস্থাও করিতে হইবে। তাঁহারা নিজেদের কর্ত্তব্য পালনে আজ ব্রতী ইহা অত্যন্ত আশা ও আনন্দের কথা।

এই প্রসঙ্গে আমরা একটি আরজ করি যে জামালপুরের দুর্গাবাড়ী হলটীকে টাউন হল রূপে ব্যবহার উপযোগী করিয়া তথায় প্রতি মাসের শেষ রবিবার দিবস সন্ধ্যায় ৯০ মিনিট কাল স্থায়ী সরকারী বেসরকারী নরনারী সমাবেশে একটা সভানুষ্ঠান ব্যবস্থা প্রবত্তিত হোক। উক্ত সভায় ৫ জন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের এবং ২ জন মহিলা এবং সভাপতি সাহেব বক্তৃতা করিবেন। করোনেসন রিডিং ক্লাবে সাপ্তাহিক শুক্রবার দিন সন্ধ্যায় ৯০ মিনিট কাল খেলাধূলা বন্ধ রাখিয়া টাউন ক্লাবের বক্তৃতার বিষয়বস্তুর উপর বিতর্কমূলক আলোচনা হওয়ার ব্যবস্থা কার্য্যকারী করা হোক।

সাপ্তাহিক তওফিকে বক্তৃতার বিষয়বস্তু ও বক্তাগণের নাম পূর্ব্বাহ্নে প্রকাশ করা হইবে।

আমাদের ধারনা এই ব্যবস্থায় অতী অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের জীবন ধারার এক অপূর্ব্ব পরিবর্তন সাধিত হইবে। এবং চরিত্র গঠন দুর্নীতি দূরীকরণ, কর্ত্তব্য বোধ জাগরণ, সর্ব্বোপরি দেশ প্রেমিক কর্ম্মি সংগঠন কাধ্যে দ্রুত সাফল্য লাভ করিব। সঙ্গে স্থানীয় অভাব অভিযোগ দূরীভূত ও নানাপ্রকার জনহিতকর কার্য্যও স্বুচারুরূপে চলিবে খলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আমরা এই বিষয়টার প্রতি স্থানীয় এস, ডি, ও, এস-ডি-এম, এস-ডি-পি-ও, এস-ডি-ও, (সি-এন্ড-বি) এস-ডি-ও, ইরিগেসন) এস-ডি ও, (রেলওয়ে) প্রিন্সিপাল, এ. এম, কলেজ, হেড মাষ্টার স্থানীয় হাই স্কুল, প্রেসিডেন্ট প্লীডার বার, প্রেসিডেন্ট মোক্তার বার, চেম্বার্স অব কমার্স, চেয়ারম্যান মিউনিসিপালিটী, প্রেসিডেন্ট যুক্তফ্রন্ট, প্রেসিডেন্ট মুসলীম লীগ প্রভৃতি সকল দায়ীত্বশীল ব্যক্তিগণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছি। অনুগ্রহ করিয়া তাঁহারা বিষয়টা চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

একটু কাজ করবে ভাই?

ম্যাটিক পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী ফিরেছ। পরীক্ষার ফল বের হতে এখনও অনেক দিন বাকী। দীর্ঘ সময়টী কি শুধু শুধু কাটিয়ে দিবে? দুদিন পরে তোমরাই পাকিস্তান পরিচালনা করবে। তোমরা কেউ হবে লাট, কেউ মন্ত্রী সেনাপতি, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, ব্যারিষ্টায় এমন কত শত কিছু।

তোমারই ছোট ভাই বোনদের প্রাথমিক শিক্ষার স্থান ঐ প্রাইমারী স্কুল গুলি। ওখানে কিছু হচ্ছে না বলে খু-উব কিন্তু কথা হচ্ছে। কোথাও কাগজে কলমে স্কুল আছে আসলে কিছু নাই। কোথাও বা স্কুল আছে মাষ্টার নাই। মাষ্টার আছে ছাত্র নাই। কোথাও বা ছাত্র আছে বেঞ্চই নেই। এমনি আরো কত রকম কিছু।

গভর্ণমেন্ট এতো ইনস্পেক্টার তদারক করতে এখন পাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট সাহের : সময়ই পান যা মেম্বর সাহেবরাই বা দেখেন কখন। 'বুঝেছ ভাই, সাধারণ সবাই তো খেত খামারের কাজ, খাওয়া পড়ার চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত।

আগেকার দিনের মত মাষ্টার সাহেবদের উপরই ভার ছেড়ে দেওয়া যেতো যদি মাষ্টারদের মাইনে ছাত্রদের পাশ ফেলের উপর বেশি কমি নির্ভর করতো। মানে ম্যাটিক পরীক্ষার মত প্রতি বৎসর যদি খুব ঠিক মত পরীক্ষা নেয়া হতো। উপরওয়ালারা নাকি ভাল ভাল কি সব মতলব করতেছেন তা, তারা করুন।

তোমরা তোমাদের এই অবসর সময় টার একটু চেষ্টা করলে ঢের কাজ কিন্তু করতে পার। তোমরা মাষ্টারের খোজ নিতে পার কি অসুবিধা তা শুনতে পার। তোমার বাবাকে, চাচাকে বলে প্রতিকার করতে পার। মেম্বর সাহেবকে বলতে পার। প্রেসিডেন্ট সাহেবকে নিয়ে দেখাতে পার। মানে কয়দিনের মধ্যেই সব একদম ঠিক করে দিতে পার। কেমন? পার না? আরো পারো তুমি কোন কোন স্কুলে কি ব্যবস্থা করলে। সেখানে কি ছিলনা তুমি কি করে দিলে। এসব সুন্দর করে লিখে তোমার দেশের এই তওফিক কাগজে ছাপতে পাঠাতে পার। আমরা খুব খুসী হয়ে ছাপাবো। এই তওফিক অনেক জায়গায় যায়। অনেক বড় বড় অফিসায়ে পড়েন। তারা জানতে পারবেন কোথায় কি গলদ ছিল আর তুমি কি ভাবে তা দূর করলে।

আচ্ছা এটা খুব বড় সৎকাজ না সৎকাজ করতে গেলে কিন্তু ভাই সুখ সৎ নিয়তে আর খুব শান্ত ভাবে কাজ করতে হয় তা ত জানোহ-না? এটা কিন্তু খুব সত্য কথা। ঠাণ্ডা মাথায় শুদ্ধ শান্ত ভাবে, মিষ্টি মুখে কাজ যারা করতে পারে তাদের কাজই কাজ হয়। আর যারা তা পারে না তারা কাজ করতে যেয়ে মুখের কড়া কথায় মানুষকে বিরক্ত করে। কড়া মেজাজ দেখায়ে অপরের সাথে ঝগড়া করে। সব কাজত মাটী করেই তার উপর নুতন হাঙ্গামা সৃষ্টি করে বসে। এর চেয়ে কাজ না করা কি ভাল নয় ?

তোমরা কখনো কিন্তু গোলমাল কিংবা কাউকে বিরক্ত করতে পারবে না– অথচ কাজ করা চাই। এরই নাম বাহাদুরী। জামালপুরের এইরূপ কতিপয় কৃতি সন্তানের ছবি ব্লক এবারকার তওফিকে দেওয়া হলো। এবং ধারাবাহিক তাবে প্রত্যেকের জীবনী ও বিস্তারিত লেখার ব্যবস্থা হলো।

আমাদের এই অনুরোধ তোমরা কে কি কাজ করলে তা জানবার জন্য উদগ্রীব হয়ে রইলেম।

তোমাদের–
তওফিক ভাই,

আলোকচিত্র চিঠির কম্পিউটারে টাইপকৃত পাঠোদ্ধার নিম্নরূপ :

লণ্ডনের চিঠি

(শিবলী)

লণ্ডন

* * * * ১৭।১২।৫৪

রাত্রি এগারটায় Airport থেকে আদার সঙ্গী খাঁন মোহাম্মদ আহছান খান, ইউছুফ জাইএর সহিত Custom office এর 'এতে কি আছে' জবাব দিয়া সেই P.IA. তে চড়লাম। অবশ্য এখন এটা Chartered অর্থাৎ শুধু Govt officers দের জন্য। কেহ ইংল্যান্ড বাসী ছুটীতে স্বপরিবারে বাড়ী যাচ্ছে, কেহ কোন Course নিয়ে যাচ্ছে বা কেহ Trainee যেমন আমরা।

আমার Course এর একজনই ছিল। বাকী ৩ জন পূর্ব্বেই চলিয়া আসিয়াছে খান ইউছুফ জাইকে করাচী Airport এ বিদায় দিবার জন্য তার মা, বাবা, ও চাচা এবং আরো দুইজন আত্মীয় আসিয়াছিলেন। বাবা বৃদ্ধ এবং Retired officer খুব ভদ্র নম্র বলে মনে হলো। তাঁর মা খুব খোদা ভক্ত ও মুছুল্লি মেয়ে বোঝা গেল। বোরখা পড়িয়া এসেছিলেন। সর্ব্বক্ষণ মাঝে মাঝে ফু দিতে ছিলেন এবং বলছিলেন আমাকে যে "জিতে রহো বেটা, তোম্ দুনো ভাই বনকে রহো এবং আমার পিঠ হাতাইয়া দিচ্ছিলেন। আহছান ছেলেটিও ভদ্র ফর্শা লম্বা। B.Sc. final এ ছিল

রাত্রে আরব সাগর এবং আরব মরুভুমি পার হয়ে কায়রোতে করাচী সময় ৮৷৷টায় পৌছলাম। অথচ আশ্চর্য্য তখন সেখানে অন্ধকার। প্লেন থেকে নেমে দুঘণ্টার জন্য Airport Caffe তে বসে বিশ্রাম নিলাম।

* * *

তারপর অনেকক্ষন একটানা Mediterinian sea পার হলাম, তারপর গ্রীসের উপর দিয়ে Adriatic পার হলাম। গ্রীসের উপকুল দিয়ে Venice সহর দেখতে পেলাম, এটা খুব বড় ও সুন্দর সহর মনে হলো। তারপর সুন্দর Italy পার হয়ে

সুইজারল্যাণ্ড এ প্রচুর মেঘের জন্য কিছুই দেখিতে পেলামনা, কিন্তু কালো পাহাড় এবং তার ফাকে উপত্যকায় ছোট ২ সহরগুলি এবং আলপস পর্ব্বতের তুষার ধবল চূড়া এবং মেঘের উচা নিচা তুলার পাজার মত আকৃতি ভুলবার নয়। France পার হলাম কতকটি মেঘের উপর দিয়ে তবে মাঝে ২ যা দেখলাম তাতে বেশ সুন্দর সাজান সহর এবং খুব সোজা লম্বা রাস্তা ভাল লাগল। ইংলিশ চ্যানেল ১০ মিনিটে পার হয়ে সেই London এ পৌছলাম। আজ এই পর্যন্ত তারপর পরে জানাব। আরজ ইতি-

স্নেহের শিবলী

সোমবার—১৪ই মার্চ, ১৯৫৫ তওফিক ৩

তওফিক সাহিত্য পাতা

লণ্ডনের চিঠি



(শিবলী)

লণ্ডন

* * * * * ১১।১২।৫৪

রাত্রি এগারটায় Airport থেকে আমার সাথী খান মোহাম্মদ আহছান খান, ইউছুফ ভাইএর সাহত Custom office এর 'এতে কি আছে' জবাব দিয়া সেই P.I.A. তে চড়লাম। অবশ্য এখন এটা Chartered অর্থাৎ শুধু Govt officers দের জন্য। কেহ হাংলাণ্ড বাসী ছুটিতে স্বপরিবারে বাড়ী যাচ্ছে, কেহ কোন Course নিয়ে যাচ্ছে বা কেহ Trainee যেমন আমরা।

আমার Course এর একজনই ছিল। বাকী ৩ জনপূর্ব্বেই চলিয়া আসিয়াছে। খান ইউছুফ ভাইকে করাচী Airport এ বিদায় দিবার জন্য তার মা, বাবা, ও চাচা এবং আরো দুইজন আত্মীয় আসিয়াছিলেন। বাবা বৃদ্ধ এবং Retired officer খুব ভদ্র নয় বলে মনে হলো। তাঁর মা খুব খোলা ভক্ত ও মুছুল্লি মেয়ে বোঝা গেল। বোরখা পাড়িয়া এসেছিলেন। সর্বক্ষণ মাঝে মাঝে ফু দিতে ছিলেন, এবং বলছিলেন আমাকে যে "জিতে রহো বেটা, তোম্ দুনো ভাই বনকে রহো" এবং আমার পিঠ থাপড়াইয়া দিচ্ছিলেন। আহছান ছেলেটিও ভদ্র ফর্শা লম্বা। B.Sc. final এ ছিল

রাত্রে আরব সাগর এবং আরব মরুভুমি পার হয়ে কায়রোতে করাচী সময় ৮টায় পৌছলাম। অথচ আশ্চর্য্য তখন সেখানে অন্ধকার। প্লেন থেকে নেমে দুঘন্টার জন্য Airport Caffe তে বসে বিশ্রাম নিলাম।

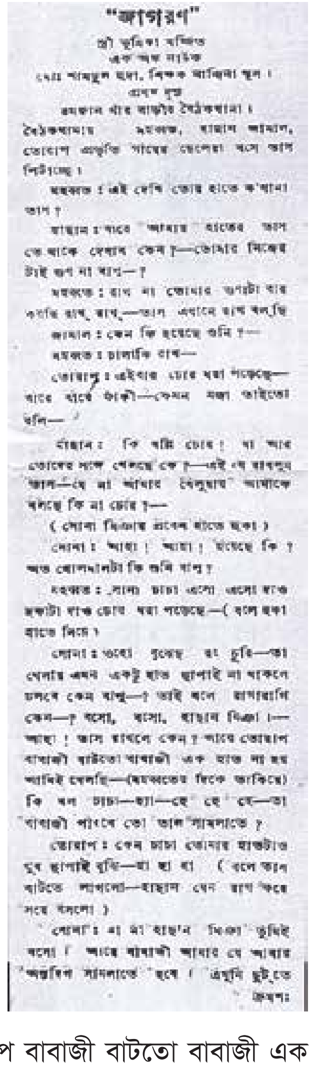
* * *

তারপর অনেকক্ষন একটানা Mediterinian sea পার হলাম, তারপর গ্রীসের উপর দিয়ে Adriatic পার হলাম। গ্রীসের উপকূল দিয়ে Venice সহর দেখতে পেলাম, এটা খুব বড় ও সুন্দর সহর মনে হলো। তারপর সুন্দর Italy পার হয়ে সুইজারল্যাণ্ড এ প্রচুর মেঘের জন্য কিছুই দেখিতে পেলামনা, কিন্তু কালো পাহাড় এবং তার ফাকে উপত্যকায় ছোট ২ সহরগুলি এবং আলপস পর্ব্বতের তুষার ধবল চূড়া এবং মেঘের উচা নিচা তুলার পাজার মত আকৃতি ভুলবার নয়। France পার হলাম কতকটি মেঘের উপর দিয়ে তবে মাঝে ২ যা দেখলাম তাতে বেশ সুন্দর সাজান সহর এবং খুব সোজা লম্বা রাস্তা ভাল লাগল। ইংলিশ চ্যানেল ১০ মিনিটে পার হয়ে সেই London এ পৌছলাম। আজ এই পর্য্যন্ত তারপর পরে জানাব। আরজ ইতি—

স্নেহের

শিবলী

আলোকচিত্র কম্পিউটারে টাইপকৃত পাঠোদ্ধার নিম্নরূপ :



“জাগরণ”

স্ত্রী ভূমিকা বজ্জিত

এক অঙ্ক নাটক

মোঃ শামছুল হুদা, শিক্ষক নান্দিনা স্কুল।

রমজান খাঁর বাড়ীর বৈঠকখানা।

বৈঠকখানায় মহব্বত, হাছান জামাল, তোরাপ প্রভৃতি গায়ের ছেলেরা বসে তাস পিটাচ্ছে।
মহব্বত: এই দেখি তোর হাতে ক'খানা তাস?
হাছান: বারে আমার হাতের তাস তোমাকে দেখাব কেন?–তোমার নিজের টাই গুণ না বাপু–?
মহবতে রাখ না তোমার গুণাটা বার করছি রাখ রাখ–তাস এখানে রাখ বল্‌ছি
জামাল: কেন কি হয়েছে শুনি?–
মহব্বত: চালাকি রাখ–
তোরাপ: এইবার চোর ধরা পড়েছে–বারে বারে ফাঁকী–কেমন মজা তাইতো বলি–
হাছান: কি বল্লি চোর! যা আর তোদের সঙ্গে খেলছে কে?–এই যে রাখলুম তাস–যে না আমার খেলুয়ায় আমাকে
বলছে কি না চোর?–
(সোনা মিঞার প্রবেশ হাতে হুকা)
সোনা: আহা! আহা! হয়েছে কি? অত গোলমালটা কি শুনি বাপু?
মহব্বত: সোনা চাচা এসো, এসো দাও হুকাটা দাও চোর ধরা পড়েছে (বলে হুকা হাতে নিয়ে।
সোনা: ওহো বুঝেছ রং চুরি–তা খেলায় এমন একটু হাত ছাপাই না থাকলে চলবে কেন বাপু–? তাই বলে রাগারাগি কেন–? বসো, বসো, হাছান মিঞা।–আহা! তাস রাখলে কেন? আরে তোরাপ বাবাজী বাটতো বাবাজী এক হাত না হয় আমিই খেলছি –(মহব্বতের দিকে তাকিয়ে) কি বল চাচা–হ্যা–হে হে হে–তা বাবাজী পারবে তো তাল সামলাতে?
তোরাপ: কেন চাচা তোমার হাতটাও খুব ছাপাই বুঝি-হা হা হা (বলে তাস বাটতে লাগলো–হাছান যেন রাগ করে সরে বসলো)
শোনা: না না হাছান মিঞা তুমিই বসো। আরে বাবাজী আমার যে আবার “অননদ্বিগ সামলাতে হবে। এখুনি ছুট্‌তে

ক্রমশঃ

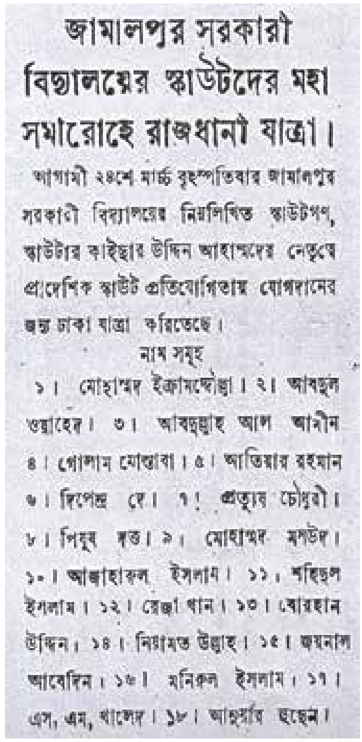
আলোকচিত্র কম্পিউটারে টাইপকৃত পাঠোদ্ধার নিম্নরূপ :

জামালপুর সরকারী বিদ্যালয়ের স্কাউটদের মহা সমারোহে রাজধানী যাত্রা।

আগামী ২৪শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার জামালপুর সরকারী বিদ্যালয়ের নিম্নলিখিত স্কাউটগণ, স্কাউটার কাইছার উদ্দিন আহাম্মদের নেতৃত্বে প্রাদেশিক স্কাউট প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য ঢাকা যাত্রা করিতেছে।

নাম সমূহ

১। মোহাম্মদ ইক্রামদ্দৌল্লা। ২। আবদুল ওয়াহেদ। ৩। আবদুল্লাহ আল আমীন। ৪। গোলাম মোস্তাবা। ৫। আতিয়ার রহমান। ৬। দিপেন্দ্র দে। ৭। প্রত্যুষ চৌধুরী। ৮। পিযুষ দত্ত। ৯। মোহাম্মদ মসউদ। ১০। আজাহারুল ইসলাম। ১১। শহিদুল ইসলাম। ১২। রেজা খান। ১৩। বোরহান উদ্দিন। ১৪। নিয়ামত উল্লাহ। ১৫। জয়নাল আবেদিন। ১৬। মনিরুল ইসলাম। ১৭। এস, এম, খালেদ। ১৮। আনুয়ার হুছেন।



জামালপুর সরকারী বিদ্যালয়ের স্কাউটদের মহা সমারোহে রাজধানী যাত্রা।

আগামী ২৪শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার জামালপুর সরকারী বিদ্যালয়ের নিম্নলিখিত স্কাউটগণ, স্কাউটার কাইছার উদ্দিন আহাম্মদের নেতৃত্বে প্রাদেশিক স্কাউট প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য ঢাকা যাত্রা করিতেছে।

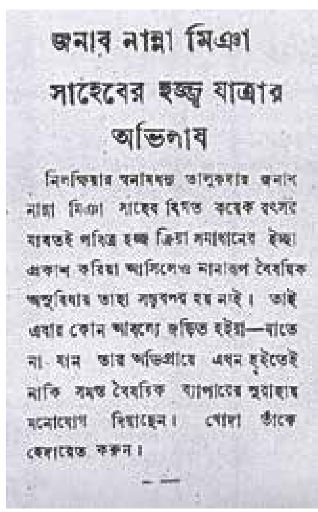
নাম সমূহ

১। মোহাম্মদ ইক্রামদ্দৌল্লা। ২। আবদুল ওয়াহেদ। ৩। আবদুল্লাহ আল আমীন। ৪। গোলাম মোস্তাবা। ৫। আতিয়ার রহমান। ৬। দিপেন্দ্র দে। ৭। প্রত্যুষ চৌধুরী। ৮। পিযুষ দত্ত। ৯। মোহাম্মদ মসউদ। ১০। আজাহারুল ইসলাম। ১১। শহিদুল ইসলাম। ১২। রেজা খান। ১৩। বোরহান উদ্দিন। ১৪। নিয়ামত উল্লাহ। ১৫। জয়নাল আবেদিন। ১৬। মনিরুল ইসলাম। ১৭। এস, এম, খালেদ। ১৮। আনুয়ার হুছেন।

এই সংবাদের কম্পিউটারে টাইপকৃত পাঠোদ্ধার নিম্নরূপ :

জনাব নান্না মিঞা সাহেবের হজ্জ যাত্রার অভিলাষ

নিলক্ষিয়ার স্বনামধন্য তালুকদার জনাব নান্না মিঞা সাহেব বিগত কয়েক বৎসর যাবতই পবিত্র হজ্জ ক্রিয়া সমাধানের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া আসিলেও নানারূপ বৈষয়িক অসুবিধায় তাহা সম্ভবপর হয় নাই। তাই এবার কোন আবল্যে জড়িত হইয়া-যাতে না যান তার অভিপ্রায়ে এখন হইতেই নাকি সমস্ত বৈষয়িক ব্যাপারের সুরাহায় মনোযোগ দিয়াছেন। খোদা তাঁকে হেদায়েত করুন।



জনাব নান্না মিঞা সাহেবের হজ্জ যাত্রার অভিলাষ

নিলক্ষিয়ার স্বনামধন্য তালুকদার জনাব নান্না মিঞা সাহেব বিগত কয়েক বৎসর যাবতই পবিত্র হজ্জ ক্রিয়া সমাধানের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া আসিলেও নানারূপ বৈষয়িক অসুবিধায় তাহা সম্ভবপর হয় নাই। তাই এবার কোন আবল্যে জড়িত হইয়া—যাতে না যান তার অভিপ্রায়ে এখন হইতেই নাকি সমস্ত বৈষয়িক ব্যাপারের সুরাহায় মনোযোগ দিয়াছেন। খোদা তাঁকে হেদায়েত করুন।

নিশ্চয় মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানিত জীব।
—কোরান

তওফিক—
জামালপুরের আশা আকাঙ্ক্ষার ডালা বহন করে।

তওফিকের জন্য এজেন্ট আবশ্যক।

Regd No. D A—139

সাপ্তাহিক

তওফিক

THE WEEKLY TOWFIQ

জামালপুর পাবলিকের শক্তিশালী মুখপত্র।

নিশ্চয় রছুলল্লাহ তোমাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ।
—কোরান

তওফিক—
জামালপুরবাসীর অভাব অভিযোগের দাবী পেশ করে।

পুরাতন সংখ্যা ।০
বার্ষিক ৫৲ টাকা
সডাক।

জামালপুর ময়মনসিংহ।

সম্পাদক — [illegible]

সহ : সম্পাদক :
আলী এশরাক

৬ষ্ঠ বর্ষ ১৮০ সংখ্যা ১২ ... সোমবার, ২১শে মার্চ, ১৯৫৫ সন মূল্য প্রতি সংখ্যা /৬ পয়সা

জামালপুর কোর্ট ষ্টেসনে বুকিং খোলা হইয়াছে এখন একটা রাস্তা চাই

বহু আবেদন নিবেদন করার পর জামালপুর কোর্ট ষ্টেশনে টিকিট দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী কয়েকটী গ্রামের লোকের সামান্য সুবিধা হইয়াছে বটে কিন্তু উক্ত ষ্টেশন হইতে বাহাদুরাবাদ ঘাট পর্য্যন্ত বিরাট অঞ্চলের জনসাধারণের কোন সুবিধাই হয় নাই। কারণ উক্ত ষ্টেশন হইতে জামালপুর শহর পর্য্যন্ত যান বাহন যাতায়াতের এমন কি মনুষ্য চলাচলেরও কো' সহজ এবং উপযুক্ত রাস্তা নাই। চন্দ্রা-জামালপুর রাস্তাটি যেখানে রেললাইন ক্রস করিয়াছে সেইখান হইতে রেল লাইনের পাশ দিয়া উক্ত ষ্টেশন পর্য্যন্ত অর্দ্ধমাইলের একটা রাস্তা নির্ম্মাণ করিলে এই অসুবিধা দূর হয় এবং জনসাধারণের দুর্ভোগ দূর হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে চন্দ্রা-জামালপুর রাস্তাটিতে বহুকাল যাবৎ মাটি না পড়ায় উহা এতদূর খারাপ হইয়াছে যে বর্ষকালে সামান্য একটু বৃষ্টি হইলেই রাস্তার উপর এক হাটু পানী জমে এবং স্থানে স্থানে বিরাট আকারের গর্ত্তের সৃষ্টি হয় যাহার ফলে সেই রাস্ত দিয়া যানবাহন তো দূরের কথা উহা মনুষ্য চলাচলেরও অযোগ্য হইয়া যায়। অথচ উহা জামালপুরের অন্যতম প্রধান রাস্তা।

জামালপুর শহরের অফিস আদালত স্কুল, কলেজ, থানা, এগ্রিঃফার্ম, হাসপাতাল প্রায় সব কিছুই জামালপুর কোর্ট ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী। যে দুই একটী এখনও কিছু দূরে আছে তাহাও অদূর ভবিষ্যতে মেলার মাঠে আসার কথা। কাজেই জামালপুর কোর্ট ষ্টেশন এবং জামালপুর শহরের উন্নতি কল্পে ও জনসাধারণের মঙ্গলার্থে ফৌজদারী অফিস অথবা হাসপাতাল হইতে কোর্ট ষ্টেশন পর্য্যন্ত একটা পাকা রাস্তা হওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং আগামী বর্ষার পূর্ব্বেই তাহাতে হাত দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

এই ব্যাপারে জামালপুরের মাননীয় এস, ডি.ও (সিভিল) এস, ডি, ও (সি, এন বি,) মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও কমিশনার মহোদয়গণের শুভ এবং ক্ষিপ্র দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

খাদেম—
হাজী মোঃ মাহসিন আলী
সাং কম্পপুর, জামালপুর।

জামালপুর আমিনা প্রেস হইতে মির্জ্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দর কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আলোকচিত্র সংবাদের কম্পিউটারে টাইপকৃত পাঠোদ্ধার নিম্নরূপ :

জামালপুর কোর্ট ষ্টেসনে বুকিং খোলা হইয়াছে এখন একটা রাস্তা চাই

বহু আবেদন নিবেদন করার পর জামালপুর কোর্ট ষ্টেশনে টিকিট দেওয়া আয়ন্ত হইয়াছে। ইহাতে ষ্টেশনের নিকট-বর্তী কয়েকটা গ্রামের লোকের সামান্য সুবিধা হইয়াছে বটে কিন্তু উক্ত ষ্টেশন হইতে বাহদুরাবাদ ঘাট পর্যন্ত বিরাট অঞ্চলের জন-সাধারণের কোন সুবিধাই হয় নাই। কারণ উক্ত ষ্টেশন হইতে জামালপুর শহর পর্য্যন্ত যান বাহন যাতায়াতের এমন কি মনুষ্য চলাচলেরও কোন সহজ এবং উপযুক্ত রাস্তা নাই। চন্দ্রা-জামালপুর রাস্তাটা যেখানে রেললাইন ক্রস করিয়াছে সেইখান হইতে রেল লাইনের পাশ দিয়া উক্ত ষ্টেশন পর্যান্ত অর্দ্ধমাইলের একটা রাস্তা নির্ম্মাণ করিলে এই অসুবিধা দূর হয় এবং জনসাধারণের দূর্ভোগ দূর হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে চন্দ্রা-জামালপুর রাস্তাটীতে বহুকাল যাবৎ মাটী না পড়ায় উহা এতদূর খারাপ হইয়াছে যে বর্ষকালে সামান্য একটু বৃষ্টি হইলেই রাস্তার উপর এক হাটু পানী জমে এবং স্থানে স্থানে বিরাট আকারের গর্ত্তের সৃষ্টি হয় যাহার ফলে সেই রাস্ত দিয়া যানবাহন তো দূরের কথা উহা মনুস্য চলাচলেরও অযোগ্য হইয়া যায়। অথচ উহা জামালপুরের অন্যতম প্রধান রাস্তা।

জামালপুর শহরের অফিস আদালত স্কুল, কলেজ, থানা, এগ্রিঃফার্ম্ম, হাসপাতাল প্রায় সব কিছুই জামালপুর কোর্ট ষ্টেশনের নিকটবর্তী। যে দুই একটী এখনও কিছু দূরে আছে তাহাও অদূর ভবিষ্যতে মেলার মাঠে আসার কথা। কাজেই জামালপুর কোর্ট ষ্টেশন এবং জামালপুর শহরের উন্নতি কল্পে ও জনসাধারণের মঙ্গলার্থে ফৌজদারী অফিস অথবা হাসপাতাল হইতে কোর্ট ষ্টেশন পর্য্যন্ত একটা পাকা রাস্তা হওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং আগামী বর্ষার পূর্ব্বেই তাহাতে হাত দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

এই ব্যাপারে জামালপুরের মাননীয় এস, ডি.ও (সিভিল) এস, ডি, ও (সি, এন বি) মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান কমিশনার মহোদয়গণের শুভ এবং ক্ষীপ্র দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

খাদেম
হাজী মোঃ মোহসিন আলী
সাং কম্পপুর, জামালপুর।

উপর্যুক্ত মুক্ত সংবাদ পরিবেশনে একজন সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রক হিসেবে মির্জা সাহেবের অবস্থান নিরপেক্ষ। তিনি সাংবাদিকতায় অসাম্প্রদায়িকতা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা এবং বস্তুনিষ্ঠ অবস্থান গ্রহণের ক্ষেত্রে ছিলেন আপসহীন।

বই আলোচনা

লেখক যখন বই লিখেন, তখন তা তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ওপর ভিত্তি করে লিখেন। এরপর একজন পাঠক যখন বইটি পড়ে তার অনুভূতি ব্যক্ত করেন, তখন সেই আলোচনাতে গ্রন্থ লেখকের ধারণা থেকে পাঠকের ছাপ স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। ২০২২ সালে প্রকাশিত 'জীবন-কথা : মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার' বইটি প্রকাশিত হলে বেশ কজন পাঠক গ্রন্থটির আলোচনা করেন। এছাড়া সোশ্যাল মিডিয়ায় গ্রন্থটির কবি ও ছড়াকার আশরাফুল মান্নান, সাংবাদিক মোস্তফা মঞ্জু, কবি ও চিকৎসক, শিল্পী রুমি আজনবী, শামীমা সোবহান, শাহিনা সোবহান মিতু, মোহাম্মদ নুরুজ্জামান, আতা সরকার, রাশেদুল শেলী মীর আনিসুল হাসানসহ নাম জানা অজানা অসংখ্য ব্যক্তি উচ্চ উচ্চ মন্তব্যসহ ব্যাপক ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়। নিম্নে নির্বাচিত কয়েকজন পাঠকের আলোচনা দেওয়া হলো।

বই আলোচনা : 'জীবন-কথা : মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার'

শারমিন মাশা

জামালপুর-শেরপুর অঞ্চলের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার (১৯০৫-১৯৮৫)। জামালপুর জেলার উন্নয়ন ও অগ্রগতির সঙ্গে তাঁর নামটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি জামালপুর-শেরপুরবাসীর নিকট মির্জা সাহেব নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। ব্রিটিশ আমলের বিশ শতকের চল্লিশের দশকে তদানীন্তন শেরপুর থানার ও বাংলাদেশ আমলের সত্তরের দশকে জামালপুরের দীর্ঘদিন প্রথম শ্রেণির ক্ষমতাপ্রাপ্ত অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ। বিশ শতকের অবিভক্ত ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। জামালপুর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'তওফিক' পত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রক ছিলেন তিনিই। একজন সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক হিসেবেও তিনি যথেষ্ট প্রতিভা ও সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'আসামের জঙ্গলে' একটি ক্ল্যাসিকতুল্য ভ্রমণকাহিনি। এ অঞ্চলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাসহ অনেক জনহিতকর কাজ করেছেন তিনি। জামালপুর শহরে তিনি ১৯৫৯ সালে প্রথম বিদ্যুতায়নে পথিকৃৎ ভূমিকা পালন করেন। তদানীন্তন জামালপুর মহকুমার ঐতিহ্যবাহী জামালপুর পৌরসভার ১৯৬০-১৯৬৫ মেয়াদে ভাইস-চেয়ারম্যান (বর্তমানে মেয়র) ছিলেন তিনি। এ অঞ্চলে সমবায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অগ্রণী। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের জীবন-কথা নিয়ে গবেষক, প্রাবন্ধিক শাহ্ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান একটি তথ্যবহুল ও প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

‘জীবন-কথা মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার’ গ্রন্থখানা বিজয় প্রকাশ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন আনিছুর রহমান লয়েট, পৃষ্ঠা ১৪৪, মূল্য : ৩০০ টাকা। গ্রন্থটির সূচিতে ছোট-বড় ২৭টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। যেমন–বিভক্ত অংশগুলো হলো জীবন-কথা, সমকালীন পরিবেশ-পটভূমি, জন্ম ও বংশ-পরিচয়, জীবন-দর্শন, পরিবার-পরিচিতি, শৈশবকাল, বাল্যজীবন, শিক্ষাজীবন, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, দেশবন্ধুর সাহচর্য, রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মূল্যায়ন, কর্মজীবন, সাময়িকপত্র সম্পাদনা, সামাজিক সংগঠনে সংশ্লিষ্টতা, সমাজসেবা, অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ও বেঞ্চকোর্টেও সদস্যরূপে, সাহিত্যচর্চা ও সাংবাদিকতা, সমকালে কতিপয় ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য, কতিপয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সমকালীন প্রতিক্রিয়া, স্মৃতিরক্ষা ও স্বীকৃতি, জীবনপঞ্জি, রচনা-নিদর্শন, চিঠিপত্র, শেষজীবন ও মৃত্যু, মৃত্যুর পর তাঁর সম্পর্কে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত লেখালিখির তথ্য ও আলোকচিত্র।

এ গ্রন্থ পাঠ করে একজন মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারকে খুঁজে পাওয়া যায়। বইয়ে তাঁর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় সব উল্লেখযোগ্য ঘটনাই লেখক তুলে এনেছেন। তাঁর জন্ম, পরিচয়, লেখাপড়া, রাজনীতি প্রভৃতি সবকিছুই আলোচিত হয়েছে। এছাড়া তাঁর লেখালিখিসহ খুঁটিনাটি প্রায় সবই তুলে এনেছেন সুন্দরভাবে। গ্রন্থটির বিভিন্ন অংশে সমকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মূল্যায়ন তুলে ধরা হয়েছে। এই বইতে তাঁর লেখা ‘আসামের জঙ্গলে’ ভ্রমণকাহিনির সংকলিত সংক্ষেপিত অংশ চয়ন করা হয়েছে। এটি একটি ক্লাসিকতুল্য ভ্রমণকাহিনি।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার রাজনীতিবিদ হিসেবেই সুপরিচিত। কিন্তু এই বই পড়লে পাওয়া যাবে রাজনীতি সত্তার বাইরে তাঁর আরেক বিস্তৃত লেখালিখির জীবন। তাঁর শৈল্পিক মনন, সাংস্কৃতিক জীবন, শিল্প ও সংস্কৃতি, খেলাধুলা নিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যক্তিগত জীবন-দর্শন সবই আলোকপাত করা হয়েছে। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার সম্পর্কে আগ্রহীরা যে কেউই তাঁর হস্তাক্ষর লেখা ছড়া পড়ে প্রীত হবেন। তাঁর অনেকগুলো দুর্লভ ছবি, চিঠিপত্র, মূল্যবান স্মারক বইটির তাৎপর্য বাড়িয়ে দিয়েছে। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের জীবন-কর্ম, অবদান, পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধিকরণে বইটি থেকে পাঠক সমাজ জানতে পারবেন।

লেখক : গবেষক

উৎস : ১৭ই মে ২০২৩, https://banglarchithi.com/2023/05/17/বই-আলোচনা-জীবন-কথা/

বই আলোচনা : 'জীবন-কথা মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার'

মোহাম্মদ নাজমুল হোসাইন

জামালপুরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার (১৯০৫-১৯৮৫) একজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর দীর্ঘ ত্রিকালদর্শী জীবন ও কর্ম নিয়ে ছত্রিশ বছর পর বিশিষ্ট গবেষক, প্রাবন্ধিক শাহ্ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান 'জীবন-কথা মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার' নামে একটি তথ্যবহুল ও প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য এই যে এ অঞ্চলের বর্তমান প্রজন্মের কাছে মির্জা সাহেব এখন প্রায় বিস্মৃত। অথচ এমনটি হওয়ার কথা ছিল না; বিশ শতকের আশির দশক পর্যন্ত তিনি এই অঞ্চলের নানাবিধ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বীজ বপন করেন। যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। এ অঞ্চলের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। এই হিসেবে তিনি জামালপুর জেলার ইতিহাসের অংশ।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ছিলেন একাধারে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী, সমাজসেবী ও সাহিত্যিক এবং রাজনীতিবিদ। জামালপুর জেলার উন্নয়ন ও অগ্রগতির সঙ্গে তাঁর নামটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি জামালপুর-শেরপুরবাসীর নিকট মির্জা সাহেব নামে সমধিক পরিচিত। তিনি ব্রিটিশ আমলের বিশ শতকের চল্লিশের দশকে তদানীন্তন শেরপুর থানার ও বাংলাদেশ আমলের সত্তরের দশকে জামালপুরের দীর্ঘদিন প্রথম শ্রেণির ক্ষমতাপ্রাপ্ত অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।

বিশ শতকের অবিভক্ত ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। জামালপুর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'তওফিক' পত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রক ছিলেন তিনিই। একজন সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক হিসেবেও তিনি যথেষ্ট প্রতিভা ও সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'আসামের জঙ্গলে' একটি ক্ল্যাসিকতুল্য ভ্রমণকাহিনি। এ অঞ্চলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাসহ অনেক জনহিতকর কাজ করেছেন তিনি। জামালপুর শহরে তিনি ১৯৫৯ সালে প্রথম বিদ্যুতায়নে পথিকৃৎ ভূমিকা পালন করেন। তদানীন্তন জামালপুর মহকুমার ঐতিহ্যবাহী জামালপুর পৌরসভার ১৯৬০-১৯৬৫ মেয়াদে ভাইস-চেয়ারম্যান (বর্তমানে মেয়র) ছিলেন তিনি। এ অঞ্চলে সমবায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অগ্রণী।

'জীবন-কথা মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার' গ্রন্থখানা বিজয় প্রকাশ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন আনিছুর রহমান লয়েট, পৃষ্ঠা ১৪৪, মূল্য : ৩০০ টাকা। গ্রন্থটির সূচিতে ছোট-বড় ২৭টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত। বিভক্ত অংশগুলো হলো জীবন-কথা, সমকালীন পরিবেশ-পটভূমি, জন্ম ও বংশ-পরিচয়, জীবন-দর্শন, পরিবার-পরিচিতি, শৈশবকাল, বাল্যজীবন, শিক্ষাজীবন, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, দেশবন্ধুর সাহচর্য, রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মূল্যায়ন, কর্মজীবন, সাময়িকপত্র সম্পাদনা, সামাজিক সংগঠনে সংশ্লিষ্টতা, সমাজসেবা, অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ও বেঞ্চকোর্টের সদস্যরূপে, সাহিত্যচর্চা ও সাংবাদিকতা, সমকালে কতিপয় ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য, কতিপয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সমকালীন প্রতিক্রিয়া, স্মৃতিরক্ষা ও স্বীকৃতি, জীবনপঞ্জি, রচনা-নিদর্শন, চিঠিপত্র, শেষজীবন ও মৃত্যু, মৃত্যুর পর তাঁর সম্পর্কে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত লেখালিখির তথ্য ও আলোকচিত্র।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের ওপর প্রণীত গ্রন্থটির রচনার তথ্য, উপাত্ত ও গবেষণা বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেছেন মর্মে লেখকের কথা অংশে গ্রন্থকার জানিয়েছেন। এ গ্রন্থ পাঠ করে একজন মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারকে অনুধাবন করা যায়। বইয়ে তাঁর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় সব উল্লেখযোগ্য ঘটনাই লেখক নিখুঁতভাবে তুলে এনেছেন। তাঁর জন্ম, পরিচয়, লেখাপড়া, রাজনীতি প্রভৃতি সবকিছুই আলোচিত হয়েছে। এছাড়া তাঁর লেখালিখিসহ খুঁটিনাটি প্রায় সবই তুলে এনেছেন সুন্দরভাবে। গ্রন্থটির বিভিন্ন অংশে সমকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মূল্যায়ন তুলে ধরা হয়েছে। এটি এ গ্রন্থের একটি বিশিষ্ট দিক। এই বইতে তাঁর লেখা 'আসামের জঙ্গলে' ভ্রমণকাহিনির সংকলিত সংক্ষেপিত অংশ চয়ন করা হয়েছে। ইহা একটি ক্লাসিকতুল্য ভ্রমণকাহিনি।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার রাজনীতিবিদ হিসেবেই সুপরিচিত। কিন্তু এই বই পড়লে পাওয়া যায় রাজনীতি সত্তার বাইরে তাঁর আরেক বিস্তৃত লেখালিখির জীবন। তাঁর শৈল্পিক মনন, সাংস্কৃতিক জীবন, শিল্প ও সংস্কৃতি, খেলাধুলা নিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যক্তিগত জীবন-দর্শন—সবই আলোকপাত করা হয়েছে। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার সম্পর্কে আগ্রহীরা যে কেউই তাঁর হস্তাক্ষর লেখা ছড়া পড়ে প্রীত হবেন। তাঁর অনেকগুলো দুর্লভ ছবি, চিঠিপত্র, মূল্যবান স্মারক বইটির তাৎপর্য বাড়িয়ে দিয়েছে। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের জীবন-কর্ম অবদান পর্যবেক্ষণ এবং উপলব্ধিকরণে বইটি থেকে পাঠক সমাজ অনেক অনুসন্ধানী ও চমকপ্রদ তথ্য জানতে পারবেন।

জীবনী রচনা লিখতে গেলে কালের ধুলোতে কিছু কথা বাদ পড়ে যায় কিংবা বর্ণনার ছেদ পড়ে। এ বইটির ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। গ্রন্থটির রচনার নিদর্শন অংশে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের সাহিত্যকর্ম আরও বেশি চয়ন করা গেলে

ভালো হতো। তবে বইটির বর্ণনার বিন্যাসের পূর্বাপর, সরল উপস্থাপনা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ চমৎকার। এ বই নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক স্মারকের দাবি রাখে।

জামালপুরের বিস্মৃত ব্যক্তি মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের ওপর এই প্রকাশনা নিঃসন্দেহে নতুন প্রজন্মকে আলোক-উদ্ভাসিত করবে। তাঁর জীবন ও কর্ম উত্তরপ্রজন্মের কাছে অনুসরণীয় হতে পারে আরও বহুকাল।

লেখক : স্নাতকোত্তর (সমাজবিজ্ঞান) শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী,

ঢাকা কলেজ

উৎস্য ২৪শে মে ২০২৩,

https://www.sebahotnews.org/2023/05/book-discussion-life-katha-mirza-ashraf.html

বই আলোচনা : 'জীবন-কথা : মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার'

শাহ্ মোহাম্মদ কবীর

জামালপুর-শেরপুর অঞ্চলের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার (১৯০৫-১৯৮৫)। জামালপুর জেলার উন্নয়ন ও অগ্রগতির সঙ্গে তার নামটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি জামালপুর-শেরপুরবাসীর নিকট মির্জা সাহেব নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। তার দীর্ঘ ত্রিকালদর্শী জীবন ও কর্ম নিয়ে ছত্রিশ বছর পর বিশিষ্ট গবেষক, প্রাবন্ধিক শাহ্ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান 'জীবন-কথা : মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার' নামে একটি তথ্যবহুল ও প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। লেখক শাহ্ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (জন্ম ১০ই জুন, ১৯৮৫) পেশাগত জীবনে বাংলা একাডেমির কর্মকর্তা হলেও ছাত্রজীবন হতেই দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও জার্নালে নিয়মিত লিখছেন। কাজী নজরুল ইসলামের ওপর ও আইন বিষয়ে তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো পাঠক সমাদৃত হয়েছে। 'অমর একুশে বাংলা একাডেমির ৬০ বছর ও আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন ২০১৫ স্মারকপত্রে'র প্রকাশনা সহকারী এবং পাঁচ খণ্ডে সমাপ্য 'জেলা সাহিত্যমেলা ২০২২' গ্রন্থের প্রকাশনা পরিষদের সদস্য ছিলেন তিনি। 'কাজী নজরুলের কারাজীবন' (২০২৩), 'ডা. মো. জাকির হোসেন : কালসমুদ্রে আলোরযাত্রী' (২০২৪), 'স্মৃতিকথা : বর্ধমান হাউসে কাজী নজরুল' (২০২৫) লেখকের প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য এই যে, এ অঞ্চলের বর্তমান প্রজন্মের কাছে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার তথা মির্জা সাহেব এখন প্রায় বিস্মৃত। অথচ এমনটি হওয়ার কথা ছিল না। বিশ শতকের আশির দশক পর্যন্ত তিনি এই অঞ্চলের

নানাবিধ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বীজ বপন করেন। যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। জামালপুর-শেরপুর অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে আলোকিত করার ক্ষেত্রে মির্জা সাহেবের অবদান কখনোই ভুলার নয়। এই হিসেবে তিনি জামালপুর জেলার ইতিহাসের আলোকিত অংশ। মির্জা সাহেব ছিলেন ব্রিটিশ আমলে বিশ শতকের চল্লিশের দশকে তদানীন্তন শেরপুর থানার ও বাংলাদেশের সত্তরের দশকে জামালপুরের দীর্ঘদিন প্রথম শ্রেণির ক্ষমতাপ্রাপ্ত অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট।

অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটগণ সমাজে অত্যন্ত সম্মানীয়। তাঁরা ছোটখাটো ও লঘু অপরাধের ফৌজদারি বিচারকার্য সম্পন্ন করেন। তাঁরা সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ বা পুলিশের প্রদত্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বা অপরাধ সংঘটনে নিজেদের প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কোনো অপরাধ আমলে নিতে পারেন। অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট কী কী দায়িত্ব প্রতিপালন করেন এবং তাঁর অধিকার ও ক্ষমতা কী, সেসব বিষয়ে ফৌজদারি কার্যবিধিতে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো বিধান নেই। বিশেষ আইন দ্বারা তাঁদের দায়িত্ব ও অধিকার নির্ণীত হয়ে থাকে। অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটরা এ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। তাঁদের এই অবদানের উপর গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। সমকালে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটদের বিচার প্রক্রিয়াকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

এদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যে এরকম একজন অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার। তিনি ছিলেন একাধারে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী, সমাজসেবী ও সাহিত্যিক। এদেশের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জন নেপথ্যে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

‘জীবন-কথা : মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার’ গ্রন্থখানি বিজয় প্রকাশ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন আনিছুর রহমান লয়েট, পৃষ্ঠা : ১৪৪, মূল্য : ৩০০ টাকা। গ্রন্থটি ছোট-বড় ২৭টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত। বিভক্ত অংশগুলো হলো–জীবন-কথা, সমকালীন পরিবেশ-পটভূমি, জন্ম ও বংশ-পরিচয়, জীবন-দর্শন, পরিবার-পরিচিতি, শৈশবকাল, বাল্যজীবন, শিক্ষাজীবন, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, দেশবন্ধুর সাহচর্য, রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মূল্যায়ন, কর্মজীবন, সাময়িকপত্র সম্পাদনা, সামাজিক সংগঠনে সংশ্লিষ্টতা, সমাজসেবা, অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ও বেঞ্চকোর্টেও সদস্যরূপে, সাহিত্যচর্চা ও সাংবাদিকতা, সমকালে কতিপয় ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য, কতিপয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সমকালীন প্রতিক্রিয়া, স্মৃতিরক্ষা ও স্বীকৃতি, জীবনপঞ্জি, রচনা-নিদর্শন, চিঠিপত্র, শেষজীবন ও মৃত্যু, মৃত্যুর পর তাঁর সম্পর্কে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত লেখালিখিতে তথ্য ও আলোকচিত্র।

লেখক এ বইয়ের মাধ্যমে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের জীবন ও কর্মের সংক্ষিপ্ত আলোচনার চেষ্টা করেছেন। এ বই হতে জানা যায়, মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ১৯০৫ সালে বর্তমান বকশীগঞ্জ উপজেলার নিলক্ষিয়ার তৎকালীন পাতিলাদহ পরগনার সম্ভ্রান্ত মুসলিম জোতদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মির্জা আসাদ উদ্দিন হায়দার ও মাতার নাম তৈবুন নেসা। এ সম্বন্ধে তৎকালীন পত্রপত্রিকা ও গোলাম মোহাম্মদের 'জামালপুরের গণ-ইতিবৃত্ত' (১৯৫৪) গ্রন্থে লেখা রয়েছে।

শিশুকালে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের মা ইন্তেকাল করেন। তিনি তাঁর নানির আদর-স্নেহে লালিতপালিত হন। আশরাফ উদ্দিন হায়দার পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর ১৯১৩ সালে ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে ভর্তি হন। এ প্রতিষ্ঠানে তিনি কয়েক বছর পড়াশোনা করেন। এ সময় মহাত্মা গান্ধীর (১৮৬৯-১৯৪৭) ডাকে অবিভক্ত বাংলাসহ সারা ভারতবর্ষে অসহযোগ আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। এ আন্দোলনের তীব্রতা এতই বেশি ছিল যে বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫) সময়েও ভারতবর্ষ এরকম মূর্তিধারণ করেনি।

দেশের অন্যান্য স্থানের মতো বৃহত্তর জামালপুরেও গান্ধীজির চিন্তা-চেতনা ছড়িয়ে পড়ে। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা না দিয়েই গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে নেমে পড়েন। পরবর্তীকালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের (১৮৭০-১৯২৫) সঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ান এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের একজন খাঁটি সংগ্রামী কর্মী হিসেবে নিজেকে তৈরি করেন। এ সময় তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে মিটিং-মিছিলের নেতৃত্ব দেন। এ কারণে তিনি কিছুটা দেরিতে ১৯৩৯ সালে বর্তমান শেরপুর জেলার গোবিন্দকুমার (জি.কে.) পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

[তথ্যসূত্র : বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা : জামালপুর, শামসুজ্জামান খান (প্রধান সম্পাদক), প্রথম প্রকাশ : ২০১৩, বাংলা একাডেমি, পৃ.৭৫]।

অতঃপর তিনি ১৯৪১ সালে বর্তমানে সরকারি আনন্দমোহন কলেজ থেকে আইএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে এ কলেজে বিএ ক্লাসে ভর্তি হন কিন্তু পড়ালেখা সম্পন্ন না করেই দেশের ডাকে এ অঞ্চলের জাতীয়তাবাদী প্রগতিশীল রাজনীতিসহ নানা জনহিতকর কল্যাণমূলক কাজে নিজেকে যুক্ত করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বৃহত্তর জামালপুরের বকশীগঞ্জ, দেওয়ানগঞ্জ, শেরপুর (তখন থানা) অঞ্চলে অনেক সেবামূলক কাজ করেন। জনহিতকর কাজের জন্য ব্রিটিশ রাজ সরকার তাকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখত। এ সময় ব্রিটিশ সরকার তাকে এ অঞ্চলের জন্য অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট বা জাস্টিস অফ দি পিস নিযুক্ত

করেন। চল্লিশ দশকের পুরো সময় তাঁর বেঞ্চকোর্টে তিনি স্থানীয় ছোটখাটো অনেক ফৌজদারি মামলার সুষ্ঠু বিচার করে নিষ্পত্তি করেন।

তিনি সমকালে গঠিত ইউনিয়ন বোর্ড (বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদ), স্পেশাল ঋণ সালিশি বোর্ডসহ বিভিন্ন সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। সমকালীন জাতীয় রাজনীতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২), হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীসহ সমকালের অনেক নেতৃবর্গের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও পরিচয় ছিল।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার বাংলাদেশ আমলেও সত্তর দশকে দ্বিতীয়বার জামালপুরের প্রথম শ্রেণির অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই দায়িত্ব তিনি দক্ষতার সাথে পালন করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ সমকালীন অনেক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে তাঁর পরিচয় ও যোগাযোগ ছিল। বঙ্গবন্ধু এ অঞ্চলে এলে তাঁর খবর নিতেন। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার এ অঞ্চলে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে বেশকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বকশীগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী নিলক্ষিয়া রূপজাহান পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর উচ্চ বিদ্যালয় এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও তিনি নিলক্ষিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জামালপুরের দেউরপাড়া চন্দ্রা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় প্রধান উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন।

একজন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মী হিসেবেও তিনি এ অঞ্চলে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি বেশকটি ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও প্রতিষ্ঠার সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি এ অঞ্চলের শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করেন।

প্রখ্যাত আউলিয়া হযরত শাহ জামাল (র.)-এর পুণ্যভূমি জামালপুরের মাটি অথচ তাঁর নামে কোনো মৌজা, গ্রাম হাটবাজার বা কোনো স্থাপনার নাম ছিল না। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার জামালপুর শহরের রেল স্টেশনের নাম সিংহজানী জংশন থেকে জামালপুর টাউন জংশন নাম পরিবর্তনের জন্য কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। ফলে ১৯৫৪ সালে ১৪ই আগস্ট এক সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী 'জামালপুর টাউন জংশন' নামকরণ করা হয়।

এ অঞ্চলে সংবাদপত্র প্রকাশ ও সাংবাদিকতায় তাঁর ভূমিকা অনন্য। তিনি এ অঞ্চলের সাংবাদিকতার উন্মেষকালে সাংবাদিকতা করেছেন এবং 'তওফিক' নামে ১৯৫০ সালে সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের প্রকাশক-সম্পাদক-মুদ্রকের ভূমিকা পালন করেছেন।

তাঁর প্রতিষ্ঠিত মুদ্রণালয়ের নাম ছিল আমেনা প্রেস। এ প্রেস থেকে গোলাম মোহাম্মদের প্রণীত 'জামালপুরের গণ-ইতিবৃত্ত'সহ কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত ও মুদ্রিত হয়েছিল। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার সাহিত্যিক হিসেবেও সমকালে সুধীমহলে পরিচিত ছিলেন। তাঁর রচিত দুটি গ্রন্থ : ভ্রমণকাহিনি 'আসামের জঙ্গলে' ও উপন্যাস 'মায়ার ভিটা' বিখ্যাত। তিনি ১৯৫৩ সালে জামালপুরে আয়োজিত একটি সাহিত্য-সম্মেলনের অন্যতম সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৭ সালে তিনি 'ঝিনাই' নামে আরও একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

এ অঞ্চলের কৃষকদের সমবায় কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করতে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৯৯৫ সালে জামালপুর সেন্ট্রাল-কো-অপারেটিভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখেন। মির্জা সাহেব বৃহত্তর জামালপুর অঞ্চলে সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তিনি ১৯৫৯ সালে দি জামালপুর কো-অপারেটিভ ইলেকট্রনিক সাপ্লাই সোসাইটি লিঃ প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। তিনি জামালপুর শহরে পানি সরবরাহের জন্য ওয়াটার ওয়ার্কস নির্মাণ কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মির্জা সাহেব ১৯৬৫ সালে জামালপুর সাব ডিভিশন কো-অপারেটিভ মাল্টি পারপাস সোসাইটি লিমিটেড ও ১৯৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তান কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন লিমিটেড-এর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

মির্জা সাহেব ১৯৬২ সালে জামালপুরে অন্ধকল্যাণ সমিতি প্রতিষ্ঠা করে বিনা পয়সায় চক্ষু চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করেন। তিনি এখানে কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রখ্যাত চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা. টি আহমেদের নেতৃত্বে চক্ষু অপারেশনের জন্য মেডিকেল ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার (১৯৬০-১৯৬৫) সাল পর্যন্ত জামালপুর পৌরসভার নির্বাচিত ভাইস-চেয়ারম্যান (বর্তমানে মেয়র) ছিলেন। এ সময় পাবলিক হল, পাবলিক লাইব্রেরি, স্টেডিয়াম প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি জামালপুরের চন্দ্রায় ১৯৫৭ সালে সুপ্রাচীন বিরাটকায় হরিশ্চন্দ্রের দিঘি ক্রয় করে তা খনন ও সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য চাষ জনপ্রিয় করেন। এছাড়া বকশীগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী কুরখা ও ভরসা বিল দুটি সংস্কার করে কৃষিশস্য চাষের উন্নতিতে অবদান রাখেন।

মোট কথা মির্জা সাহেব সারাজীবন ধরে জনদরদি ভূমিকায় অবস্থান করেছিলেন। অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট মির্জা সাহেবের কীর্তিকথা এ অঞ্চলের প্রবীণদের মুখে এখনো শোনা যায় এবং স্থানীয় ইতিহাসের বিভিন্ন পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। বাংলা একাডেমির 'লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা : জামালপুর' গ্রন্থে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের নামে একটি ভুক্তি আছে এবং সেখানে তাঁর সামান্য ইতিহাস উল্লেখ করা হয়েছে।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ১৯৮৫ সালের ১০ই জুন ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি এক কন্যা আনুজুমান আরা জামান যিনি ১৯৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ ডিগ্রিধারী ছিলেন এবং দুই পুত্রের অগ্রজ ডাক্তার মির্জা আলী হায়দার বাংলাদেশের প্রখ্যাত দন্ত চিকিৎসক ছিলেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র মির্জা হোসেইন হায়দার বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের স্বনামধন্য বিচারপতি ছিলেন।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের উপর প্রণীত গ্রন্থটির রচনার তথ্য, উপাত্ত ও গবেষণা বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেছেন মর্মে লেখকের কথা অংশে গ্রন্থকার জানিয়েছেন। এ গ্রন্থ পাঠ করে একজন মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারকে অনুধাবন করা যায়। বইয়ে তাঁর জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় সব উল্লেখযোগ্য ঘটনাই লেখক নিখুঁতভাবে তুলে এনেছেন। গ্রন্থটির বিভিন্ন অংশে সমকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মূল্যায়ন তুলে ধরা হয়েছে। এটি এ গ্রন্থের একটি বিশিষ্ট দিক। এ বইয়ের মাধ্যমে মির্জা সাহেব সম্পর্কে আগ্রহী যে কেউই তাঁর হস্তাক্ষরের লেখা ছড়া পড়ে প্রীত হবেন। তাঁর অনেকগুলো দুর্লভ ছবি, চিঠিপত্র, মূল্যবান স্মারক বইটির তাৎপর্য বাড়িয়ে দিয়েছে। জীবনী রচনা লিখতে গেলে কালের ধুলোতে কিছু কথা বাদ পড়ে যায় কিংবা বর্ণনার ছেদ পড়ে। এ বইটির ক্ষেত্রেও এ কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। গ্রন্থটির রচনার নিদর্শন অংশে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের সাহিত্যকর্ম আরও বেশি চয়ন করা গেলে ভালো হতো। আমাদের দেশের লেখক ও সাহিত্যিকগণ সাধারণত দেশ-বিদেশের বিখ্যাত লেখক, সাহিত্যিক বা রাজনীতিকদেরকে লিখেই সমাজে আলোকিত ও পরিচিত হতে চান; কিন্তু এ বইয়ের লেখক শাহ্ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান প্রত্যন্ত অঞ্চলের অসাধারণ আলোকিত ব্যক্তিত্ব মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারকে ফুটিয়ে তোলার মধ্য দিয়ে সমাজে লেখালিখির জগতে অনন্য নজির স্থাপন করেছেন।

সার্বিক বিবেচনায়, ‘জীবন-কথা : মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার’ গ্রন্থটির বর্ণনার বিন্যাসের পূর্বাপর, সরল উপস্থাপনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ চমৎকার। এ বই নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক স্মারকের দাবি রাখে। জামালপুরের পুরোধা ব্যক্তিত্ব মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের ওপর এই প্রকাশনা নিঃসন্দেহে নতুন প্রজন্মকে আলোকোদ্ভাসিত করবে। তাঁর জীবন ও কর্ম উত্তর-প্রজন্মের কাছে অনুসরণীয় হতে পারে আরও বহুকাল।

লেখক : অ্যাডভোকেট, জেলা ও দায়রা জজ কোর্ট, জামালপুর
উৎস : ১০ই এপ্রিল ২০২৫, https://muktokal.com/muktomot/4123/

আলোকচিত্র



আলোকচিত্র ভিজ্যুয়াল রূপায়ণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। চৈনিক প্রবাদে রয়েছে—এক হাজার শব্দের চেয়ে একটি চিত্র বেশি কথা বলে। কোনো জীবনীগ্রন্থের সঠিক বস্তুনিষ্ঠ চিত্র তুলে ধরতে সংশ্লিষ্ট ছবি বা আলোকচিত্রের গুরুত্ব অত্যধিক।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের জীবনীকে সামনে রেখে এতদ্ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আলোকচিত্র ও চিত্রলিপি তুলে ধরা হলো। তাঁর পারিবারিক সংগ্রহসহ নানা সূত্র থেকে এসব আলোকচিত্র আহরণ করা হয়েছে।

এই আলোকচিত্রগুলো এ জীবনীগ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ দলিল। বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই তিনি এগুলোর অধিকাংশই সংগ্রহ করে দিয়েছেন। উল্লেখ্য, মূল পাঠের আলোকচিত্রের সঙ্গে এ চিত্রগুলো মিলিয়ে দেখলে দু-একটি আলোকচিত্রের পুনরাবৃত্তি পরিলক্ষিত হবে। আলোকচিত্রের পাঠ প্রসঙ্গে এ পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন রয়েছে।

আলোকচিত্র গ্রন্থের তথ্য ও সত্যকে শুধু বিশ্বস্ততাই দান করে না, প্রামাণিকতাও দান করে। এ কারণে এ বইয়ের লিখিত জীবনী-ইতিহাসের চেয়ে আলোকচিত্রগুলোও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা বরং বেশি।

তাছাড়া এই আলোকচিত্রগুলো পরবর্তীকালে এতদঞ্চলের ইতিহাসসহ নানা কাজে অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এ বইয়ের লিখিত জীবনী-ইতিহাসের চেয়ে সাধারণ পাঠকের কাছে এর আবেদন বেশি। মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের জীবনীগ্রন্থের তথ্য-তত্ত্ব-উপাত্তসংশ্লিষ্ট কয়েকটি আলোকচিত্র নিচে দেওয়া হলো।



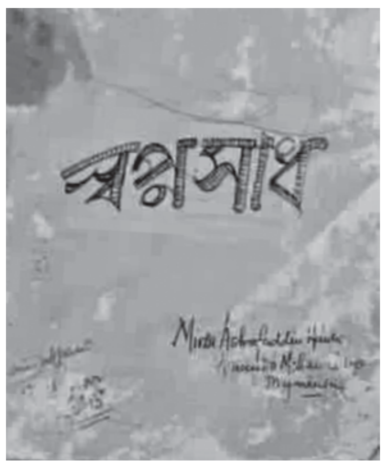
যৌবনে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার
(বয়স আনুমানিক ২৫ বছর)



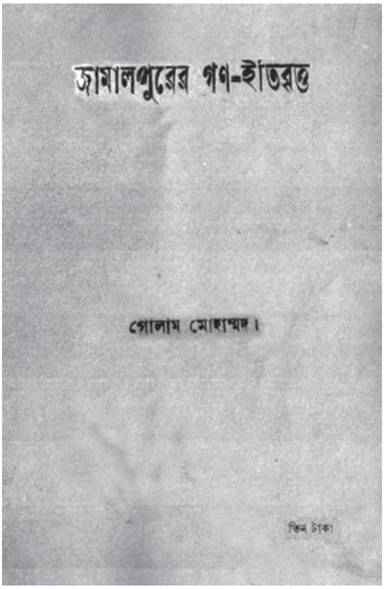
আনুমানিক বিয়াল্লিশ বছর বয়সে
মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার



মধ্যবয়সে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার



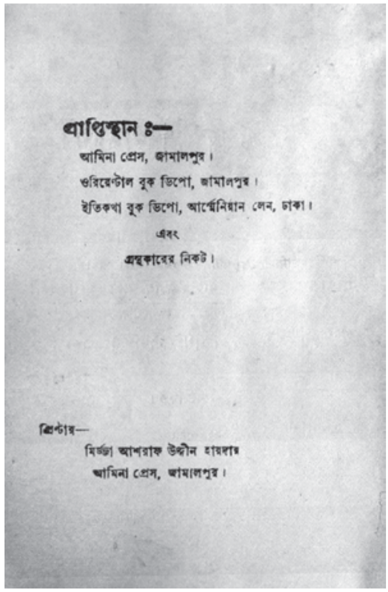
মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের অপ্রকাশিত
কাব্যগ্রন্থের নামপত্রের চিত্র



জামালপুরের গণ-ইতিবৃত্ত

গোলাম মোহাম্মদ।

তিন টাকা



প্রাপ্তিস্থান :—

আমিনা প্রেস, জামালপুর।

ওরিয়েন্টাল বুক ডিপো, জামালপুর।

ইতিকথা বুক ডিপো, আর্মেনিয়ান লেন, ঢাকা।

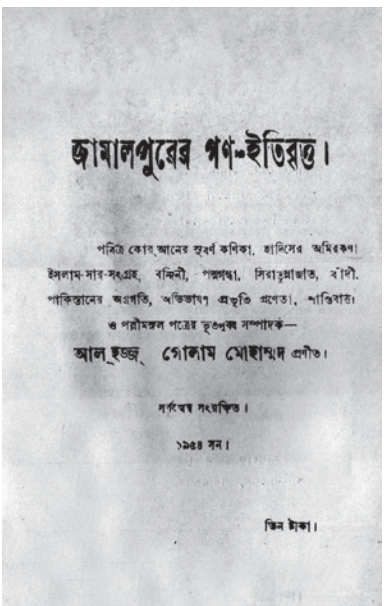
এবং

গ্রন্থকারের নিকট।

প্রিন্টার—

মির্জ্জা আশরাফ উদ্দীন হায়দার

আমিনা প্রেস, জামালপুর।



জামালপুরের গণ-ইতিবৃত্ত।

পবিত্র কোর্‌আনের স্বর্ণ কণিকা, হাদিসের অমিয়কণা

ইসলাম-সার-সংগ্রহ, বন্দিনী, পল্লীবধূ, সিরাতুন্নাজাত, বাঁশী,

পাকিস্তানের অগ্রগতি, অভিভাষণ প্রভৃতি প্রণেতা, শান্তিবার্তা

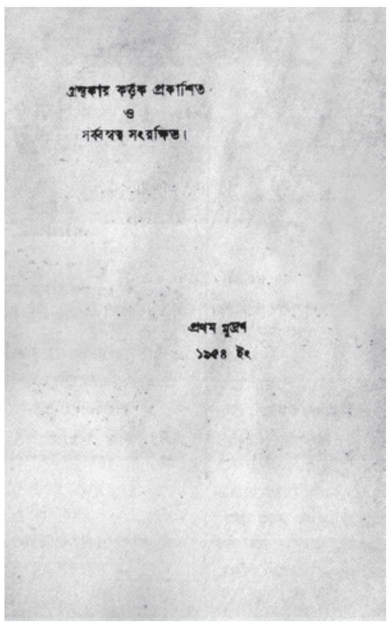
ও পল্লীমঙ্গল পত্রের ভূতপূর্ব সম্পাদক—

আল্‌ হজ্জ্‌ গোলাম মোহাম্মদ প্রণীত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

১৯৫৪ সন।

তিন টাকা।



গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত

ও

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

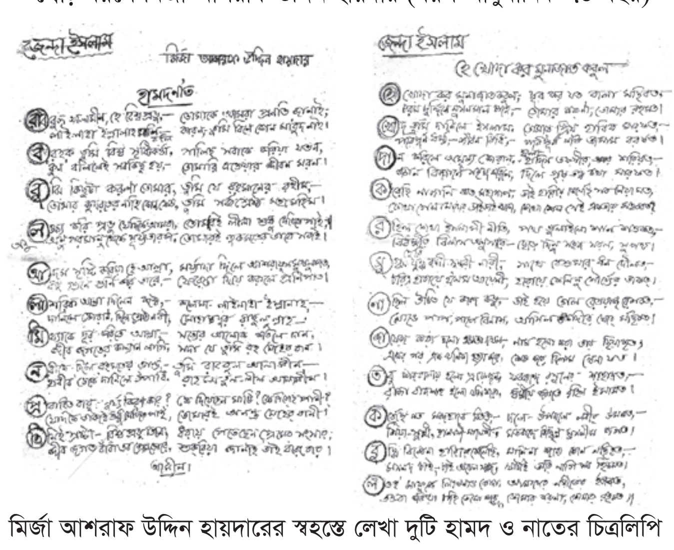
প্রথম মুদ্রণ

১৯৫৪ ইং

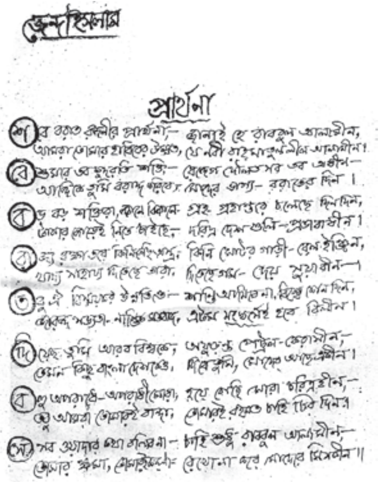
মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের আমেনা প্রেস থেকে মুদ্রিত বইয়ের প্রচ্ছদ ও আখ্যাপত্র

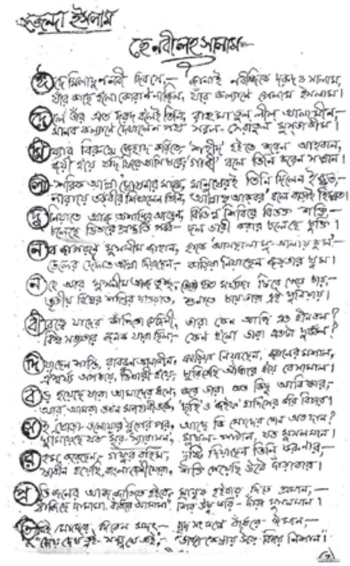


প্রৌঢ় বয়সে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার (বয়স আনুমানিক ৭০ বছর)

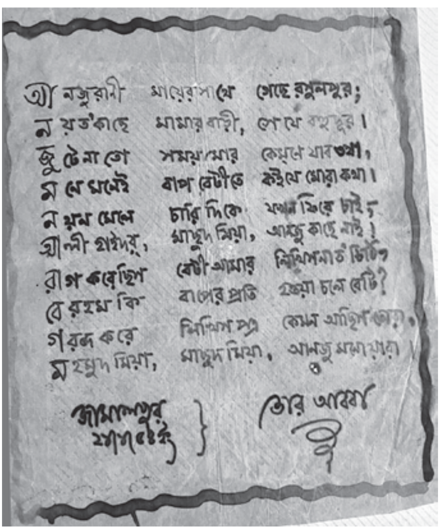


মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের স্বহস্তে লেখা দুটি হামদ ও নাতের চিত্রলিপি

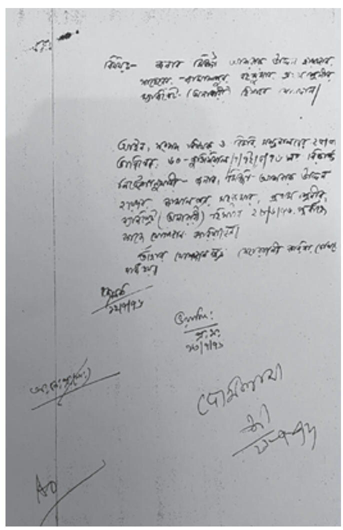




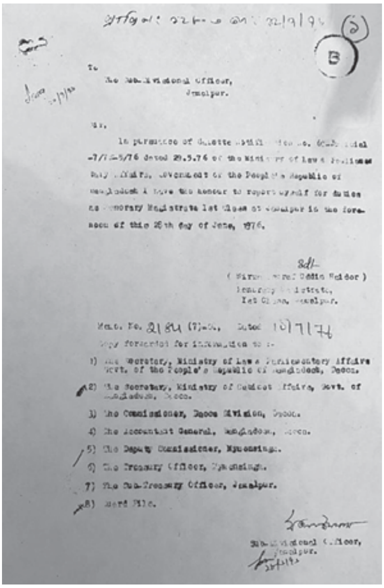
মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের স্বহস্তে লেখা আরও দুটি হামদ ও নাতের চিত্রলিপি



তিন সন্তানকে নিয়ে স্বহস্তে লেখা মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের একটি কবিতার চিত্রলিপি



মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট পদে যোগদান পত্রের চিত্রলিপি


To

The Sub-Divisional Officer,
Jamalpur.

Sir,

In pursuance of Gazette Notification No. ... dated 29.5.76 of the Ministry of Law & Parliamentary Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh I have the honour to report myself for duties as Honorary Magistrate 1st Class at Jamalpur in the fore-noon of this 25th day of June, 1976.

Sd/-
(Mirza Ashraf Uddin Haider)
Honorary Magistrate,
1st Class, Jamalpur.

Memo. No. 2184 (7)-Ju, Dated 10/7/76
Copy forwarded for information to :-

1) The Secretary, Ministry of Law & Parliamentary Affairs Govt. of the People's Republic of Bangladesh, Dacca.
2) The Secretary, Ministry of Cabinet Affairs, Govt. of Bangladesh, Dacca.
3) The Commissioner, Dacca Division, Dacca.
4) The Accountant General, Bangladesh, Dacca.
5) The Deputy Commissioner, Mymensingh.
6) The Treasury Officer, Mymensingh.
7) The Sub-Treasury Officer, Jamalpur.
8) Guard File.

Sub-Divisional Officer,
Jamalpur.

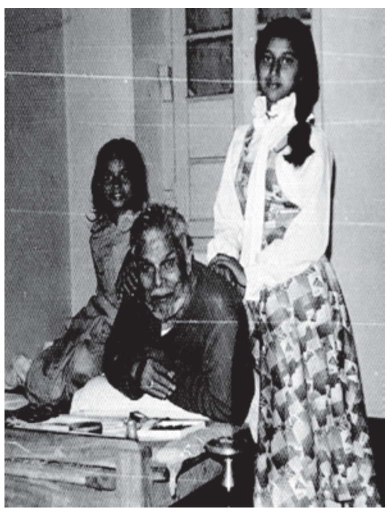
মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের
অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট পদে গৃহীত
যোগদান পত্রের চিত্রলিপি



প্রৌঢ় বয়সে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার
(৮০ বছর)



মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ও
তাঁর স্ত্রী আমেনা খাতুন



নাতনি লোপা ও লিপি'র সঙ্গে
মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার (উপবিষ্ট)



মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের
স্ত্রী আমেনা খাতুন (নববধূকালে)



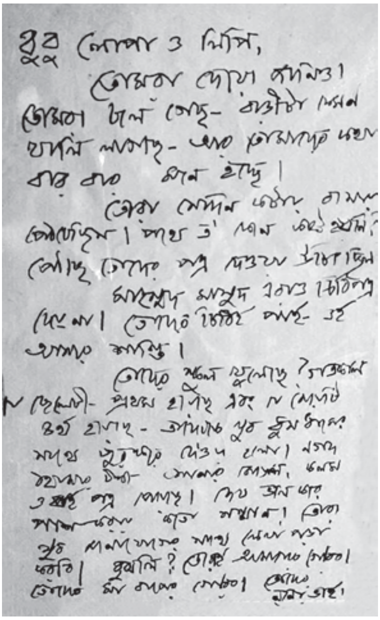
মধ্যবয়সে আমেনা খাতুন
(বয়স আনুমানিক ৫৫ বছর)



প্রৌঢ়া আমেনা খাতুন
(বয়স আনুমানিক ৭০ বছর)



মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের তিন সন্তান বাঁ থেকে মির্জা ডা. আলী হায়দার, আনজুমান আরা জামান (তাঁরা দুজন ইন্তেকাল করেছেন) ও বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার



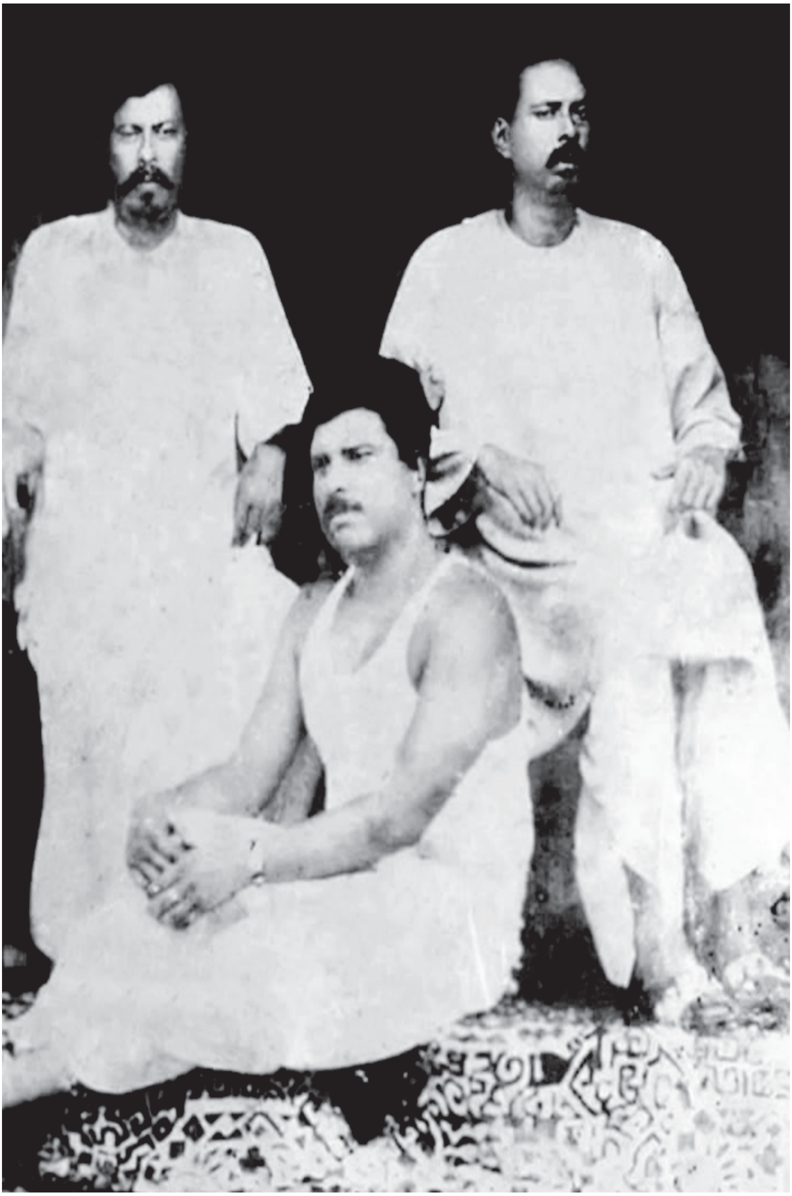
পৌত্রী লোপা ও লিপিকে লেখা
মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের
চিঠির চিত্রলিপি (সময় : সত্তরের দশক)



প্রৌঢ়া আমেনা খাতুন
(বয়স আনুমানিক ৮০ বছর)



জ্যেষ্ঠ পুত্র ডা. মির্জা আলী হায়দারের বিবাহ অনুষ্ঠানে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার (বাঁদিক থেকে প্রথম) ও আত্মীয়বর্গ



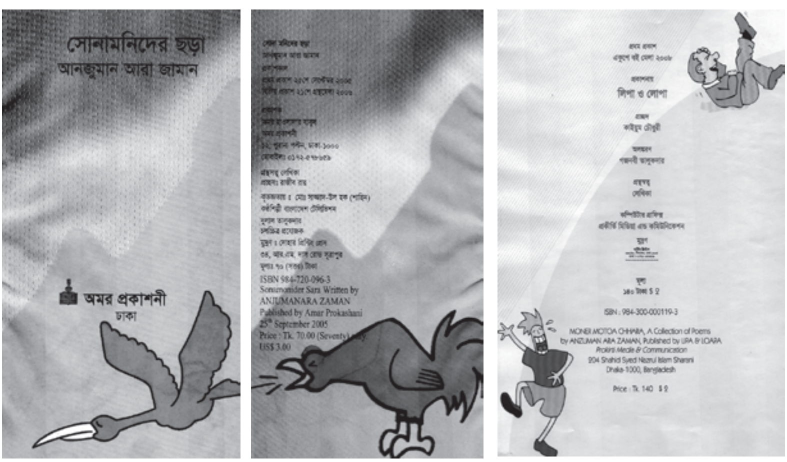
আজিজুর রহমান নান্না মিয়া (অবিভক্ত বাংলার এমএলসি)'র সঙ্গে
মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার (গেঞ্জি পরিহিত, সময় : চল্লিশের দশক)



আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে ৮৫তম জন্মদিনের অনুষ্ঠানে আমেনা খাতুন



মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের কন্যা আনজুমান আরা জামান রচিত 'সোনামনিদের ছড়া' ও 'মনের মতো ছড়া' গ্রন্থের প্রচ্ছদ



মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের কন্যা আনজুমান আরা জামান রচিত 'মনের মতো ছড়া' গ্রন্থের আখ্যাপত্র



লেখক পরিচিতি

আনজুমান আরা জামান জামালপুরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম ৪ঠা নভেম্বর ১৯৪২ সাল। পিতা মরহুম মিরজা আশরাফ উদ্দিন হায়দর সাহিত্যিক, সমাজ কর্মী ও অধুনা লুপ্ত সাপ্তাহিক পত্রিকা "তওফিক" এর সম্পাদক ছিলেন। মা গৃহিনী। তার প্রথম প্রকাশিত গল্প "কাপড়" সাপ্তাহিক তওফিকে প্রকাশিত হয়। অধুনা লুপ্ত ললনা তেও তাঁর গল্প ও ছড়া প্রকাশিত হয়েছে। ইদানীং কালে নানা পত্র প্রত্রিকায় তার ছড়া প্রকাশিত হয়েছে। তিনি প্রখ্যাত দন্ত চিকিৎসক মরহুম ডাঃ এফ জামানের পত্নী। ডাঃ এফ জামান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম গ্রাজুয়েট দন্ত চিকিৎসক ছিলেন। আনজুমান আরা জামান ১৯৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে এম, এ ডিগ্রী লাভ করেন। অল্প কিছু দিন স্কুলে শিক্ষকতা করেন। বাংলাদেশ বেতারেও তিনি অনুষ্ঠান করতেন। এখন তিনি সমাজ কল্যাণ মূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। ভারত, পাকিস্তান, নেপালে থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডা ও ইউরোপের অনেক দেশ ভ্রমন করেছেন।

ISBN 984-720-096-3



আনজুমান আরা জামান

- পিতা : মরহুম মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার *(সাংবাদিক সাহিত্যিক রাজনীতিবিদ)*।
- মাতা : বেগম আমিনা খাতুন।
- স্বামী : ডাক্তার এফ. জামান, বিডিএস *(পাঞ্জাব)*। ষাট, সত্তর ও আশির দশকের বাংলাদেশের প্রখ্যাত দন্তচিকিৎসক।
- পৈত্রিক নিবাস : আমলা পাড়া জামালপুর জেলা শহর।
- জন্ম : ৪ নভেম্বর, ১৯৪২। জামালপুর জেলার এক ঐতিহ্যবাহী, সম্ভ্রান্ত ও বনেদী পরিবার-'মির্জা পরিবার'-এ জন্ম।
- শিক্ষা : এম.এ., বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ১৯৬৪, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা।
- পেশা : সাহিত্যচর্চা। মূলতঃ শিশু সাহিত্যাঙ্গনে পদচারণা।
- প্রকাশিত গ্রন্থ :

১. সোনামনিদের ছড়া

২. মনের মতো ছড়া

(শিশু- কিশোরদের হৃদয়গ্রাহী ছড়ার বই)।



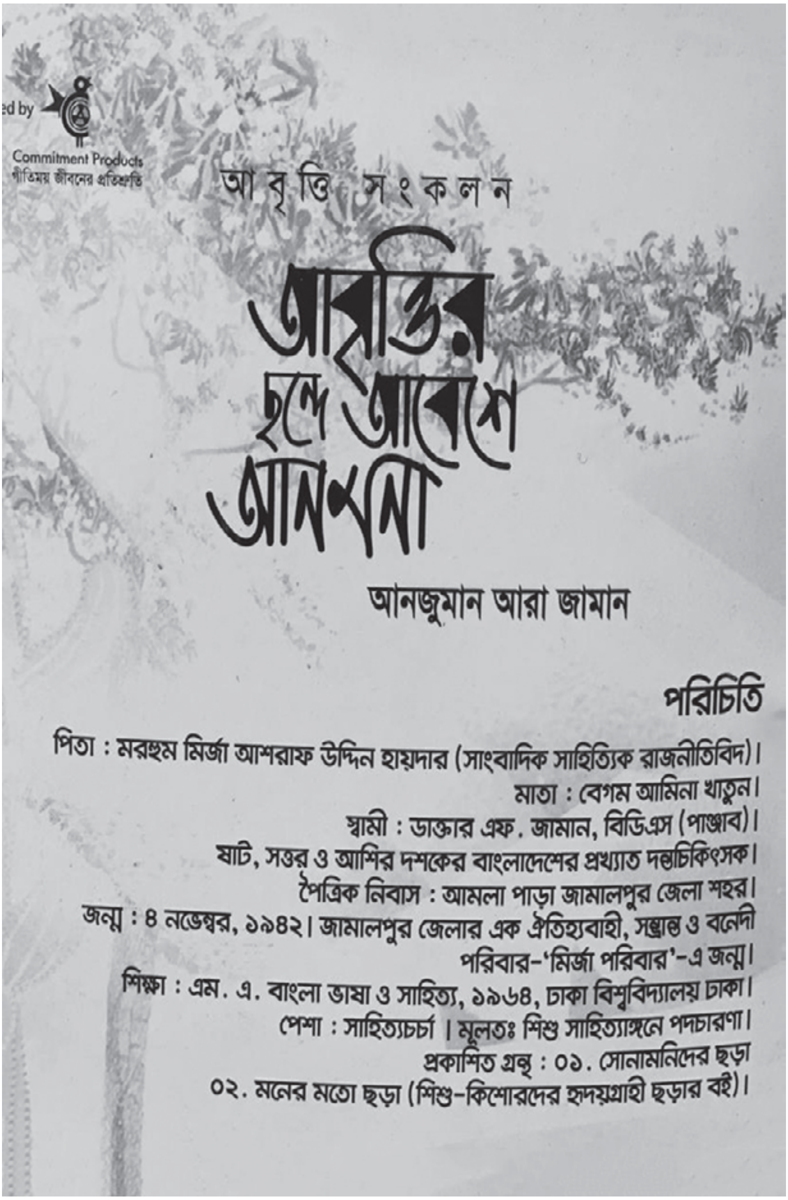
মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের প্রথম সন্তান আনজুমান আরা জামান রচিত 'সোনামনিদের ছড়া' (২০০৫) ও 'মনের মতো ছড়া' (২০০৮) ছড়াগ্রন্থের লেখক পরিচিতি



গুলশান লেডিস কমিউনিটি ক্লাবের অনুষ্ঠানে আনজুমান আরা জামান ও তাঁর সঙ্গে অন্যান্যরা



গুলশান লেডিস কমিউনিটি ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আনজুমান আরা জামানের প্রতিকৃতি (বামে) ও তাঁর সঙ্গে অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতাগণ (ডানে)



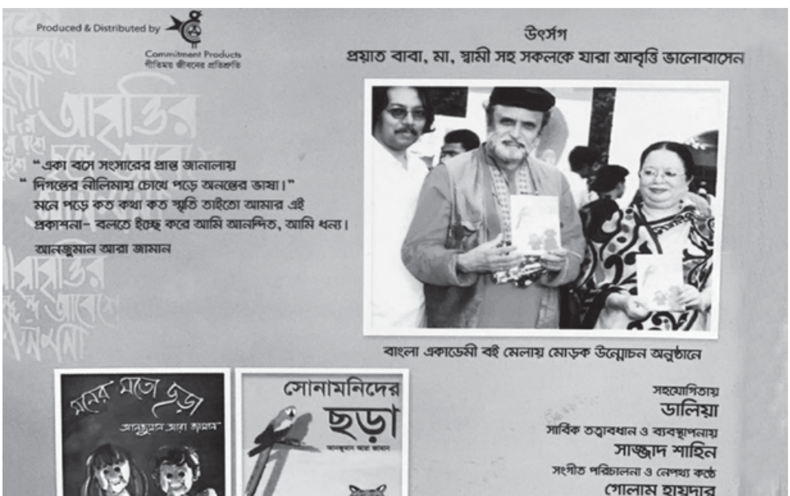
পরিচিতি

পিতা : মরহুম মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার (সাংবাদিক সাহিত্যিক রাজনীতিবিদ)।
মাতা : বেগম আমিনা খাতুন।
স্বামী : ডাক্তার এফ. জামান, বিডিএস (পাঞ্জাব)।
ষাট, সত্তর ও আশির দশকের বাংলাদেশের প্রখ্যাত দন্তচিকিৎসক।
পৈত্রিক নিবাস : আমলা পাড়া জামালপুর জেলা শহর।
জন্ম : ৪ নভেম্বর, ১৯৪২। জামালপুর জেলার এক ঐতিহ্যবাহী, সম্ভ্রান্ত ও বনেদী পরিবার-'মির্জা পরিবার'-এ জন্ম।
শিক্ষা : এম. এ. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ১৯৬৪, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা।
পেশা : সাহিত্যচর্চা। মূলতঃ শিশু সাহিত্যাঙ্গনে পদচারণা।
প্রকাশিত গ্রন্থ : ০১. সোনামনিদের ছড়া
০২. মনের মতো ছড়া (শিশু-কিশোরদের হৃদয়গ্রাহী ছড়ার বই)।

আবৃত্তি সংকলনে আনজুমান আরা জামানের পরিচিতি



বাংলা একাডেমি অমর একুশে গ্রন্থমেলায় আনজুমান আরা জামানের গ্রন্থ-উন্মোচন অনুষ্ঠানে কবি মুহম্মদ নূরুল হুদাসহ বিশিষ্ট সুধীজন



আনজুমান আরা জামানের আবৃত্তি সংকলনের আখ্যা ও উৎসর্গ পত্র



আনজুমান আরা জামান একটি অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করছেন



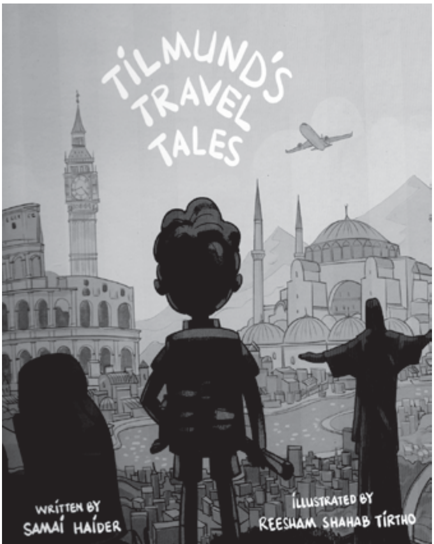
আনজুমান আরা জামানের আবৃত্তি সংকলনের প্রচ্ছদপত্র



মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের জ্যেষ্ঠ পুত্র
ডা. মির্জা আলী হায়দার (১৯৫২-২০১৭)

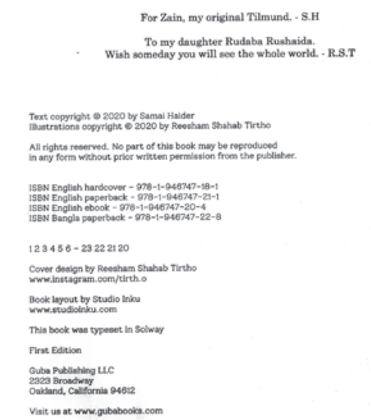


মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের একমাত্র কন্যা
আনজুমান আরা জামান (১৯৪২-২০১২)





মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের পৌত্রী সামাই হায়দারের গ্রন্থের প্রচ্ছদ



For Zain, my original Tilmund. - S.H

To my daughter Rudaba Rushaida.
Wish someday you will see the whole world. - R.S.T

ISBN English hardcover - 978-1-946747-18-1
ISBN English paperback - 978-1-946747-21-1
ISBN English ebook - 978-1-946747-20-4
ISBN Bangla paperback - 978-1-946747-22-8

1 2 3 4 5 6 - 23 22 21 20

Cover design by Reesham Shahab Tirtho
www.instagram.com/tirth.o

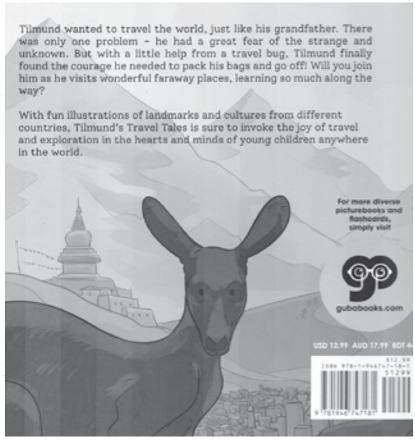
Book layout by Studio Inku
www.studioinku.com

This book was typeset in Solway

First Edition

Guba Publishing LLC
2323 Broadway
Oakland, California 94612

Visit us at www.gubabooks.com



মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের পৌত্রী সামাই হায়দারের গ্রন্থের আখ্যাপত্র





প্রথম ছবি : জামালপুর শহরে আমলাপাড়ায় মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের শতবর্ষের পুরোনো ঐতিহ্যবাহী বসতবাড়ি। দ্বিতীয় ছবি : ঐতিহ্যবাহী রাজা হরিশচন্দ্রের দিঘি নামে সুপরিচিত। দিঘিটি পঞ্চাশের দশকে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার কর্তৃক ক্রয়কৃত যা পুনরায় খনন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে অদ্যাবধি সংরক্ষিত রয়েছে





মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের ব্যবহৃত খাট ও পড়ার টেবিল



জামালপুর শহরে প্রথম বিদ্যুতায়ন সরবরাহের জন্য ক্রয়কৃত মেশিনারিজ
(বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, জামালপুর অফিসে সংরক্ষিত)





মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের ব্যবহৃত টি-টেবিল, চেয়ার ও আলমারি



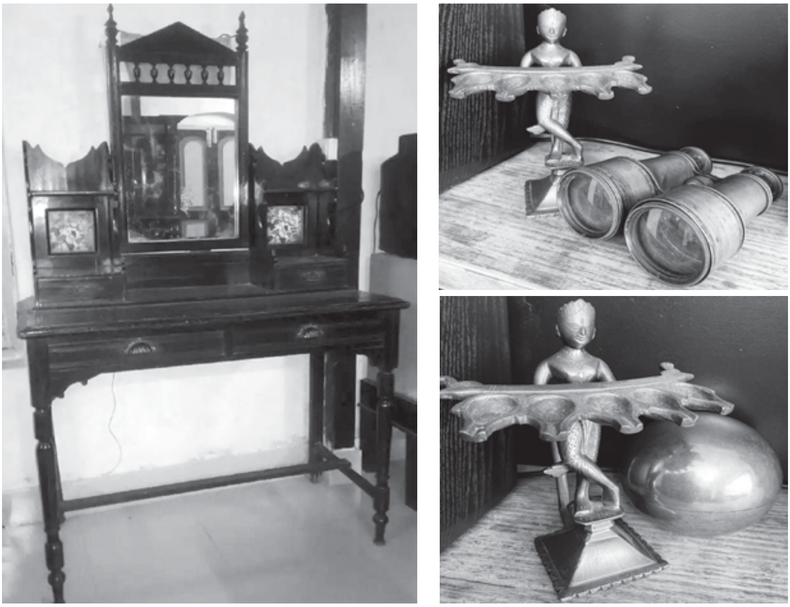
নিলক্ষিয়া স্কুল ও পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃতপ্রাপ্ত হয়ে হাইস্কুলে উন্নীত হয় (মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ও তাঁর মামাতো ভাই অবিভক্ত বাংলার এমএলসি আজিজুর রহমান নান্না মিয়ার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এই হাইস্কুল ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়)



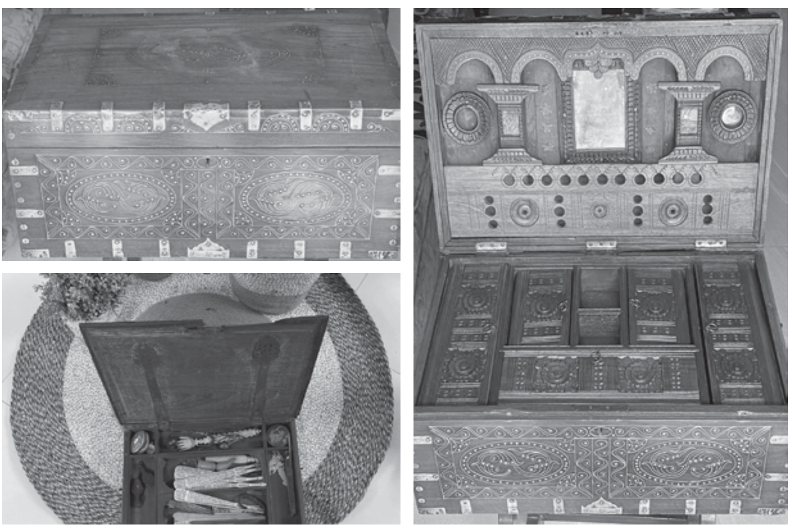
মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের ব্যবহৃত চেয়ার, পানের বাটা ও লোহার সিন্দুক



মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের ব্যবহৃত হাতির দাঁতের তৈরি বাক্স এবং
সামুয়ার (আগের দিনে চা তৈরির পাত্র)

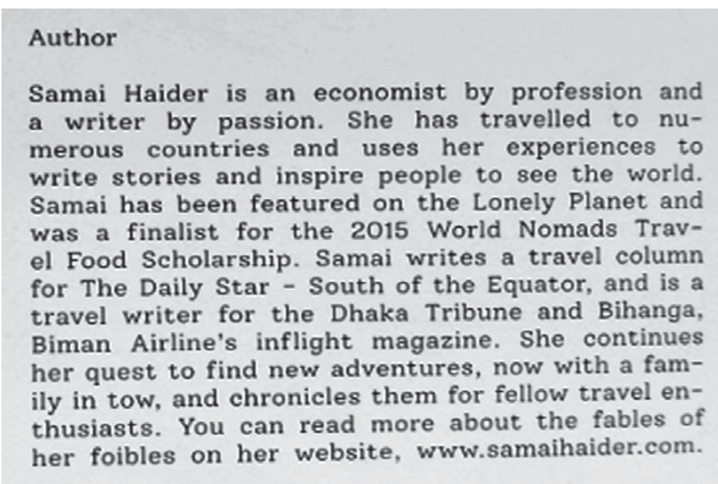


আমেনা খাতুনের ব্যবহৃত ড্রেসিং টেবিল, পঞ্চ প্রদীপ ও মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের ব্যবহৃত বাইনোকুলার (দুরবিন), বিরিদান (পানের খিলি বহন করার কাঁসার তৈজসপত্র)



মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ও আমেনা খাতুনের ব্যবহৃত ক্যাশবাক্স ও বিভিন্ন তৈজসপত্র





Author

Samai Haider is an economist by profession and a writer by passion. She has travelled to numerous countries and uses her experiences to write stories and inspire people to see the world. Samai has been featured on the Lonely Planet and was a finalist for the 2015 World Nomads Travel Food Scholarship. Samai writes a travel column for The Daily Star - South of the Equator, and is a travel writer for the Dhaka Tribune and Bihanga, Biman Airline's inflight magazine. She continues her quest to find new adventures, now with a family in tow, and chronicles them for fellow travel enthusiasts. You can read more about the fables of her foibles on her website, www.samaihaider.com.

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের পৌত্রী সামাই হায়দার রচিত 'টিলমান্ডস ট্রাভেল টেলস' গ্রন্থের (গুবা বুকস, ২০২০) লেখক পরিচিতি



আমেনা খাতুন (উপবিষ্ট)। বাঁদিক থেকে সাদিয়া রওশন জাহান (কনিষ্ঠ পুত্রবধূ)
আনজুমান আরা জামান (একমাত্র কন্যা), হোসনে আরা বেগম (জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ)



দুই ছেলে ও একমাত্র কন্যার (কোলে প্রথম নাতি)
সঙ্গে উপবিষ্ট সস্ত্রীক মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার



মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের জামাতা
ডা. এফ. জামান



ডা. এফ. জামানের বাবা
কফিল উদ্দিন আহমেদ



মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের দৌহিত্রী
লিপার পুত্র মো. সাকিব বিন এহেতশাম ও
তার সহধর্মিণী সৈয়দা রিদাই জানিব



মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের জ্যেষ্ঠ
দৌহিত্রী লিপির পুত্র মো. সাকিব বিন
এহেতশামের কোলে তার কন্যা আবিহা সাকিব



মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের জ্যেষ্ঠ দৌহিত্রী তৌফিকা ফেরদৌস লিপির কন্যা ফারাহ মারযান বিনতে এহেতশাম ও তার স্বামী মোয়াস্মের দিন আরিফের (মা-বাবা) সঙ্গে তাদের কন্যা ইনায়া ফাতিমাহ আরিফ



মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের কনিষ্ঠ দৌহিত্রী লতিফা ফেরদৌস (লোপা) ও তার স্বামী ডা. এমএ রাজ্জাকের সঙ্গে সন্তান জারীফ রাজ্জাক ও জারা রাজ্জাক



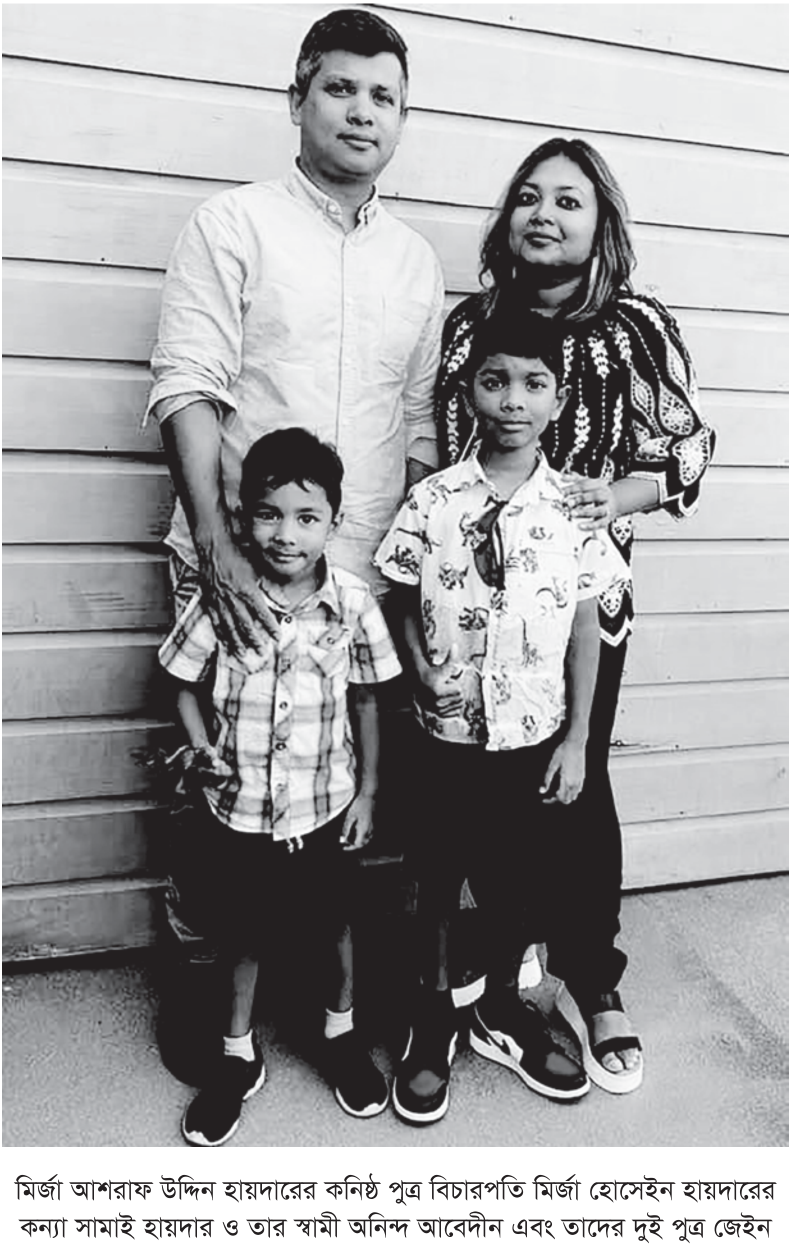
মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের দৌহিত্র ডা. ওয়াহিদুজ্জামান তমাল (সর্ববামে), তারপর স্ত্রী রুহি ফেরদৌস রুনা, তারপর তাদের পুত্র আলাভি ওয়াহিদ জামান, তারপর তাদের কন্যা আরাত্রিকা ফাতেমা ওয়াহিদ মম ও সর্বডানে আরাত্রিকা মমর স্বামী ফারহান চৌধুরী



মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের জ্যেষ্ঠ পুত্র ডা. মির্জা আলী হায়দারের পুত্র মির্জা আসিফ হায়দার ও তার স্ত্রী জাফরিন হোসেন এবং তাদের দুই সন্তান পুত্র মির্জা আরিব হায়দার ও কন্যা আজমীন নুসাইবা হায়দার



মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের জ্যেষ্ঠ পুত্র ডা. মির্জা আলী হায়দারের কন্যা ডা. আসফিয়া হায়দার ও তার স্বামী সামিউল হাসান সাকিব এবং তাদের কন্যা শাইরিন আলভিনা হাসান



মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের কনিষ্ঠ পুত্র বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দারের কন্যা সামাই হায়দার ও তার স্বামী অনিন্দ আবেদীন এবং তাদের দুই পুত্র জেইন মির্জা আবেদীন ও নিয়াম মির্জা আবেদীন



নিলক্ষিয়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ (স্থাপিত : ১৮৮৫)

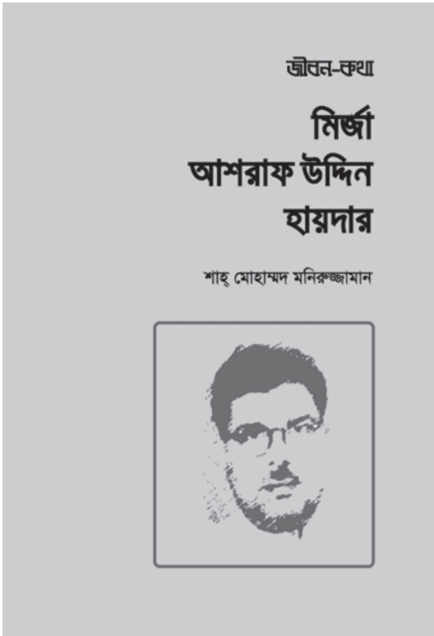


জামালপুর পৌর কবরস্থানে অবস্থিত মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ও তাঁর স্ত্রী আমেনা খাতুনের কবর



একুশে পদকপ্রাপ্ত চিত্রশিল্পী এবং দেশের সর্ববৃহৎ স্ক্রল পেইন্টিংয়ের শিল্পী অধ্যাপক শাহজাহান আহমেদ বিকাশের আঁকা মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের ছবি বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দারকে উপহার দিচ্ছেন লেখক ও গবেষক শাহ্ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

আলোকচিত্রী : আবদুল কাইয়ুম



২০২২ সালে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারে ওপর রচিত গ্রন্থের প্রচ্ছদ চিত্র



লেখক পরিচিতি

শাহ্ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান প্রাবন্ধিক ও গবেষক। জন্ম ১০ই জুন ১৯৮৫, খাশিমারা, মেলান্দহ, জামালপুর। পিতা মোহাম্মদ আবদুর রহিম, মাতা মোসাম্মৎ মাজেদা খাতুন। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা জামালপুরে। পঞ্চম শ্রেণিতে সরকারি বৃত্তি (১৯৯৫) অর্জন। ঢাকা কলেজ থেকে ২০০৭ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর (২০০৮), সেন্ট্রাল ল' কলেজ থেকে এলএল.বি. (২০১৩)। ২০১০ সালে বাংলা একাডেমি পরিচালিত তরুণ লেখক প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপ্ত করেছেন।

একুশ শতকের শূন্য দশক থেকে লেখালেখি শুরু। অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন দেশ-বিদেশের পত্রপত্রিকা ও জার্নালে। অমর একুশে বাংলা একাডেমির ৬০ বছর গ্রন্থমালা ও আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন ২০১৫ স্মারকপত্রের প্রকাশনা সহকারী ও জাতীয় কবিতা উৎসব ২০২০ তথ্য উপপরিষদের সচিব ছিলেন। বর্তমানে বাংলা একাডেমিতে কর্মরত।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের জীবন-কথা নিয়ে এ বইটি। এই বইয়ে তাঁর শৈশব, বাল্যজীবন, শিক্ষাজীবন, রাজনৈতিক জীবনের যেমন বর্ণনা রয়েছে তেমনি রয়েছে তাঁর কর্মজীবন, সমাজসেবার ইতিবৃত্ত। এই বইয়ে আরও রয়েছে তিনি কীভাবে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে ও পরে পাকিস্তান আন্দোলনের কর্মী হিসেবে পরবর্তীকালে ভাষা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধসহ অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে থেকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনে পরিমাণে অল্প হলেও যতটুকু ভূমিকা রেখেছেন তা স্বল্প পরিসরে তুলে ধরা হয়েছে।

মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের সংক্ষিপ্ত জীবন-ইতিহাসের পাশাপাশি এই বইয়ে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আলোকচিত্র। যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।

২০২২ সালে মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারে ওপর প্রকাশিত বইয়ে লেখক ও বইয়ের প্রচ্ছদের সংক্ষিপ্ত পরিচিত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গ্রন্থ প্রণয়নে বিভিন্ন পর্যায়ে অনেকের কাছ থেকে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত হয়েছি। সবার নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তেমন কয়েকজন ব্যক্তির নাম নিচে দেওয়া হলো : বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার ও তাঁর পরিবারের সদস্যবর্গ, আলী জহির (কবি, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, জামালপুর), উৎপল কান্তি ধর (প্রবীণ সাংবাদিক ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, জামালপুর), এ এ কে মাহমুদুল হাসান (দারা মিয়া) (প্রবীণ সাংবাদিক ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, জামালপুর), মোহাম্মদ রেজা খান (বিশিষ্ট রাজনীতিক, জামালপুর), মু. আজিজুর রহমান (প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক, সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ), মোঃ আমিনুল ইসলাম (প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র), হারুন হাবীব (মুক্তিযোদ্ধা, খ্যাতিমান লেখক ও ফেলো, বাংলা একাডেমি), আবদুর রাজ্জাক (প্রাক্তন শিক্ষক, মাহমুদপুর উচ্চ বিদ্যালয়, মেলান্দহ), আতাউর রহমান (মুক্তিযোদ্ধা ও প্রাক্তন শিক্ষক, জোনাইল উচ্চ বিদ্যালয়, মাদারগঞ্জ), মফিজ উদ্দিন আহমদ (প্রাক্তন হেল্‌থ পরিদর্শক, মাদারগঞ্জ), শাহ্ মোহাম্মদ আলমগীর (নয়াপাড়া, কলেজ মোড়, জামালপুর), মোহাম্মদ নাজমুল হোসাইন (শিক্ষার্থী, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা কলেজ), মো. আনিছুর রহমান লয়েট (কর্মকর্তা, বাংলা একাডেমি), নওরিন নিশাত (শিক্ষার্থী, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ইডেন মহিলা কলেজ), শাহ্ সাদেক আহমদ (শিক্ষার্থী, সেন্ট্রাল ল' কলেজ, ঢাকা), আসাদ আহমেদ (কর্মকর্তা, বাংলা একাডেমি), আবু মোঃ ইকবাল (কর্মকর্তা, বাংলা একাডেমি), আহমদ আজিজ (কবি, আমলাপাড়া, জামালপুর), কবি আবু বকর সিদ্দিক (ইকবালপুর, জামালপুর), কবি প্রতিমা ধর (জামালপুর), আগমনী ধর (নান্দিনা), সাংবাদিক এস এম আশরাফুল আজম (বকশীগঞ্জ), কবি ও প্রাবন্ধিক পিয়াস মজিদ; কবি, কলামিস্ট, প্রাবন্ধিক শাহ সীদ্‌দীক, অধ্যাপক আব্দুল হাই আলহাদী, স্বাধীন আশরাফুজ্জামান, নান্নু পারভেজ, জাহাঙ্গীর সেলিম, আবু সাইদ তুলু, শতাব্দী এষ।

এ প্রসঙ্গে আরো কয়েকজনের নাম হলো– অপুদাম, অমিত কুমার ঘোষ, অজন্তা রহমান কণা, অনিকেত শামীম, অ্যাড. শাহ্ মোহাম্মদ কবীর, আজিজ আহমেদ, আতা সরকার, আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু, আনোয়ার বাবু, আবু সায়েম মোহাম্মদ সা-আদাত করীম, আব্দুল কাদির, আব্দুল লতিফ রেজা, আবদুল্লাহ আল-হারুন, আমজাদ সুজন, আমানুল্লাহ সেলিম, আমিনুল ইসলাম, আরিফুর রহমান, আরিফুল ইসলাম, আল মাকসুদ, আল হোসাইন খোকন, আলম মাহমুদ, আশরাফ আল যাহেদ, আশরাফুর রহমান খান, আশরাফুল হায়দার, আসাদুল্লাহ্, আসাদুল্লাহ

ফারাজী, আসিফ হাসান নবী, আহমেদ মাহবুবুর, রহমান, ইফতেখার রবিন (রবিন ইসলাম), এ এস এম আব্দুল হালিম, এম ডি হুমায়ূন, এম. এস. আই সাগর, এম.ডি. হারুন রশীদ, এরশাদ জাহান, কামরুল আহসান সুজন, কামরুল নাহার শিখা, কায়েদ-উদ-জামান, ক্ষ্যাপা পারভেজ সরকার, খন্দকার আব্দুল আলিম রঞ্জু, খালেদ খসরু, খুরশীদ চঞ্চল, ছাইদুর রহমান, ছানোয়ার হোসেন, জগলুল হায়দার, জাকারিয়া জাহাঙ্গীর, জাহিদ মামুন, জাহিদুর রহমান উজ্জ্বল, জি.বি.এম. রুবেল আহম্মেদ, জিতেন্দ্র চন্দ্র ধর, জিয়া ইব্রাহিম, জুনায়েদ খালিদ, জেবুননেছা শিকদার, তারিকুল ফেরদৌস, দীপেন বসাক, তোফায়েল তপু, তোফায়েল তফাজ্জল, তৌহিদ আহম্মেদ লিখন. দিপংকর ইমন, ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ মুকুল, নঈম জাহাঙ্গীর, ফারজানা ইসলাম, ফারুক হোসেন, বাকী বিল্লাহ, বায়জীদ খুরশীদ রিয়াজ, বাদল ডিহিদার, বাদল রহমান, বিমল চন্দ্র আর্য্য, বিশ্বজিৎ কুমার ধর, বিশ্বজিৎ কুমার সোম, বিপ্লব সরকার, ভারতী চৌধুরী, ভোলা দেবনাথ, মনিকা চক্রবর্তী, মনিরা মনি, মনিরুজ্জামান বাদল, মনোয়ার হুসেন মুরাদ, মন্দিরা এষ, মাদল হাসান, মারুফ আজাদ, মাসুদ রেজা, মাসুম মোকাররম, মাসুম হাবিব, মিঠু জাকির, মীর আনিসুল হাসান, মীর্জা আমির, মুজতাহিদ ফারুকী, মুজাহিদ বিল্লাহ ফারুকী, মুনির হাসান চৌধুরী তারা, মুনিরা মনি, মুহম্মদ রবিউল আলম টুক, মুহাম্মদ ইলিয়াছ উদ্দিন, মুহাম্মদ সামাদ, মেঘ অদিতি, মেহেদী ইকবাল, মোস্তফা মনজু, মো. মাহাবুবুর রহমান (রিপন), মোহাম্মদ সারোয়ার হোসেন, মো. দুলহান, রকিব লিখন. রকিব লিটন, রজব বকশী, রহিম ইবনে বাহাজ, রাজন্য রুহানি, রাজিব সিকদার, রাজু আহমেদ রিন্টু, রাফিউল আজম, রাবিউল আলম, রাসেল রানা দোজা, রাশেদুল হাসান শেলী, রুমী কবির, রোখশানা রফিক, রোদ্দুর নিপা, লাবলু আনসার, শওকত সাদী, শামীম আজাদ, শারমিন সারা, শাহ খায়রুল বাশার, মো.শাহ্ জামাল, শহীদুল ইসলাম নিরব, শাহীনা সোবহান, শাহীনা সোবহান মিতু, শাহেদা ফেরদৌস, শেখ ফজল, সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল, সাজিদ মাহমুদ প্রামাণিক, সাজ্জাদ আনসারী, সামসাদ জাহান, সায়েম সাদাতুল করিম, সামাই হায়দার, সালেহীন শিপ্রা, সিদ্ধার্থ তালুকদার, সিমা রানী বন্দ্র, সিএম কয়েস সামি, সুবর্ণা শারমিন, সুব্রত তালুকদার, সুমন সেখ, সুলতানুল আরেফীন আদিত্য, সুলেখা, সুশান্ত কুমার, সুহৃদ জাহাঙ্গীর, সেলিনা আক্তার, সৈয়দ আনোয়ার রশীদ, সৈয়দ তমাল, সৈয়দ নোমান, সৈয়দ শরীফ, হাবিব মুহাম্মদ, হামিদুর রহমান সোহেল, হারুণ দুলাল, হৃদয় লোহানী, হিল্লোল সরকার প্রমুখ।

গ্রন্থপঞ্জি

১. জামালপুরের গণ-ইতিবৃত্ত
২. অপারেশন বাহাদুরাবাদ ঘাট
৩. জীবন-কথা : মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার
৪. জেলা উন্নয়ন পরিক্রমা : জামালপুর
৫. ৭০ বৎসরপূর্তি উৎসব, সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ
৬. রজত জয়ন্তী, জামালপুর জেলা
৭. ধ্রুবতার, ভাষাসৈনিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী আখতারুজ্জামান মতি মিয়া স্মরণে
৮. সম্প্রীতি ২০১৪, জামালপুর সমিতি, ঢাকা
৯. বাংলাপিডিয়া
১০. ঢাকা কোষ
১১. বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান
১২. জেলা সাহিত্যমেলা ২০২২
১৩. গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : জামালপুর
১৪. ঈশ্বরচন্দ্র গুহ
১৫. খালেদ মোশাররফ বীর উত্তম
১৬. মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস : ময়মনসিংহ
১৭. উইকিপিডিয়া
১৮. অ্যাডভোকেট মতিয়র রহমান তালুকদার স্মরণে নাগরিক স্মরণসভা পুস্তিকা
১৯. ময়মনসিংহের সাহিত্য ও সংস্কৃতি
২০. আমাদের জামালপুর
২১. মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা : মেলান্দহ
২২. মুক্তিযুদ্ধের কিশোর ইতিহাস : জামালপুর
২৩. স্মারকগ্রন্থ : বিপ্লবী রবি নিয়োগী জ্যোৎস্না নিয়োগী
২৪. যতদূর মনে পড়ে
২৫. ভাষা আন্দোলনে জামালপুর
২৬. শেরপুর জেলার ইতিবৃত্ত
২৭. হাজী ফাজেল মোহাম্মদ
২৮. ময়মনসিংহ জেলা গেজেটিয়ার

নির্ঘণ্ট

এ বইয়ে কোথায় ব্যক্তি, স্থান, গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা, সংগঠন ও বিশেষ ঘটনার উল্লেখ আছে তা দ্রুত পাঠকের পক্ষে খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। এজন্য এই নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। এই বর্ণনানুক্রমিক নির্ঘণ্ট থেকে সহজেই তা জানতে পারা যাবে। প্রথমে কাঙ্ক্ষিত শব্দ এবং তার পার্শ্বে পৃষ্ঠা নম্বর দেওয়া হয়েছে।

লেখক, গবেষক শাহ্ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের প্রণীত মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের জীবনকৃতি গ্রন্থখানা পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি। মির্জা সাহেবকে নিয়ে এ ধরনের একটি গ্রন্থ খুব দরকার ছিল। তিনি একজন বড় মাপের সামাজিক ও নিরহংকারী মানুষ ছিলেন। মহৎ কর্মের প্রচার কখনো চাপা থাকে না সেটি কোনো না কোনোভাবে প্রকাশ পেয়ে যায়। মির্জা সাহেবও আর চাপা থাকলেন না, তার স্মৃতি আর হারিয়ে যাবে না। যে ঋণ স্বীকার করার দরকার ছিল আমাদের দীর্ঘদিন আগে, নতুন প্রজন্মের একজন হিসেবে শাহ্ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বিনম্র শ্রদ্ধায় অগ্রসর হয়েছে ওই ঋণ স্বীকারে–তাকে আমরা আন্তরিক অভিবাদন জানাই। তার মতো অন্যরাও এগিয়ে আসুন এমন কাজে।

২৬/৭/২০২৫

এ. এ. কে. মাহমুদুল হাসান (দারা)
দেওয়ানপাড়া, জামালপুর